নির্বাচিত রচনাবলি

বারো খণ্ডে

খণ্ড

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

সূচি

কার্ল মার্ক্স

'পুঁজি' গ্রন্থের (১) প্রথম খণ্ডের প্রথম জার্মান সংস্করণের মুখবন্ধ

আমার আলোচ্য বইখানি — যার প্রথম খণ্ড আমি এখন জনসাধারণের বিচারের জন্যে পেশ করছি, তা হল ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত আমার 'Zur Kritik der politischen Oekonomie' ('অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে') নামের বইখানিতে লিপিবদ্ধ চিন্তাধারারই জের। পূর্বোক্ত ওই প্রথম অংশ ও তার এই বর্তমান জেরের মধ্যেকার দীর্ঘ বিরতির কারণ — বহু বছরের একটি অসুখের ফলে আমার কাজে বারংবার বিঘ্ন ঘটা।

এই বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে আমার ওই পূর্ববর্তী গ্রন্থের বক্তব্যের সারাংশ সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে (২)। দুটি বইয়ের মধ্যে নিছক যোগসূত্র-স্থাপন ও পূর্ণতাসাধনের জন্যেই যে এটি করা হয়েছে তা নয়। বিষয়বস্তুর উপস্থাপনাতেও উন্নতি ঘটানো হয়েছে এর ফলে। অবস্থাগতিকে যতদূর সম্ভব হয়েছে সে-অনুযায়ী আগেকার বইখানিতে যে-সমস্ত আলোচ্য বিষয়ের ইঙ্গিতমাত্র দেয়া হয়েছিল তার অনেকগুলিই এ-বইয়ে পূর্ণতররূপে বিকশিত করে তোলা হয়েছে, আবার অন্যদিকে যে-সমস্ত বিষয় আগের বইয়ে পুরোপুরি বিশদ করা হয়েছিল সেগুলি কেবলমাত্র ছুঁয়ে যাওয়া হয়েছে এখানে। মূল্য ও অর্থ-সম্পর্কিত তত্ত্বগুলির ইতিহাস-বিষয়ক আলোচনার অংশগুলি, বলা বাহুল্য, এ-বই থেকে একেবারেই বাদ দেয়া হয়েছে। তবে যে-পাঠক আমার আগের বইটি পড়েছেন তিনি এ-বইয়ের প্রথম অধ্যায়ের টীকার মধ্যে উপরোক্ত ওই সমস্ত তত্ত্বের ইতিহাস-সম্পর্কিত অতিরিক্ত কিছু আকর-প্রসঙ্গের সন্ধান পাবেন।

যে-কোনো বিষয় শুরু করাটাই কঠিন, এটা সকল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই সত্যি। এ-কারণে এ-বইয়ের প্রথম অধ্যায়টি, বিশেষ করে তার যে-অংশে পণ্যদ্রব্যের বিশ্লেষণ-সম্পর্কিত আলোচনাটি বিধৃত, সেটি পাঠকের কাছে সবচেয়ে কঠিন ঠেকবে। তবে বিশেষ করে এই আলোচনার যে-অংশে মূল্যের

সারবস্তু ও মূল্যের পরিমাণের আলোচনা আছে সেই অংশটিকে যতদূর সম্ভব বোধগম্য করে তোলার প্রয়াস পেয়েছি আমি।* মূল্যের বাস্তব রূপ, যার পূর্ণবিকশিত চেহারা হল অর্থের বাস্তব রূপ, তা একেবারেই প্রাথমিক ও সরল ব্যাপার। তা সত্ত্বেও গত দু'হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি বৃথাই চেষ্টা করেছে এ-ব্যাপারের মূলে পৌঁছতে, অথচ অন্যদিকে এর চেয়ে অনেক বেশি যৌগিক ধরনের ও জটিল নানা রূপের সফল বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অন্তত্পক্ষে লক্ষ্যবস্তুর সন্নিকটে পৌঁছতে পেরেছে তা। কিন্তু কেন এমনটা সম্ভব হল? এর কারণ আর কিছুই নয়, কেবল অখণ্ড জৈবসত্তা হিসেবে কোনো প্রাণীর দেহের বিশ্লেষণ ওই দেহের কোষকলার বিশ্লেষণের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি সহজ, তা-ই। তদুপরি অর্থনৈতিক নানা রূপের বিশ্লেষণে না কাজে লাগে অণুবীক্ষণ-যন্ত্র, না রাসায়নিক নানা বিকারক। সেক্ষেত্রে ওইসব জিনিসের জায়গায় প্রয়োজন পড়ে বিমূর্তকরণের ক্ষমতার। কিন্তু শ্রমের সাহায্যে উৎপাদিত বস্তুর পণ্য-রূপ — কিংবা পণ্যবস্তুর মূল্য-রূপই — হল বুর্জোয়া সমাজের অর্থনৈতিক দেহকোষের বাস্তব রূপ। অনভিজ্ঞ লোকের কাছে এই সমস্ত কোষ-রূপের বিচার-বিশ্লেষণ বড্ড বেশি খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামানোর সামিল ঠেকে। বস্তুত এটি ছোটখাট খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামানোই বটে, তবে তা অণুবীক্ষণিক শারীরস্থান নিয়ে মাথা ঘামানোরই সগোত্র।

---

* এটা আরও বেশি করে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, কেননা এমনকি ফের্ডিনান্ড লাসালের গ্রন্থের যে-অংশে লাসাল শুল্টসে-ডেলিচের যুক্তিজাল খণ্ডনে ব্যাপৃত এবং যেখানে তিনি বলছেন যে আলোচ্য এই বিষয়গুলি (৩) সম্বন্ধে আমার ব্যাখ্যাসমূহের 'বিশুদ্ধ যুক্তিসম্মত সারাংশটুকুই' তিনি বিবৃত করছেন, সেখানেও গুরুতর নানা ভুলভ্রান্তি থেকে গেছে। লাসাল তাঁর অর্থশাস্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থাবলীতে সবকটি সাধারণ তত্ত্বগত প্রস্তাব — অর্থাৎ পুঁজির ঐতিহাসিক প্রকৃতি, উৎপাদনের শর্তাবলী ও উৎপাদনের পদ্ধতির মধ্যে পরস্পর-সম্পর্ক, ইত্যাদি, ইত্যাদি, সবকিছু সম্পর্কিত তত্ত্বগত প্রস্তাবসমূহ ও এমনকি আমার তৈরি-করা পরিভাষা পর্যন্ত সবকিছুই যদি আমার রচনাবলী থেকে প্রায় আক্ষরিক অর্থে ও কোনোরকম ঋণস্বীকার না-করেই বেমালুম গ্রহণ করে থাকেন, তবে বুঝতে হবে তিনি তা করেছেন প্রচারকার্যের উদ্দেশ্যসাধনেই। আমি অবশ্য তাঁর গৃহীত ওইসব তত্ত্বগত প্রস্তাবের বিশদীকরণ ও সে-সবের হাতে-কলমে প্রয়োগের কথা বলছি না এখানে, কারণ সে-সবের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। (মার্কসের প্রদত্ত টীকা।)

অতএব, মূল্যের বাস্তব রূপ-সম্পর্কিত আলোচনার অংশটিকে বাদ দিলে আলোচ্য এই বইখানিকে আর দুরূহতার দায়ে অভিযুক্ত করা চলে না। অবশ্য একথা বলার সময় আমি ধরেই নিচ্ছি যে এ-বইয়ের পাঠক হচ্ছেন এমন এক ব্যক্তি যিনি নতুন কিছু জানতে ও শিখতে চান আর তাই নিজে কিছু-পরিমাণে মাথা ঘামাতেও ইচ্ছুক।

পদার্থবিজ্ঞানী প্রাকৃতিক ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করে থাকেন হয় সেইখানে যেখানে ওই সমস্ত ঘটনা ঘটে সবচেয়ে স্বাভাবিক ও লক্ষণীয় ধরনে এবং বিঘ্নসৃষ্টিকারী প্রভাব থেকে সবচেয়ে মুক্ত অবস্থায়, অথবা যেখানে ওই সমস্ত ঘটনা স্বাভাবিকভাবে ঘটানো সম্ভব সেই পরিবেশে পরীক্ষাগারে ঘটনাগুলিকে ঘটান তিনি। আলোচ্য এই বইয়ে আমাকে পরীক্ষা করে দেখতে হয়েছে উৎপাদনের পুঁজিতন্ত্রী পদ্ধতি এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ উৎপাদন-সম্পর্ক ও বিনিময়-সম্পর্কের ব্যবস্থা। এখনও পর্যন্ত এ-সবের ধ্রুপদী লীলাক্ষেত্র হল ইংলন্ড। আমার তত্ত্বগত ধ্যানধারণার বিকাশ ঘটাতে গিয়ে ইংলন্ডের নানা ব্যাপার যে প্রধান উদাহরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এটাই হল তার কারণ। তবে ইংলন্ডের শিল্প ও কৃষি-শ্রমিকদের এ-বইয়ে বর্ণিত অবস্থা দেখে যদি কোনো জার্মান পাঠক অবহেলাভরে কাঁধ-ঝাঁকানি দেন কিংবা আশাবাদীর ধরনে নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দেন যে আর যাই হোক জার্মানির অবস্থা ঠিক এতটা খারাপ নয়, তাহলে আমি তাঁকে স্পষ্ট করেই বলব: 'De te fabula narratur!'*

বস্তুত, পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন-ব্যবস্থার স্বাভাবিক নিয়মগুলি থেকে সঞ্জাত সামাজিক নানা দ্বন্দ্বের অপেক্ষাকৃত বেশি বা কম মাত্রার বিকাশের প্রশ্ন এটি নয়। এটি হল ওই সমস্ত নিয়মেরই সমস্যা, অবশ্যম্ভাবী নানা ফলাফলের অভিমুখে লৌহদৃঢ় প্রয়োজনীয়তার বশে বিকাশমান ওই সমস্ত প্রবণতারই প্রশ্ন এটি। শ্রমশিল্পে অপেক্ষাকৃত বেশি উন্নত দেশ অপেক্ষাকৃত কম উন্নত দেশকে তার নিজের ভবিষ্যতের ছবিটিই দেখাচ্ছে মাত্র।

কিন্তু এছাড়া আরও কথা আছে। পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন-ব্যবস্থা যেখানে

---

* 'Mutato nomine de te fabula narratur' (মেশাই, নাম বদলে গেলেও কাহিনীটি আপনার সম্বন্ধেই নয় কি)। হোরেস, 'ব্যঙ্গবিদ্রূপ', প্রথম খণ্ড, ব্যঙ্গ-১। —সম্পাঃ

আমাদের দেশে পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে (যেমন, কলকারখানাগুলিতে), সেখানকার অবস্থা কিন্তু ইংলন্ডের চেয়ে অনেক বেশি খারাপ। এর কারণ সেখানে ইংলন্ডের ফ্যাক্টরি-আইনের সঙ্গে পাল্লা দেবার মতো আইনকানুনের অভাব। এছাড়া অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে মহাদেশীয় পশ্চিম ইউরোপের বাকি সকল দেশের মতো আমরাও নিপীড়িত হচ্ছি কেবল যে পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন-ব্যবস্থার বিকাশের কারণে তা নয়, ওই বিকাশের অসম্পূর্ণতার কারণেও। আধুনিক নানা অমঙ্গলের পাশাপাশি আমরা উৎপীড়িত হয়ে চলেছি উত্তরাধিকারসূত্রে-পাওয়া একটি গোটা পর্যায়ক্রমিক বহুতরো অমঙ্গলের পেষণে, আর এই শেষোক্ত সব অমঙ্গলের উদ্ভব ঘটেছে কালাতিক্রমণ-দোষদুষ্ট অবশ্যম্ভাবী নানা সামাজিক-রাজনৈতিক সম্পর্ক সহ সেকেলে যত উৎপাদন-পদ্ধতির নিষ্ক্রিয় উদ্বর্তন থেকে। আমরা কষ্ট পাচ্ছি জীয়ন্ত সমাজ-ব্যবস্থার জন্যেই নয় শুধু, মৃত সমাজ-ব্যবস্থার জন্যেও। 'Le mort saisit le vif!'*

জার্মানির এবং বাকি মহাদেশীয় পশ্চিম ইউরোপের সামাজিক নানা ব্যাপারের পরিসংখ্যান ইংলন্ডের পরিসংখ্যানগুলির তুলনায় অনেক বেশি হেলাফেলায় ও বাজে ভাবে সংকলিত। তা সত্ত্বেও এই পরিসংখ্যানগুলি আসল অবস্থার আবরণ এতখানি উন্মোচিত করেছে যে তার ফাঁক দিয়ে দানবী মেডুসার মাথাটা এক-নজর আমরা ঠাহর করে দেখতে পাই। দেশের আসল অবস্থা যে কী তা দেখে আমরা আতঙ্কিত হয়ে উঠতাম যদি ইংলন্ডের মতো আমাদের গভর্নমেণ্ট ও পার্লামেণ্টগুলিও দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে তত্ত্বানুসন্ধানের জন্যে সময়ে-সময়ে তদন্ত-কমিশন নিযুক্ত করত; যদি সেই সমস্ত কমিশন আসল সত্য অবগত হওয়ার জন্যে অধিকারী হোত ইংলন্ডের কমিশনগুলির মতো একই ধরনের নির্বাধ ক্ষমতার; যদি আমাদের দেশে সম্ভব হোত এই ধরনের কাজের জন্যে ইংলন্ডের ফ্যাক্টরি-পরিদর্শকদের মতো অমন যোগ্য, অতখানি পক্ষপাতিত্বের দোষমুক্ত ও ওপরওয়ালাদের সম্পর্কে ভয়শূন্য মানুষ পাওয়া, ইংলন্ডের জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে চিকিৎসাবিৎ সংবাদদাতাদের, সেদেশের স্ত্রীলোকে ও শিশুদের শোষণ সম্পর্কে, গৃহ ও খাদ্য-পরিস্থিতি সম্পর্কে তদন্ত-কমিশনের সদস্যদের মতো মানুষ পাওয়া।

* 'মৃত ব্যক্তি মরণফাঁসে বেঁধে রেখেছে জীয়ন্তকে!' — সম্পাঃ

পারসিয়ুস যে-দানবীদের পশ্চাদ্‌গমন করেছিলেন তারা যাতে তাঁকে দেখতে না-পায় সেজন্যে তিনি একটি যাদু-টুপি মাথায় পরে নিয়েছিলেন। আর আমরা সেই যাদু-টুপি টেনে নামিয়ে আমাদের চোখ-কান ঢেকে রেখেছি আর দানবের অস্তিত্ব নেই ভেবে মনগড়া কল্পনার জগতে বিচরণ করছি।

এ-ব্যাপারে আমরা যেন আত্মপ্রতারণার আশ্রয় না নিই। আঠারো শতকে যেমন আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ (৪) ইউরোপীয় বুর্জোয়াদের কাছে সঙ্কেতঘণ্টা বাজিয়ে ডাক দিয়েছিল, তেমনই উনিশ শতকে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ (৫) ইউরোপীয় শ্রমিক শ্রেণীর কাছে ডাক পাঠিয়েছিল সঙ্কেতঘণ্টা বাজিয়ে। ইংলণ্ডে পরিবর্তনের প্রক্রিয়া এখন স্পষ্ট প্রতীয়মান। এই পরিবর্তন যখন একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে পৌঁছবে তখন ইউরোপ মহাদেশে তার প্রতিক্রিয়া ঘটবেই। সেখানে শ্রমিক শ্রেণীর নিজস্ব বিকাশের মাত্রা অনুযায়ী এই পরিবর্তনের ধরনটি হবে অপেক্ষাকৃত বেশি পাশবিক অথবা বেশি মানবিক অতএব, মহত্তর উদ্দেশ্য ইত্যাদির কথা বাদ দিলে, আপাতত যেগুলি শাসক-শ্রেণী সেই শ্রেণীগুলির নিজস্ব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থসমূহেরই তাগিদ থাকে শ্রমিক শ্রেণীর স্বাধীন বিকাশের পথে যে-সমস্ত বাধা আইনসঙ্গতভাবে দূর করা সম্ভব তা কার্যকর করে তোলার। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে এ-কারণেই এই গ্রন্থে আমি ইংলণ্ডের ফ্যাক্টরি-আইনের ইতিহাস, তার মর্মবস্তু ও ফলাফলের আলোচনায় এতখানি জায়গা ছেড়ে দিয়েছি। যে-কোনো জাতি অপর জাতিগুলির কাছ থেকে অনেক-কিছু শিখতে পারে ও তা শেখা উচিতও। তবে এ-ও ঠিক যে কোনো সমাজ তার অগ্রগতির স্বাভাবিক নিয়মগুলি আবিষ্কারের ক্ষেত্রে সঠিক রাস্তা ধরলেও (এবং আমার এই গ্রন্থের চূড়ান্ত লক্ষ্যই হল আধুনিক সমাজের গতিপথের অর্থনৈতিক নিয়মটি উন্মোচিত করে দেখানো), তার স্বাভাবিক বিকাশের ধারাবাহিক স্তরগুলি না লম্বা-লম্বা উল্লম্ফন না আইন পাশ কোনোকিছুর সাহায্যেই সেই সমাজের পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। কেবল সেই আলোচ্য সমাজ পারে এই স্তরগুলির জন্ম-যন্ত্রণাকে স্বল্পস্থায়ী করতে ও যন্ত্রণার তীব্রতা কমাতে।

প্রসঙ্গত, সম্ভাব্য ভুল-বোঝাবুঝি এড়ানোর জন্যে একটি কথা। পুঁজিতন্ত্রী ও সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীকে আমি কোনো অর্থেই গোলাপি রঙে চিত্রিত করে দেখাই নি। কেবল এ-গ্রন্থে যে-ব্যক্তিবিশেষদের কথা আলোচিত হয়েছে তাদের

উপস্থাপিত করা হয়েছে মাত্র অর্থনৈতিক স্তরসমূহের মূর্ত প্রতিনিধি হিসেবে, বিশেষ-বিশেষ শ্রেণী-সম্পর্ক ও শ্রেণী-স্বার্থের শরীরী প্রতীক হিসেবেই। আমার যে-দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সমাজের অর্থনৈতিক সংগঠনের ক্রমবিকাশকে জীববৃত্তান্তের একটি প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা হয়েছে, সে-অনুযায়ী সামাজিক দিক থেকে ব্যক্তিবিশেষ যে-সমস্ত পরিস্থিতির ক্রীড়নক তাকে সেই পরিস্থিতিগুলির জন্যে দায়ী করার (তা সে যতই নিজেকে আত্মমুখভাবে সেই পরিস্থিতিগুলির ঊর্ধ্বে তুলে ধরুক-না কেন) অবকাশ অন্য যে-কোনো দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে কম।

অর্থশাস্ত্র-আলোচনার ক্ষেত্রে মুক্তমন বৈজ্ঞানিক অন্বেষা অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের মতো কেবল-যে একই ধরনের শত্রুদের সম্মুখীন হয় তা-ই নয়। যে-উপাদান নিয়ে অর্থশাস্ত্রকে কাজ করতে হয় তার নিজস্ব বিশিষ্ট প্রকৃতিই শত্রু হিসেবে মুক্তমন বৈজ্ঞানিক অন্বেষার বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে এনে হাজির করে দেয় মানব-হৃদয়ের সবচেয়ে হিংস্র, নীচ ও বিদ্বেষ-ভরা প্রবৃত্তিগুলিকে, ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতিহিংসার দেবীগুলিকে। যেমন, উদাহরণস্বরূপ, ইংলণ্ডের সরকারের পৃষ্ঠপোষিত গির্জা (৬) তার সর্ববিধর ৩৯টি ধারার মধ্যে ৩৮টি ধারার ওপর আক্রমণকেই অপেক্ষাকৃত সহজে ক্ষমা করে দিতে প্রস্তুত তার আয়ের ১/৩৯ ভাগের ওপর আক্রমণের চেয়ে। বর্তমানে প্রচলিত ঐতিহ্যমূলক সম্পত্তিগত সম্পর্কগুলির বিরুদ্ধে সমালোচনার তুলনায় খোদ নিরীশ্বরবাদও culpa levis* বলে গণ্য। তৎসত্ত্বেও অগ্রগতির চিহ্ন অভ্রান্তরূপে স্পষ্ট। উদাহরণস্বরূপ, গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে প্রকাশিত 'ব্লু বুক'টির উল্লেখ করছি আমি (৭)। এটি হল 'Correspondence with Her Majesty's Missions Abroad, regarding Industrial Questions and Trades Unions'। এইসব চিঠিপত্রে ইংরেজ রাণীর বিদেশস্থ রাষ্ট্রদূতেরা একেবারে সরাসরি এই ভাষাতেই জানিয়েছেন যে জার্মানিতে, ফ্রান্সে, সংক্ষেপে বলতে গেলে ইউরোপ মহাদেশের সকল সভ্য রাষ্ট্রেই, পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে প্রচলিত সম্পর্কগুলির ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের মতোই মূলগত এক পরিবর্তনের লক্ষণ স্পষ্ট ও অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে।

---

* হাল্‌কা অপরাধ। — সম্পাঃ

আবার ওই একই সময়ে আটলান্টিক মহাসাগরের অপর পারে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের উপ-রাষ্ট্রপতি মিঃ ওয়েড জনসভায় ঘোষণা করেছেন যে ক্রীতদাস-প্রথা বিলোপের পরে পুঁজি এবং ভূ-সম্পত্তির ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্কগুলির বেলায় মূলগত এক পরিবর্তন একেবারে আসন্ন হয়ে উঠেছে। এ-সবই হল নতুন কালের সঙ্কেত, রক্তবর্ণ রাজপোশাক বা যাজকের কালো আলখাল্লা দিয়ে ঢেকে রাখা যাবে না এদের। অবশ্য এ-সবের অর্থ এই নয় যে আগামীকালই কিছু একটা অলৌকিক ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে। এগুলি কেবল দেখিয়ে দিচ্ছে যে খোদ শাসক-শ্রেণীগুলির মধ্যেই এই বিপদাশঙ্কা জেগে উঠছে যে বর্তমান সমাজ দৃঢ়বদ্ধ কোনো স্ফটিকখণ্ড নয়, তা এক পরিবর্তনশীল জীবদেহ এবং তার মধ্যে নিয়ত ঘটে চলেছে পরিবর্তন।

আমার এই রচনার দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচিত হবে পুঁজির সংবহন-প্রক্রিয়া (দ্বিতীয় বই) এবং মোটামুটিভাবে পুঁজিতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার রূপসমূহ (তৃতীয় বই) এবং তৃতীয় ও শেষ খণ্ডে (চতুর্থ বই) অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলির ইতিহাস।

বিজ্ঞানসম্মত সমালোচনার ভিত্তিতে গঠিত প্রতিটি মতামতকেই আমি স্বাগত জানাই। আর তথাকথিত জনমতের অন্ধ-সংস্কার, যাকে আমি কোনোদিন রেয়াত করে চলি নি, তার সম্বন্ধে যেমন আগে তেমনই এখনও আমার বক্তব্য হল মহান ফ্লোরেন্সবাসীর এই কথাকটিই:

'Segui il tuo corso, e lascia dir le genti!'*

কার্ল মার্ক্স

লণ্ডন, ২৫ জুলাই, ১৮৬৭

প্রথম প্রকাশিত হয় বইয়ে:
K. Marx. 'Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie'. Erster Band, Hamburg, 1867

প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে ১৮৯০ সালের চতুর্থ জার্মান সংস্করণের পাঠ অনুযায়ী
এঙ্গেলসের সম্পাদনা

---

* 'চলে যাও নিজ পথে, লোকে নিন্দা করে তো করুক!' দান্তে, 'দি ডিভাইন কমেডি', 'পুর্গাতোরিও', পঞ্চম সর্গ।—সম্পাঃ

কার্ল মার্কস

'পুঁজি' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১৮৭২ সালের দ্বিতীয় জার্মান সংস্করণের পরিশিষ্ট

এই দ্বিতীয় সংস্করণটিতে যে-সমস্ত পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে প্রথম সংস্করণের পাঠকদের সে-সম্বন্ধে অবগত করিয়ে আমাকে এই আলোচনা শুরু করতে হচ্ছে। প্রথম দৃষ্টিতেই পাঠক লক্ষ্য না-করে পারবেন না যে আলোচ্য এই বইখানির বিষয় বিন্যাস অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ। সর্বত্রই অতিরিক্ত মন্তব্যগুলিকে দ্বিতীয় সংস্করণের বিশেষ মন্তব্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মূল পাঠের ক্ষেত্রে আলোচিত নিচের বিষয়গুলিতে সংযোজন-পরিবর্তন ইত্যাদি হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ:

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম অংশে প্রতিটি ধরনের বিনিময়-মূল্যকে প্রকাশ করা হয় যে-সমস্ত গাণিতিক সমীকরণের সাহায্যে সেগুলির বিশ্লেষণ থেকে মূল্যের উৎপত্তি-নির্ণয়ের কাজটি অপেক্ষাকৃত কঠোরভাবে বৈজ্ঞানিক রীতি-পদ্ধতি অনুসরণের মধ্যে দিয়ে নিষ্পন্ন হয়েছে; এইরকম এ-বইয়ের প্রথম সংস্করণে মূল্যের সারবস্তু এবং সামাজিক দিক থেকে প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ের সাহায্যে মূল্যের পরিমাণ নির্ধারণের মধ্যেকার যে-সম্পর্কের ব্যাপারটি উল্লিখিত হয়েছিল পরোক্ষভাবে, এই সংস্করণে সেই সম্পর্কের ওপর জোর দেয়া হয়েছে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই। এছাড়া আগের সংস্করণের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় অংশটি ('মূল্যের বাস্তব রূপ') সম্পূর্ণতই এখানে সংশোধিত হয়েছে। এটি প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল আর কিছুর জন্যে না-হলেও অন্তত প্রথম সংস্করণে এই বিষয়টির দু'বার করে ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত হওয়ার কারণে। (প্রসঙ্গত বলি, এই বিষয়টির দু'বার করে এ-ধরনের ব্যাখ্যা দিতে হয়েছিল আমার হানোভার-বাসী বন্ধু ডঃ ল. কুগেলমানের পরামর্শক্রমে। ১৮৬৭ সালের

বসন্তকালে আমি যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম ঠিক তখনই সেখানে ওই প্রথম সংস্করণের প্রুফশিটগুলি হামবুর্গের ছাপাখানা থেকে গিয়ে পৌঁছয়, আর ডঃ কুগেলমান আমাকে তখন বোঝান যে অধিকাংশ পাঠকের কাছে ব্যাপারটি আরও বোধগম্য করে তোলার জন্যে মূল্যের বাস্তব রূপের আরও স্পষ্ট শিক্ষামূলক একটি ব্যাখ্যা সংযোজিত করা দরকার।) অতঃপর প্রথম অধ্যায়ের সর্বশেষ অংশও — 'পণ্যসামগ্রী-সম্পর্কিত বস্তুরতি, ইত্যাদি' — বহুপরিমাণে বদলানো হয়েছে। এছাড়া তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম অংশটিরও ('মূল্যের পরিমাপ') সতর্ক সংশোধন সাধিত হয়েছে, কেননা প্রথম সংস্করণে এই বিষয়টি আলোচিত হয়েছে বেশ কিছুটা অবহেলাভরেই — পাঠককে বলা হয়েছে 'Zur Kritik der politischen Oekonomie' বইটির ১৮৫৯ সালের বার্লিন-সংস্করণে যে-ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে তা দেখে নিতে। সপ্তম অধ্যায়, বিশেষ করে তার দ্বিতীয় অংশটি বহুপরিমাণেই পুনর্লিখিত হয়েছে।

এছাড়া মূল পাঠের অন্য সমস্ত আংশিক পরিবর্তনসাধন নিয়ে আলোচনা করাটা এখানে অর্থহীন হবে। কেননা প্রায়শই সে-সমস্ত নিছক লিখনশৈলী-সংক্রান্ত পরিবর্তন ছাড়া কিছু নয়। গোটা বই জুড়ে এরকম পরিবর্তনের সংখ্যা বড় কম নয়। তৎসত্ত্বেও প্যারিসে প্রকাশিতব্য এ-বইয়ের ফরাসি তর্জমাখানি পড়তে গিয়ে এখন আমি দেখতে পাচ্ছি যে মূল জার্মান বইখানির বেশ কয়েকটি অংশ বলতে গেলে আগাগোড়াই ঢেলে সাজা দরকার, অপর কয়েকটি অংশের পক্ষে দরকার কিছুটা বড় রকমের লিখনশৈলীগত সম্পাদনাসাধন এবং এছাড়া আরও কয়েকটি অংশের পক্ষে দরকার জায়গায়-জায়গায় অনবধানজনিত ত্রুটিবিচ্যুতির মনোযোগী সংশোধন। কিন্তু তখন এ-কাজের জন্যে হাতে যথেষ্ট সময় ছিল না। কারণ, অন্যান্য জরুরি কাজে ব্যস্ত থাকার সময় কেবলমাত্র ১৮৭১ সালের শরৎকালেই আমি জানতে পারলাম যে সংস্করণটি পুরো বিক্রি হয়ে গেছে এবং দ্বিতীয় সংস্করণের ছাপার কাজ শুরু হতে যাচ্ছে ১৮৭২ সালের জানুয়ারি মাসে।

জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর ব্যাপক মহলগুলিতে 'পুঁজি' বইখানি এত দ্রুত যে-প্রশংসা কুড়িয়েছে তা-ই আমি আমার কাজের সবসেরা পুরস্কার বলে মনে করি। ভিয়েনার জনেক কারখানা-মালিক হের মেয়ার অর্থনীতি-সংক্রান্ত ব্যাপারে যিনি বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গিরই অংশীদার — তিনিও ফ্রাঙ্কো-জার্মান

যুদ্ধের (৮) সময় একখানি পুস্তিকা (৯) প্রকাশ করে তাতে সঠিকভাবেই বলেছেন যে তত্ত্বব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যে-বিপুল ক্ষমতা একদা জার্মানদের উত্তরাধিকারসূত্রে-প্রাপ্ত ক্ষমতা বলে মনে করা হোত তা প্রায় সম্পূর্ণতই জার্মানির তথাকথিত শিক্ষিত শ্রেণীগুলির মধ্যে থেকে লোপ পেয়ে গেছে, অথচ বিপরীতপক্ষে জার্মানির শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে সেই বিশেষ ক্ষমতার পুনরুজ্জীবন।

বর্তমান মুহূর্তে জার্মানিতে অর্থশাস্ত্র এক বিদেশী বিজ্ঞানশাস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। গুস্টাভ ফন গ্যুলিখ তাঁর 'বাণিজ্য, শিল্প, ইত্যাদির ঐতিহাসিক বিবরণ'* নামের গ্রন্থে, বিশেষ করে ১৮৩০ সালে প্রকাশিত গ্রন্থটির প্রথম দুটি খণ্ডে, বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে দেখিয়েছেন জার্মানিতে পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন-পদ্ধতির বিকাশকে ও ফলত সেদেশে আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের গতি-প্রকৃতিকে ব্যাহত করেছে কোন ধরনের ঐতিহাসিক পরিস্থিতি। সুতরাং যে-মাটিতে অর্থশাস্ত্রের উদ্ভব ঘটে তারই অভাব দেখা দিয়েছে সেখানে। এরই ফলে এই 'বিজ্ঞান'কে আমদানি করতে হয়েছে একেবারে তৈরি মাল হিসেবে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স থেকে, আর এই শাস্ত্রের জার্মান অধ্যাপকেরা থেকে গেছেন স্কুলের ছাত্র হয়ে। ফলত তাঁদের হাতে পড়ে বিদেশের বাস্তবতার এই তত্ত্বগত প্রকাশ পরিণত হয়েছে বদ্ধমূল, অনড় কতগুলি ধ্যানধারণার সমষ্টিতে, আর এগুলির ব্যাখ্যা তাঁরা দিয়ে থাকেন তাঁদের চারপাশের ছোটখাট ব্যাবসার জগতের ধ্যানধারণা ও পরিভাষা অনুযায়ী। অর্থাৎ, তাঁরা আগাগোড়াই ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। পুরোপুরি যা চেপে রাখা যায় না বৈজ্ঞানিক চিন্তার ক্ষেত্রে এমন একটা অক্ষমতা-বোধ এবং সত্যিসত্যিই তাঁদের পক্ষে পরক এমন একটি বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হওয়ায় তাঁরা যে বিবেক-দংশন অনুভব করেন তা ঢেকে রাখতে খানিকটা প্রয়াস পান তাঁরা হয় সাহিত্য ও ইতিহাস-সংক্রান্ত পাণ্ডিত্যের ফুলঝুরি ছুটিয়ে আর নয়তো তথাকথিত 'কামেরাল' (জার্মান আইনসভা কিংবা প্রশাসকদের একদা-প্রবর্তিত বাণিজ্য-অভিমুখ অর্থনৈতিক নীতিসমূহ-সংক্রান্ত — অনু.) বিজ্ঞানসমূহ থেকে ধার-করা একান্ত পরক নীতিগুলির ভেজাল মিশিয়ে, ভাসাভাসা জ্ঞানের খিচুড়ি

* 'Geschichtliche Darstellung des Handels, der Gewerbe und des Ackerbaus', & c., von Gustav von Gülich. 5 vols, Jena. 1830-45..

বানিয়ে। আর জার্মান আমলাতন্ত্রের পদপ্রার্থী অসহায় উমেদারদের এই যন্ত্রণাভোগের নরক পার হয়ে যেতে হয়।

১৮৪৮ সাল থেকে পঃজিতন্ত্রী উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে জার্মানিতে এবং বর্তমানে তা ফটকাবাজি ও জুয়াচুরিতে পুরোপুরি জাঁকিয়ে উঠেছে। কিন্তু আমাদের পেশাদার অর্থনীতিবিদদের পক্ষে ভাগ্য এখনও প্রসন্ন নয়। অর্থশাস্ত্র নিয়ে সরাসরি আলোচনা করার উপযুক্ত হয়ে উঠলেন যখন তাঁরা, তখন জার্মানিতে আধুনিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বাস্তব অস্তিত্ব ছিল না। আর যখন সেই পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেল তখন তা গড়ে উঠল এমন ঘটনাচক্রে যা বুর্জোয়া জীবনের চৌহদ্দির মধ্যে থেকে সেই পরিস্থিতির সত্যিকার ও পক্ষপাতহীন পর্যালোচনা অসম্ভব করে তুলল। যেক্ষেত্রে অর্থশাস্ত্র ওই বুর্জোয়া সমাজ-জীবনের গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে থাকছে, অর্থাৎ যেক্ষেত্রে পঃজিতন্ত্রী ব্যবস্থাকে সামাজিক উৎপাদনের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে সাময়িক একটি ঐতিহাসিক পর্যায় হিসেবে না-দেখে তাকে দেখা হচ্ছে সামাজিক উৎপাদনের একেবারে চূড়ান্ত এক ব্যবস্থা হিসেবে, সেক্ষেত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত শ্রেণী-সংগ্রাম হয় প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকছে আর নয়তো তা আত্মপ্রকাশ করছে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ঘটনার আকারে — ততক্ষণ, একমাত্র ততক্ষণই ওই অর্থশাস্ত্র বিজ্ঞান হিসেবে অস্তিত্ব বজায় রেখে চলতে সমর্থ।

যেমন, ইংলণ্ডের কথা ধরা যাক। ইংলণ্ডের অর্থশাস্ত্র হল সেই যুগের বিজ্ঞান যখন সেদেশে শ্রেণী-সংগ্রাম অ-বিকশিত অবস্থায় ছিল। ব্রিটিশ অর্থশাস্ত্রের শেষ মহৎ প্রতিনিধি রিকার্ডো শেষপর্যন্ত তাঁর তত্ত্বানুসন্ধানের সূচনা-বিন্দু হিসেবে গ্রহণ করেন শ্রেণী-স্বার্থসমূহের পরস্পর-বিরোধকে, মজুরি ও মুনাফা, মুনাফা ও জমির খাজনার মধ্যেকার পরস্পর-বিরোধকে, এই পরস্পর-বিরোধকে সরল মনে প্রকৃতিদত্ত একটি সামাজিক নিয়ম হিসেবে মেনে নিয়ে। কিন্তু এই সূচনার সমকালেই বুর্জোয়া অর্থনীতির বিজ্ঞান সেই সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল, যে-সীমা অতিক্রমের সাধ্য ছিল না তার। রিকার্ডোর জীবদ্দশাতেই এবং তাঁর বিরুদ্ধে ওই বিজ্ঞানের সমালোচনা শুরু হয় সিস্‌মন্দির* রচনা দিয়ে।

* আমার 'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে', বার্লিন, ১৮৫৯'এর সংস্করণের ৩৯ পৃষ্ঠা দেখুন।

এর পরবর্তী পর্যায়, ১৮২০ থেকে ১৮৩০ সাল, ইংলণ্ডে স্মরণযোগ্য অর্থশাস্ত্রের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপের জন্যে। ওই সময়টা আবার রিকার্ডোর তত্ত্বের অতি-সরলীকরণ ও প্রসারণ এবং সেইসঙ্গে প্রাচীন ধারার সঙ্গে ওই তত্ত্বের প্রতিযোগিতা চলার জন্যেও স্মর্তব্য। এ-নিয়ে চমৎকার সব দ্বন্দ্বযুদ্ধও চলে তখন। এ-ব্যাপারে তখন কী কাণ্ড ঘটেছিল মূল ইউরোপ ভূখণ্ডে সাধারণভাবে তার সামান্যই জানা আছে, কেননা ওইসব তর্কবিতর্কের প্রায় সবটুকুই ছড়িয়ে আছে পত্র-পত্রিকা, সাময়িক সাহিত্য ও পুস্তিকায় খুচরো প্রবন্ধের আকারে। যদিও রিকার্ডোর তত্ত্ব, অবশ্য কোনো-কোনো বিরল ক্ষেত্রে, তখনই বুর্জোয়া অর্থনীতির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানোর হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগছিল, তবু এইসব তর্কবিতর্কের পক্ষপাতিত্বশূন্য চরিত্রের ব্যাখ্যা মেলে সে-সময়কার পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে। একদিকে তখন আধুনিক শিল্প নিজেই তার শৈশবাবস্থা থেকে সদ্য উত্তীর্ণ হচ্ছিল — এর প্রমাণ মেলে এই ঘটনাটি থেকে যে ১৮২৫ সালে সংকটের আবির্ভাবের সঙ্গে সেই প্রথম ঘটল শিল্পের আধুনিক জীবনের পর্যায়ক্রমিক চক্রের সূচনা। অন্যদিকে পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রামকে পেছনে ঠেলে দেয়া হচ্ছিল তখন — রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একদিকে বিভিন্ন গভর্নমেণ্ট ও 'পবিত্র মৈত্রীজোট'-এর (১০) চারপাশে জড়-হওয়া সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত শ্রেণী ও সরকারগুলি এবং অন্যদিকে বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত জনসমষ্টির মধ্যে বিরোধের কারণে; আর অর্থনৈতিক দিক থেকে শিল্প-পুঁজি ও সামন্ততান্ত্রিক ভূ-সম্পত্তির মালিকদের মধ্যে বিবাদের কারণে। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে এই শেষোক্ত বিবাদ ফ্রান্সে ছোট ও বড় ভূ-সম্পত্তির স্বার্থের মধ্যেকার বিরোধের কারণে তখন গুপ্ত অবস্থায় ছিল আর ইংলণ্ডে তা প্রকাশ্যে ফেটে পড়ে শস্যের আমদানি-নিয়ন্ত্রণ আইন-পাশের পরে (১১)। ওই সময়কার ইংলণ্ডের অর্থশাস্ত্র-সম্পর্কিত রচনাদি আমাদের মনে করিয়ে দেয় ফ্রান্সে ডঃ কেনে-র মৃত্যুর পর ঝোড়ো অগ্রগতির কথা, তবে 'স্যাঁ মার্তাঁর গ্রীষ্ম' যেভাবে আমাদের মনে করিয়ে দেয় বসন্তকালের কথা মাত্র সেইভাবে। অতঃপর ১৮৩০ সালে এল সেই নির্ধারক সংকট।

ফ্রান্সে ও ইংলণ্ডে বুর্জোয়া শ্রেণী ইতিমধ্যে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছিল। ফলে অতঃপর ওই দুটি দেশে যেমন কার্যক্ষেত্রে তেমনই তত্ত্বগতভাবেও শ্রেণী-

সংগ্রাম ক্রমশ বেশি-বেশি খোলাখুলি ভাষায় প্রকাশ পাচ্ছিল ও বিপজ্জনক আকার ধরছিল। বিজ্ঞানসম্মত বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের অন্ত্যেষ্টির ঘণ্টা বাজিয়ে দিল তা। অতঃপর প্রশ্নটি আর এইখানে সীমাবদ্ধ রইল না যে অমুক বা তমুক উপপাদ্যটি ঠিক কিনা, তখন প্রশ্ন দাঁড়িয়ে গেল, উপপাদ্য যা-ই হোক তা পুঁজির পক্ষে লাভজনক অথবা ক্ষতিকর, উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে উপযোগী অথবা অসুবিধাজনক, রাজনৈতিক দিক থেকে বিপজ্জনক অথবা বিপজ্জনক নয় কিনা, তার। স্বার্থলেশহীন তত্ত্বানুসন্ধানীর জায়গায় এবার দেখা দিল ভাড়াটে পেশাদার মল্লযোদ্ধার দল, খাঁটি বৈজ্ঞানিক গবেষণার স্থান নিল কৈফিয়তদাতার বিবেক-দংশন ও দুষ্ট মতলব। তবু, এমনকি শিল্পপতিদ্বয় কব্‌ডেন ও ব্রাইট-পরিচালিত শস্যের আমদানি-নিয়ন্ত্রণ আইনবিরোধী লীগের প্রচারিত জবরদস্তিমূলক যে-পুস্তিকাগুলি বিশ্বদুনিয়া ছেয়ে ফেলছিল সেগুলিরও বৈজ্ঞানিক না-হলেও ঐতিহাসিক কিছুটা মূল্য আছে ভূস্বামী অভিজাতদের বিরুদ্ধে সেগুলির যুক্তিতর্ক খাড়া করার চেষ্টার কারণে। কিন্তু তারপর স্যর রবার্ট পীল-প্রবর্তিত অবাধ বাণিজ্য-সম্পর্কিত আইন অতি-সরলীকৃত অর্থশাস্ত্রকে তার ওই শেষ নখদন্ত থেকেও বঞ্চিত করল।

১৮৪৮ সালের ইউরোপ-মহাদেশীয় বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ইংলণ্ডেও। যে-সমস্ত মানুষ তখনও পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক অন্বেষায় কিছু-পরিমাণে সামর্থ্যের অধিকারী বলে নিজেদের দাবি করছিল এবং শাসক শ্রেণীগুলির মোসাহেব ও নিছক কুতার্কিক ছাড়া আরও বড়কিছু বলে নিজেদের প্রমাণ করার বাসনা ছিল যাদের, তারা চেষ্টা করল পুঁজির অনুগত অর্থশাস্ত্রকে প্রলেতারিয়েতের যে-সমস্ত দাবিদাওয়া আর উপেক্ষা করা যাচ্ছে না তাদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে। অতএব দেখা দিল একধরনের অগভীর এক সমন্বয়সাধনের তত্ত্ব, যার সবসেরা প্রতিনিধি হলেন জন স্টুয়ার্ট মিল। এই তত্ত্ব হল বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের দেউলিয়াপনার আত্মঘোষণা। এ-সম্বন্ধে মহৎ রুশ পণ্ডিত ও সমালোচক ন. চের্নিশেভস্কি তাঁর 'মিল-এর ব্যাখ্যাত অর্থশাস্ত্রের রূপরেখা' বইটিতে গভীর মননের আলোকসম্পাত করেছেন।

ফলত, জার্মানিতে পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন-পদ্ধতি পূর্ণ-পরিণত অবস্থায়

পেঁছিয় যখন, ফ্রান্সে ও ইংলন্ডে শ্রেণীসমূহের প্রচণ্ড সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে ওই পদ্ধতির শত্রুভাবাপন্ন চরিত্রটি তার মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এবং, তদুপরি, ইতিমধ্যে জার্মান প্রলেতারিয়েত জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণীর চেয়ে অনেক বেশি স্বচ্ছ শ্রেণী-সচেতনার অধিকারী হয়ে উঠেছিল। ফলে অবশেষে ঠিক যে-মুহূর্তে অর্থশাস্ত্রের এক বুর্জোয়া বিজ্ঞান গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিল জার্মানিতে, বাস্তব কারণে তখনই তা অসম্ভব হয়ে উঠল।

এই অবস্থায় অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপকেরা ভাগ হয়ে গেলেন দুটি গোষ্ঠীতে। এর মধ্যে বিচক্ষণ, কেজো, ব্যবসাবুদ্ধি-সম্পন্ন একটি গোষ্ঠী ভিড় জমাল অতি-সরলীকৃত অর্থনীতির সবচেয়ে অগভীর — ও সেই কারণে সবচেয়ে উপযুক্ত — প্রতিনিধি বাস্তিয়ার নেতৃত্বে; আর তাঁদের বিজ্ঞান সম্বন্ধে অধ্যাপক-জনোচিত মর্যাদাবোধে গর্বিত অপর গোষ্ঠীর লোকজন একেবারেই খাপ খাওয়ানো যায় না এমন সমস্ত ব্যাপারকে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টায় ব্যাপৃত জন স্টুয়ার্ট মিলকে অনুসরণ করলেন। ফলে যেমন বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের ধ্রুপদী আমলে তেমনই তার অবক্ষয়ের যুগেও জার্মানরা রয়ে গেলেন নিছক ইশকুলের ছাত্র হয়ে, অনুকারক ও অনুসারক হিসেবে, বড়-বড় বিদেশী পাইকারি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের সেবায় নিযুক্ত ছোট-ছোট খুচরো কারবারী ও ফেরিওয়ালার ভূমিকায়।

অতএব জার্মান সমাজের অদ্ভুত ধরনের ঐতিহাসিক বিকাশ সেদেশে বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের সব রকমের মৌল গবেষণার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে, তবে তাই বলে ওই অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা কিন্তু বন্ধ হয় নি। এই সমালোচনা যেক্ষেত্রে কোনো শ্রেণীর মনোভাবের প্রতিনিধিত্ব করেছে সেক্ষেত্রে এর পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করা সম্ভব হয়েছে একমাত্র সেই শ্রেণীটির, ইতিহাসে যার সুনির্দিষ্ট কর্তব্য হল পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন-পদ্ধতির উচ্ছেদসাধন এবং সর্বপ্রকার শ্রেণীর চরম বিলোপসাধন। সেই বিশেষ শ্রেণী হল প্রলেতারিয়েত।

জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণীর শিক্ষিত ও অশিক্ষিত প্রবক্তারা প্রথম দিকে চেষ্টা করে বেমালুম চুপ করে থেকে 'পুঁজি'-কে খুন করার, আমার পূর্ববর্তী বইগুলিকে যেভাবে তারা খুন করেছিল ঠিক সেইভাবে। কিন্তু যখন তারা দেখল যে আজকের পরিস্থিতিতে তাদের সেই পুরনো কৌশল আর কাজে লাগছে না, তখন আমার বইখানিকে সমালোচনা করার ভড়ং দেখিয়ে 'বুর্জোয়া

মনকে ঘুম পাড়ানোর' ব্যবস্থাপত্র বাতলাল। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর সংবাদপত্রে তারা সম্মুখীন হল নিজেদের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী বিরোধীপক্ষের (*Volksstaat* (১২) পত্রিকায় ইয়োসেফ ডিট্‌সগেনের প্রবন্ধগুলি দেখুন), যাদের কাছে (আজও পর্যন্ত) তাদের জবাব দেয়া বাকি আছে।*

১৮৭২ সালের বসন্তকালে পিটার্সবুর্গে 'পংজি'র চমৎকার একখানি রুশ অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণের ৩ হাজার কপি ইতিমধ্যেই প্রায় বিক্রি হয়ে গেছে। এর আগে ১৮৭১ সালেই কিয়েভ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপক ন. জিবের তাঁর 'ডেভিড রিকার্ডোর মূল্য ও পংজি-সম্পর্কিত তত্ত্ব' নামের বইয়ে মূল্য, অর্থ ও পংজি-সম্পর্কিত আমার তত্ত্বটিকে মূল বক্তব্যের বিচারে স্মিথ ও রিকার্ডোর তত্ত্বগুলির প্রয়োজনীয় পরিণাম বলে উল্লেখ করেন। এই চমৎকার বইখানি পড়ার সময় যে-কোনো পশ্চিম ইউরোপীয়কে যে-ব্যাপারটি বিস্মিত না-করে পারে না তা হল বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক অবস্থানগুলি বোঝার ব্যাপারে গ্রন্থকারের সুস্থিত ও দৃঢ় ধারণাশক্তি।

'পংজি' বইয়ে যে-পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে খুব অল্প লোকেই যে তা

---

* জার্মান অতি-সরলীকৃত অর্থশাস্ত্রের মিষ্টভাষী আধো-আধো বুলি বলিয়ে প্রবক্তারা আমার বইয়ের রচনাশৈলীতে তীব্র আপত্তি জানিয়েছে। 'পংজি' বইটির রচনার সাহিত্যগত ত্রুটিবিচ্যুতি আমি নিজে যত তীব্রভাবে অনুভব করেছি এতখানি অনুভব করা আর কারও পক্ষে সম্ভব নয়। তবু উপরোক্ত ওই সমস্ত ভদ্রলোক ও তাদের পাঠকদের উপকার ও উপভোগের জন্যে এ-প্রসঙ্গে আমি একখানি ইংরেজি ও একখানি রুশদেশী সংবাদপত্রের দুটি উল্লেখের কথা বলতে চাই। আমার মতামত সম্পর্কে সর্বদাই শত্রুভাবাপন্ন ইংরেজি *Saturday Review* (১৩) পত্রিকা আমার বইয়ের প্রথম সংস্করণটির প্রকাশনার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছে: 'বিষয়টির উপস্থাপনা এমনই যে তা একেবারে নীরস অর্থনৈতিক সমস্যাগুলিকেও এক ধরনের নিজস্ব আকর্ষণে মণ্ডিত করেছে।' আর 'সান-পিতেরবুর্গস্কিয়ে ভিয়েদমোস্তি' (১৪) তার ২০ এপ্রিল, ১৮৭২, সংখ্যায় লিখছে: 'একটি কি দুটি বিশেষ অংশ ব্যতিক্রম হিসেবে বাদ দিলে সাধারণভাবে বিষয়টির উপস্থাপনা সাধারণ পাঠকের বোধগম্যতা, স্বচ্ছতা এবং আলোচ্য বিষয়ের বৈজ্ঞানিক জটিলতা সত্ত্বেও অসামান্য প্রাণবন্ত গুণের বিচারে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এই দিক থেকে গ্রন্থকার কোনো অংশেই... অধিকাংশ জার্মান পণ্ডিতের মতো নন... যাঁরা এমন এক নীরস ও দুর্বোধ্য ভাষায় গ্রন্থ রচনা করে থাকেন যে তার ধাক্কায় সাধারণ নশ্বর মানুষের মাথা চৌচির হবার উপক্রম হয়।'

বুঝেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় ওই পদ্ধতি সম্পর্কে পরস্পর-বিরোধী নানা ধ্যানধারণার প্রকাশ থেকে।

যেমন, প্যারিসের *Revue Positiviste* (১৫) আমাকে তিরস্কার করেছে এই বলে যে একদিকে আমি অর্থশাস্ত্রের বিচার-বিশ্লেষণ করেছি অধিবিদ্যার বিচারের ধরনে, আবার অন্যদিকে (ভাবুন একবার!) ভবিষ্যতের ভোজনালয়গুলির জন্যে রন্ধনপ্রণালী (সে কি কোঁতীয় প্রণালীর একটি?) না বাতলে আমি কিনা নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছি বাস্তব ঘটনাবলীর নিছক সমালোচনামূলক বিশ্লেষণে। পূর্বোক্ত ওই অধিবিদ্যা-সংক্রান্ত অভিযোগের জবাবে অধ্যাপক জিবেরের বক্তব্য হল এই:

'আসল তত্ত্ব নিয়ে বইটিতে যেখানে আলোচনা রয়েছে সেখানে মার্কসের পদ্ধতি সমগ্র ব্রিটিশ অর্থশাস্ত্রের ধারার অবরোহী পদ্ধতি ভিন্ন অন্য কিছু নয়, আর ওই ধারার বৈশিষ্ট্য এই যে তার দুর্বলতা ও সবলতাগুলি সবসেরা তাত্ত্বিক অর্থশাস্ত্রীদের সাধারণ একটি ধর্ম।' (১৬)

মরিস ব্লক (তাঁর লেখা 'Les Théoriciens du Socialisme en Allemagne. Extrait du 'Journal des Économistes', Juillet et Août 1872' দেখুন) আবিষ্কার করে ফেলেছেন যে আমার লেখা নাকি বিশ্লেষণধর্মী এবং বলছেন:

'এই বইখানি শ্রীযুক্ত মার্কসকে সবচেয়ে বিশিষ্ট বিশ্লেষণধর্মী মননশক্তির অধিকারীদের শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করেছে।'

জার্মান পত্র-পত্রিকাগুলি অবশ্য 'হেগেলীয় কূটতর্কের অবতারণা' বলে হৈ-হল্লা জুড়েছে। সেন্ট-পিটার্সবুর্গের 'ভেস্ত্‌নিক ইয়েভ্রোপি' পত্রিকা (১৭) 'পুঁজি' বইটির শুধু উপস্থাপনার পদ্ধতি নিয়েই লেখা একটি প্রবন্ধে (১৮৭২ সালের মে-সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৪২৭ থেকে ৪৩৬)* বলেছে যে আমার তথ্যানুসন্ধানের পদ্ধতি কঠোরভাবে বাস্তববাদসম্মত, তবে দুঃখের কথা এই যে আমার বিষয়বস্তুর উপস্থাপনার পদ্ধতি জার্মান দ্বন্দ্বতত্ত্বভিত্তিক। পত্রিকাটি বলছে:

---

* ই. ই. কাউফমান লিখিত একটি প্রবন্ধের উল্লেখ এটি। — সম্পাঃ

'প্রথম দৃষ্টিতে, বিষয়বস্তুর উপস্থাপনার বাহ্য রূপের ওপর ভিত্তি করে বিচার করতে গেলে বলতে হয় যে মার্কস হলেন ভাববাদী দর্শনশাস্ত্রীদের মধ্যেও সবচেয়ে ভাববাদী এবং তা সর্বদাই 'জার্মান' — অর্থাৎ কথাটির খারাপ — অর্থে। অথচ তথ্যের বিচারে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে সমালোচনার ব্যাপারে, তিনি তাঁর সকল পূর্বসূরীর চেয়ে বহুগুণে বেশি বাস্তববাদী। কোনো অর্থেই তাঁকে ভাববাদী বলা যায় না।'

এই প্রবন্ধ-লেখকের সমালোচনার প্রত্যুত্তর সবচেয়ে ভালোভাবে দেয়া যায় তাঁর নিজেরই প্রবন্ধ থেকে কয়েকটি অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে। রুশ ভাষায় লিখিত মূল প্রবন্ধটি যাঁদের পক্ষে পড়া সম্ভব নয় সেরকম কিছু-কিছু পাঠকের সুবিধার্থে আমি এখানে প্রবন্ধটির সেই অংশগুলি উদ্ধৃত করছি।

১৮৫৯ সালে বার্লিন থেকে প্রকাশিত আমার 'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে' (বার্লিন, ১৮৫৯, পৃষ্ঠা ৪-৭)* বইটির মুখবন্ধ-অংশে যেখানে আমি আমার অবলম্বিত পদ্ধতির বস্তুবাদী ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করেছি সেখান থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করে প্রবন্ধ-লেখক বলছেন:

'একটিমাত্র বিষয় মার্কসের কাছে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল তিনি যার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত সেই ইন্দ্রিয়গোচর ব্যাপারসমূহের নিয়ন্ত্রক নিয়মটি খুঁজে বের করা। এবং সুনির্দিষ্ট একটি ঐতিহাসিক যুগপর্বে যেক্ষেত্রে ওই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপারসমূহের সুনির্দিষ্ট একেকটি মূর্তরূপ ও তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কসূত্র পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে সেই ব্যাপারসমূহকে যা পরিচালনা করে একমাত্র সেই নিয়মটিই যে তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ তা নয়; তাঁর কাছে অধিকতর গুরুত্বের ব্যাপার হল ওই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপারসমূহের অবিরাম পরিবর্তনের, তাদের বিকাশের — অর্থাৎ একটি মূর্তরূপ থেকে অপর একটি মূর্তরূপে, একটি পর্যায়ের সম্পর্কসূত্রসমূহ থেকে অপর একটি পর্যায়ের সম্পর্কসূত্রসমূহে উত্তরণের নিয়ম। এই নিয়মটি আবিষ্কারের পর তিনি বিশদভাবে অনুসন্ধান করেছেন সামাজিক জীবনে যে-সমস্ত ফলাফলের মধ্যে দিয়ে নিয়মটি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে সেগুলি। ফলত, মার্কস কেবলমাত্র মনোযোগ দিয়েছেন একটি ব্যাপারে: তা হল, কড়াকড়িভাবে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মধ্যে দিয়ে সামাজিক সম্পর্কের ধারাবাহিক নির্ধারিত ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করা এবং যতদূর-সম্ভব নিরপেক্ষভাবে সেই তথ্যগুলির প্রতিষ্ঠা করা মৌল সূচনা-বিন্দু হিসেবে যে-সমস্ত তথ্য তাঁর কাজে লেগেছে। এ-উদ্দেশ্যে যদি তিনি এটা প্রমাণ করেন তাহলেই যথেষ্ট হয় যে ব্যাপারসমূহের বর্তমান ব্যবস্থা এবং অপর একটি ব্যবস্থা যাতে ওই প্রথমোক্ত ব্যবস্থাটি অবশ্যম্ভাবীরূপে উত্তীর্ণ

---

* বর্তমান সংস্করণের চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৯-১৪৩ দেখুন। — সম্পাঃ

হবে—একই সঙ্গে এই দুটিরই প্রয়োজনীয়তা; আর মানুষ এ-ব্যাপারটা বিশ্বাস করুক বা না-করুক, এ-ব্যাপারে তারা সচেতন হোক বা না-হোক, সব সত্ত্বেও এটা ঘটবে। সামাজিক গতিশীলতাকে প্রাকৃতিক ইতিহাসের একটি প্রক্রিয়া বলে গণ্য করেছেন মার্কস, যা নাকি পরিচালিত হয় এমন সব নিয়ম-অনুসারে যে-নিয়মগুলি শুধু-যে মানবিক ইচ্ছা-অনিচ্ছা, চেতনা ও বুদ্ধিবৃত্তি-নিরপেক্ষ তাই নয়, বরং উলটো—সেগুলিই নির্ধারণ করে মানুষের ইচ্ছা, চেতনা আর বুদ্ধিবৃত্তিকে।... সভ্যতার ইতিহাসে মানব-চৈতন্যের উপাদানটি যদি এতই পরনির্ভরশীল ভূমিকা পালন করে থাকে, তাহলে এটা স্বতই স্পষ্ট যে সভ্যতার ইতিহাস যার বিষয়বস্তু এমন সমালোচনামূলক অনুসন্ধানের ভিত্তি হিসেবে যে-কোনো ধরনের সচেতনা অথবা ওই সচেতনার যে-কোনো ফলাফল গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা অন্য যে-কোনো ব্যাপারের চেয়ে কম। এর অর্থ, মনুষের ধ্যানধারণা নয়, বস্তুগত ব্যাপারস্যাপারই একমাত্র ওই তত্ত্বানুসন্ধানের সূচনা-বিন্দু হিসেবে কাজ করতে পারে। এমন একটি অনুসন্ধান-কার্যকে নিবদ্ধ থাকতে হবে একটি তথ্যের সঙ্গে মানবিক ধ্যানধারণার নয়, বরং অপর একটি তথ্যের মুখোমুখি সংঘর্ষ ও প্রতিতুলনার ব্যাপারে। এই অনুসন্ধানের কাজে একটিমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল এই যে উপরোক্ত ওই দুটি তথ্যকেই যতদূর-সম্ভব নিখুঁতভাবে পর্যালোচনা করে দেখতে হবে এবং মনে রাখতে হবে যে আসলে ওই দুটি তথ্যই, একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে, একটি ক্রমবিবর্তনের ধারায় গতিবেগের ভিন্ন-ভিন্ন উৎস মাত্র। তবে এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল পরম্পর্যের ধারাটির কঠোর বিশ্লেষণ, যে-সমস্ত অনুক্রম ও গ্রন্থনার মধ্যে দিয়ে এমন একটি ক্রমবিবর্তনের বিভিন্ন স্তরের উপস্থাপনা প্রকাশ পায় সেগুলির কঠোর পর্যালোচনা। কিন্তু কেউ হয়তো বলবেন, অর্থনৈতিক জীবনের সাধারণ নিয়মগুলিকে বর্তমানে অথবা অতীতকালে যখনই প্রয়োগ করা হোক-না কেন সেগুলি সর্বদাই তো এক ও অভিন্ন থাকবে। মার্কস কিন্তু এরকম মত সরাসরি প্রত্যাখান করেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, এ-ধরনের বিমূর্ত নিয়মাবলীর অস্তিত্ব নেই।... বরং উলটো। তাঁর মতে, প্রতিটি ঐতিহাসিক যুগপর্বের আছে নিজস্ব নিয়মকানুন।... যখনই কোনো সমাজ তার বিকাশের নির্দিষ্ট স্তরটি অতিক্রম করে একটি নির্দিষ্ট স্তর থেকে অপর একটি নির্দিষ্ট স্তরে উত্তীর্ণ হতে থাকে, তখনই তা অপরাপর নিয়মকানুনের অধীন হতে শুরু করে। এক কথায়, অর্থনৈতিক জীবন আমাদের এমন একটি পরিস্থিতির সম্মুখীন করে যা জীববিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসের সদৃশ। প্রাক্তন অর্থনীতিবিদরা যখন অর্থনীতির নিয়মকানুনকে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার নিয়মকানুনের সঙ্গে তুলনা করেন তখন অর্থনীতির নিয়মকানুনের প্রকৃতিকে ভুল বোঝেন তাঁরা। সামাজিক ব্যাপারস্যাপারের অপেক্ষাকৃত বিশদ বিশ্লেষণের ফলে দেখা যায় যে সমাজদেহগুলি উদ্ভিদ ও জীবজন্তুদের মতোই মূলগতভাবে একে অপরের থেকে পৃথক। শুধু তা-ই নয়। এক এবং অভিন্ন একটি ব্যাপারও সমগ্রভাবে ওই সমস্ত সমাজদেহের ভিন্ন-ভিন্ন কাঠামো,

তাদের বিশিষ্ট স্বতন্ত্র সংগঠনগুলির মধ্যেকার ভিন্নতা, এই সমস্ত সংগঠন যেসব পরিস্থিতিতে কাজ করে তাদের মধ্যেকার পার্থক্য, ইত্যাদির ফলে সম্পূর্ণ বিভিন্ন নানা নিয়মকানুনের অধীন হয়ে পড়ে। যেমন, উদাহরণস্বরূপ, জনসংখ্যাবৃদ্ধি-সম্পর্কিত নিয়মটি যে সকল যুগে ও সকল জায়গায় এক, এই তত্ত্বটি প্রত্যাখ্যান করেন মার্কস। এর বিপরীতে তিনি বলেন যে সমাজ-বিকাশের প্রতিটি স্তরের নিজস্ব জনসংখ্যাবৃদ্ধি-সম্পর্কিত নিয়ম আছে।... উৎপাদন-শক্তির বিকাশের মাত্রায় তারতম্যের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক পরিস্থিতিসমূহ এবং ওই পরিস্থিতিসমূহের নিয়ন্ত্রক আইনকানুনেও তারতম্য ঘটে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পুঁজির প্রভাবাধীনে প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গতিপ্রকৃতি অনুসরণ ও তা ব্যাখ্যার কাজটি হাতে নিয়ে মার্কস যা করেছেন তা হল কড়কড়িভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তিনি কেবলমাত্র সূত্রবদ্ধ করে চলেছেন সেই লক্ষ্যটিই যেটি অর্থনৈতিক জীবনের প্রতিটি যথাযথ অনুসন্ধানের লক্ষ্য হওয়া উচিত।... এমন এক অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক মূল্য নিহিত একটি নির্দিষ্ট সমাজদেহের উৎপত্তি, অস্তিত্ব, বিকাশ ও তার মৃত্যু এবং অপর একটি উন্নততর সমাজদেহের প্রথমোক্ত ওই সমাজদেহের স্থান অধিকার করার ব্যাপারগুলি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে যে বিশেষ নিয়মকানুনগুলি সেগুলির উদ্ঘাটনে। আর সত্যি কথা বলতে কি, মার্কসের এই বইখানি ঠিক সেই মূল্যেরই অধিকারী।'

কিন্তু এই প্রবন্ধ-লেখক আমার আসল পদ্ধতি বলে এমনতরো লক্ষণীয় ও (সেই পদ্ধতি আমার নিজস্ব ধরনে প্রয়োগ সম্বন্ধে) উদারভাবে যা পরিবেশন করছেন তা আসলে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি ছাড়া আর কী?

অবশ্য উপস্থাপনার পদ্ধতিকে চেহারার দিক থেকে অনুসন্ধানের পদ্ধতি থেকে পৃথক হতেই হবে। অনুসন্ধানের সময় আত্মসাৎ করতে হবে বিশদভাবে নির্দিষ্ট উপাদানটিকে, এই উপাদানের বিকাশের বিভিন্ন ধরনকে বিশ্লেষণ করতে হবে, এই ধরনগুলির মধ্যেকার অভ্যন্তরীণ সংযোগসূত্রকে বের করতে হবে খুঁজে-পেতে। একমাত্র এই কাজটি চুকলে পর তবেই সত্যিকার গতিবেগকে পর্যাপ্তভাবে বর্ণনা করা সম্ভব হবে। আর এই কাজটি সফলভাবে করতে পারলে, আলোচ্য বিষয়ের জীবনটিকে আয়নায় প্রতিফলনের মতো করে একেবারে আদর্শ-অনুযায়ী উপস্থাপিত করতে পারলে, তবে মনে হতে পারে যে আমাদের সামনে অবরোহী পদ্ধতি-অনুযায়ী নির্মাণের নিছক একটি কাঠামো দেখতে পাচ্ছি।

আমার দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি কেবল-যে হেগেলীয় পদ্ধতি থেকে পৃথক তা-ই নয়, একেবারে সরাসরি তার বিপরীতও। হেগেলের তত্ত্ব অনুযায়ী, মানব-

মস্তিষ্কের জীবন-প্রক্রিয়াকে, অর্থাৎ মানুষের চিন্তার প্রক্রিয়াকে, 'ধ্যানধারণা' নাম দিয়ে তাকে এমনকি রূপান্তরিত করা হয়েছে অনন্যনির্ভর স্বাধীন একটি বিষয়ে; এ-তত্ত্বে 'ধ্যানধারণা'ই হল বস্তু-জগতের সৃষ্টিকর্তা, আর বস্তু-জগৎ 'ধ্যানধারণা'র বাহ্য, ইন্দ্রিয়গোচর আকারমাত্র। কিন্তু আমার কাছে এর বিপরীতে ধ্যানধারণা মানুষের মনে প্রতিফলিত ও চিন্তার অবয়বে রূপান্তরিত বস্তু-জগৎ ছাড়া আর কিছু নয়।

আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগে হেগেলীয় দ্বন্দ্বতত্ত্বের এই অতীন্দ্রিয় দিকটির আমি সমালোচনা করি। তখনও এই তত্ত্বটি ছিল ফ্যাশনদুরস্ত। কিন্তু পরে যখন আমি 'পুঁজি'র প্রথম খণ্ডটি লেখার কাজে ব্যস্ত তখন, সংস্কৃতিমান জার্মানিতে এখন যারা লম্বা-লম্বা কথা আওড়াচ্ছে সেই খামখেয়ালী, উদ্ধত ও মাঝারিদরের 'এপিগোনদের'* (১৮), শখ হল হেগেলের প্রতি সেইরকম আচরণ করার লেসিং-এর আমলে দুঃসাহসী মোজেস মেণ্ডেলসন যেমন আচরণ করেছিলেন স্পিনোজার প্রতি — অর্থাৎ, তাঁকে 'মৃত' বলে গণ্য করা। সে-কারণে নিজেকে আমি ওই বিপুল শক্তিধর চিন্তাবিদের শিষ্য বলে খোলাখুলি ঘোষণা করেছি এবং এমনকি এখানে-সেখানে, যেমন মূল্যের তত্ত্ব-সম্পর্কিত অধ্যায়ে, হেগেলের নিজস্ব বাক্‌ভঙ্গি ব্যবহারের নকলিয়ানার খেলা করেছি পর্যন্ত। হেগেলের হাতে দ্বন্দ্বতত্ত্ব অতীন্দ্রিয়তায় মণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও তা কোনোপ্রকারেই তাঁর পক্ষে পূর্ণাঙ্গরূপে ও সচেতনভাবে ওই তত্ত্বের সাধারণ কার্যকর রূপের প্রথম উপস্থাপনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। তবে তিনি এই তত্ত্বটিকে এর মাথা নিচের দিকে করে দাঁড় করিয়েছেন এইমাত্র। কিন্তু যদি এর অতীন্দ্রিয়বাদী খোলসের ভেতরকার যুক্তিবাদী শাঁসটুকুকে আবিষ্কার করা যায় তাহলে একে আবার মাথা ওপর দিক করে খাড়াভাবে দাঁড় করানো সম্ভব।

অতীন্দ্রিয়বাদের আকারে দ্বন্দ্বতত্ত্ব জার্মানিতে ফ্যাশন হয়ে দাঁড়ায়, কারণ লোকের ধারণা হয় যে তত্ত্বটি বুঝি সমাজের চলতি অবস্থাকে মর্যাদা ও মহিমা দান করছে। তবে এর যুক্তিবাদী আকারে বুর্জোয়াকুল ও তার অন্ধ তাত্ত্বিক অধ্যাপকদের কাছে এ-তত্ত্ব আবার কলঙ্কজনক ও ঘৃণ্য বলে গণ্য,

---

* এপিগোন — পরবর্তী ও অপেক্ষাকৃত কম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী পুরুষ। — অনু.

কারণ তাতে যেমন সমাজের চলতি অবস্থা ইত্যাদির উপলব্ধি ও তার অস্ত্যর্থক স্বীকৃতি অঙ্গীভূত, তেমনই ওই একই সঙ্গে ওই অবস্থাদির নিরাকরণ ও তার অবশ্যম্ভাবী অবসানের স্বীকৃতিও বিধৃত; কারণ এ-তত্ত্ব ঐতিহাসিক দিক থেকে বিকশিত প্রতিটি সমাজদেহকে যেন তা প্রবহমান গতির মধ্যে আছে বলে গণ্য করে এবং সে-কারণে তার অস্থায়ী প্রকৃতিকে তার ক্ষণিক অস্তিত্বের চেয়ে কম করে হিসাবের মধ্যে ধরে না; কারণ এ-তত্ত্ব কোনোকিছুকে এর ওপর কর্তৃত্ব করতে দেয় না এবং মূলত এটি একটি সমালোচনামূলক ও বিপ্লবী তত্ত্ব।

পুঁজিতন্ত্রী সমাজের গতিপথে নিহিত পরস্পর-বিরোধগুলি বাস্তববাদী বুর্জোয়ার মনে সবচেয়ে লক্ষণীয়ভাবে ছাপ ফেলে পর্যায়ক্রমিক চক্রের পরিবর্তনগুলি দিয়ে। এই পরিবর্তনগুলির মধ্যে দিয়েই আধুনিক শিল্পের জীবন কাটে এবং সেগুলির শীর্ষদেশে থাকে বিশ্বজনীন সংকট। এই সংকট ফের একবার ঘনিয়ে উঠছে, যদিও এখনও পর্যন্ত এটি আছে একেবারে প্রাথমিক স্তরে; আর যথাসময়ে এর কর্মক্ষেত্রের বিশ্বজোড়া ব্যাপ্তি ও ক্রিয়াকলাপের তীব্রতা দিয়ে এই সংকট এমনকি নবোদ্ভূত, পবিত্র প্রুশীয়-জার্মান সাম্রাজ্যের ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে-ওঠা ভুঁইফোড়দের মগজে পর্যন্ত দ্বন্দ্বতত্ত্বের প্রলয়বাদ্য বাজিয়ে দেবে।

কার্ল মার্কস

লন্ডন, ২৪ জানুয়ারি, ১৮৭৩

প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত
হয় বইয়ে: K. Marx.
'Das Kapital. Kritik
der politischen Oekonomie'.
Erster Band. Zweite
verbesserte Auflage
Hamburg, 1872

প্রবন্ধটি প্রকাশিত
হয়েছে ১৮৯০ সালের
চতুর্থ জার্মান সংস্করণের
পাঠ অনুযায়ী

এঙ্গেলসের সম্পাদনা

কার্ল মার্কস

পুঁজি

চতুর্বিংশ অধ্যায়

তথাকথিত আদিম সঞ্চয়

১। আদিম সঞ্চয়ের রহস্য

ইতিপূর্বেই আমরা দেখেছি অর্থ কীভাবে পুঁজিতে রূপান্তরিত হয়, পুঁজির সাহায্যে উদ্বৃত্ত মূল্য তৈরি হয় কীভাবে এবং উদ্বৃত্ত মূল্য থেকে তৈরি হয় আরও পুঁজি। আবার পুঁজির সঞ্চয় পূর্বাহ্নেই ধরে নেয় উদ্বৃত্ত মূল্যের সম্ভাবনা, উদ্বৃত্ত মূল্য ধরে নেয় পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদনের উপস্থিতি এবং পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন পূর্বাহ্নেই ধরে নেয় পণ্য-উৎপাদনকারীদের হাতে প্রচুর পরিমাণ পুঁজি ও শ্রমশক্তির অস্তিত্ব। অতএব এই সমগ্র প্রক্রিয়াটি একটি দুষ্টচক্রের নিয়ত-আবর্তন বলে মনে হয়, যা থেকে আমরা প্রক্রিয়াটি বুঝতে পারি একমাত্র পুঁজিতন্ত্রী সঞ্চয় শুরু হওয়ার পূর্বে এক আদিম সঞ্চয়ের (অ্যাডাম স্মিথের ভাষায় 'previous accumulation'এর) অস্তিত্ব অনুমান করে নিয়ে। এই আদিম সঞ্চয় পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন-পদ্ধতির ফল নয়, তার সূচনার শর্তমাত্র।

অর্থশাস্ত্রে এই আদিম সঞ্চয়ের ভূমিকা প্রায় ধর্মশাস্ত্রে-বর্ণিত আদি পাপের মতোই। আদম আপেল খাওয়ার ফলে মানবজাতি পাপে পতিত হয়। আদিকালের ওই উপাখ্যানের ধাঁচেই এখন চলতিকালের এই ঘটনাটিকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে সুদূর অতীতে পৃথিবীতে ছিল দু'ধরনের লোক: এক ধরনের লোক ছিল পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান, এবং সবচেয়ে বেশি করে যা উল্লেখ্য তা হল, এরা ছিল মিতব্যয়ী; অপর দিকে অন্য এক-ধরনের লোক ছিল, যারা ছিল অলস বদমায়েশ, অর্থসম্পদ উড়িয়ে-পুড়িয়ে দিত যারা এবং বিশেষ করে হৈ-হল্লা ও স্ফূর্তি করে অর্থের অপচয় ঘটাত যারা। ধর্মশাস্ত্রে-বর্ণিত আদি পাপের উপাখ্যান থেকে আমরা নিশ্চিতভাবেই জানতে পারি

কীভাবে অভিশপ্ত মানুষ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তার মুখের গ্রাস যোগাড় করতে বাধ্য হয়েছিল; কিন্তু অর্থনৈতিক আদি পাপের ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারছি যে এমন কিছু লোক আছে যাদের পক্ষে কোনোমতেই অপরিহার্য নয় এটা। তবে একথা থাক, এতে কিছু এসে-যায় না। আসলে এর ফলে ব্যাপারটা দাঁড়াল এই যে উপরোক্ত প্রথম ধরনের লোক সম্পদ সঞ্চয় করল এবং শেষোক্ত ধরনের লোকের অবশেষে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে তাদের নিজেদের গায়ের চামড়া ছাড়া বিক্রি করার মতো আর-কিছু রইল না। আর এই আদি পাপ থেকেই শুরু হল মানুষের বিপুল এক সংখ্যাধিকের দারিদ্র্য, যে-বিপুল সংখ্যক মানুষ সব রকমের পরিশ্রমে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত একমাত্র নিজেকে ছাড়া বিক্রি করার মতো আর কোনো বস্তুর মালিক নয়; অপরদিকে গড়ে উঠল অল্পকিছু লোকের বিপুল ঐশ্বর্য, এই সমস্ত লোক দীর্ঘকাল ধরে কাজ করা বন্ধ করে দিলেও এদের এই ঐশ্বর্যের পরিমাণ বেড়ে চলল অনবরত। ব্যক্তিগত সম্পত্তির সপক্ষে এই ধরনের আজগবি বালভাষণ দিনের-পর-দিন শোনানো হচ্ছে আমাদের। যেমন, উদাহরণস্বরূপ, একদা যাঁরা অমন spirituel* ছিলেন সেই ফরাসি জনসাধারণের কাছে মঁসিয়ে তিয়ের রীতিমতো কূটনীতিবিদের গাম্ভীর্য নিয়ে এই কথাটারই পুনরাবৃত্তি করার মতো দুঃসাহস রাখেন। কিন্তু যে-মুহূর্তে সম্পত্তির প্রশ্নটি ওঠে সেই মুহূর্তে সকল যুগের এবং সমাজ-বিকাশের সকল স্তরের পক্ষে একমাত্র উপযোগী মানসিক আহার হিসেবে শিশুপাঠ্য এই তত্ত্বকথাটি ঘোষণা করা হয় উচ্চকণ্ঠে। অথচ বাস্তব ইতিহাসে আগ্রাসন, দাসত্ব কায়েম, দস্যুবৃত্তি, নরহত্যা, সংক্ষেপে বলতে গেলে বলপ্রয়োগই যে প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ এ তো কুখ্যাত সত্য। অনাদি কাল থেকেই অর্থশাস্ত্রের সূক্ষ্ম, সুরুচিপূর্ণ বিবরণীগুলিতে রাখালিয়া নির্দোষ সারল্যের সুরটি প্রধান স্থান নিয়ে আছে। এইসব বর্ষ-বিবরণীর সমকালীন বছরটিকে অবশ্যই সর্বদা বাদ দিয়ে চিরকাল বলা হয়ে আসছে যে সম্পদ-সঞ্চয়ের একমাত্র উপায় হল অধিকার ও 'শ্রম'। অথচ সত্যি বলতে কি, আদিম সঞ্চয়-সংগ্রহের পদ্ধতিগুলি আর যা-ই হোক মোটেই তা রাখালিয়া নির্দোষ সারল্যের নিদর্শন নয়।

---

* মার্জিত রুচি, শোভনতা, অথবা সূক্ষ্ম মনোবৃত্তি-সম্পন্ন। — সম্পাঃ

আপনা থেকে অর্থ এবং পণ্যসমূহ যতখানি উৎপাদনের উপায় এবং জীবনধারণের উপায় তার থেকে বেশি করে সেগুলিকে পুঁজি হিসেবে গণ্য করা চলে না। আসলে সেগুলি পুঁজিতে রূপান্তরিত হবার জন্যে অপেক্ষমান। কিন্তু এই রূপান্তরণ-প্রক্রিয়া সম্ভব হয়ে উঠতে পারে একমাত্র বিশেষ কিছু-কিছু পরিস্থিতিতে যার ভিত্তি হয় এই ঘটনাটি — অর্থাৎ, রীতিমতো বিভিন্ন দুটি ধরনের পণ্যের অধিকারী যখন পরস্পরের সম্মুখীন হয় ও পরস্পর-সংস্পর্শে আসে। এদের মধ্যে একপক্ষ হল অর্থ, উৎপাদনের উপায় ও জীবনধারণের উপায়ের মালিক, যারা তাদের মালিকানাধীন মূল্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে উৎসুক হয়ে ওঠে অন্য লোকের শ্রমশক্তি কিনে নিয়ে; এছাড়া অন্যপক্ষ হল স্বাধীন শ্রমিককুল, যারা নিজ-নিজ শ্রমশক্তি ও ফলত শ্রমের বিক্রেতা। এই শ্রমিকেরা হল দুই অর্থেই স্বাধীন, কেননা একদিকে যেমন তারা ক্রীতদাস, মুচলেকাবদ্ধ দাস ইত্যাদির মতো উৎপাদনের উপায়ের অপরিহার্য অংশে পরিণত হয় না, তেমনই ভূমিস্বত্বভোগী কৃষকদের মতো উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিকানাও থাকে না তাদের হাতে। ফলত তারা হয় উৎপাদনের যে-কোনো রকমের উপায় থেকে বিচ্ছিন্ন বা স্বাধীন এবং এই সমস্ত উপায়-সম্পর্কিত দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত। পণ্যসমূহ বিক্রির বাজারের এই দ্বি-মেরুবর্তিতায় পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদনের মূলগত শর্তগুলি নিহিত। সর্বপ্রকার সম্পত্তি, যাকে উপায় হিসেবে ব্যবহার করে শ্রমিকেরা তাদের শ্রমকে কাজে লাগাতে পারে, তেমন সবকিছু থেকে শ্রমিকদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতাই হল পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থার একটি পূর্বশর্ত। পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন যে-মুহূর্তে একবার নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে, সেই মুহূর্ত থেকে তা যে এই বিচ্ছিন্নতাকে কেবল বজায় রেখে চলতে থাকে তা-ই নয়, ক্রমাগত ব্যাপক হারে তা বাড়িয়েও চলে। অতএব যে-প্রক্রিয়া পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থা প্রবর্তনের পথ প্রশস্ত করে দেয় তা শ্রমিকের কাছ থেকে তার উৎপাদনের উপায়ের মালিকানা ছিনিয়ে নেয়ার প্রক্রিয়া ভিন্ন অন্যকিছু হতে পারে না। এ হল সেই প্রক্রিয়া যা একদিকে জীবনধারণের উপায় ও সামাজিক উৎপাদনের উপায়কে রূপান্তরিত করে পুঁজিতে, অন্যদিকে সাক্ষাৎ উৎপাদনকারীদের পরিণত করে মজুরিনির্ভর-শ্রমিকে। অতএব তথাকথিত আদিম সঞ্চয় উৎপাদনকারীকে উৎপাদনের উপায় থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার এক ঐতিহাসিক

প্রক্রিয়া ভিন্ন অপর কিছু নয়। এই সঞ্চয়কে 'আদিম' বলা চলে এইজন্যে যে এ হয়ে দাঁড়ায় পঃজির এবং তার আনুষঙ্গিক উৎপাদন-পদ্ধতির প্রাগৈতিহাসিক একটি স্তর।

পঃজিতন্ত্রী সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো থেকে উদ্ভূত হয়েছে। উপরোক্ত পরবর্তী সমাজ-কাঠামোর ভাঙনের ফলে মুক্তি পেয়েছে পূর্ববর্তী কাঠামোর উপাদানগুলি।

সাক্ষাৎ উৎপাদক বা শ্রমিক একমাত্র জমির সঙ্গে সংযুক্তি থেকে ছাড়া পাওয়ার এবং অন্যের ক্রীতদাসত্ব, ভূমিদাসত্ব অথবা মুচলেকাবদ্ধ দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার পরেই নিজের একটা বিলিবন্দেজের ব্যবস্থা করতে পারে। যেখানেই বাজার পাওয়া যায় সেখানেই নিজের পণ্যদ্রব্য বিক্রির জন্যে নিয়ে যাওয়ার অধিকারী শ্রমশক্তির স্বাধীন বিক্রেতা বনে যেতে হলে শ্রমিকের পক্ষে অবশ্যই এছাড়া দরকার পড়ে গিল্ডের শাসন, শিষ্য অথবা শিক্ষানবিসদের সম্পর্কে তাদের তৈরি নিয়মকানুন এবং শ্রম-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত তাদের অন্যান্য বাধা-নিষেধগুলির হাত এড়িয়ে যাওয়া। ফলত, যে-ঐতিহাসিক গতির ফলে উৎপাদনকারীরা মজুরিনির্ভর-শ্রমিকে পরিণত হয় তা একদিক থেকে ভূমিদাসত্ব ও গিল্ডগুলির শাসন-শৃঙ্খল থেকে তাদের মুক্তির সহায় বলে মনে হতে পারে, আর আমাদের বুর্জোয়া ইতিহাসবেত্তাদের কাছে একমাত্র স্বীকৃত সত্য হল ইতিহাসের এই দিকটিই। কিন্তু এর অপর একটি দিকও আছে। তা হল এই যে ওই সমস্ত মুক্তিপ্রাপ্ত দাস এর ফলে আত্মবিক্রয়কারীতে পরিণত হয় একমাত্র তাদের নিজ-নিজ উৎপাদনের সকল উপায় এবং পূর্ববর্তী সামন্ততান্ত্রিক বিধি-বন্দোবস্তের ফলে লব্ধ অস্তিত্বরক্ষার সকল প্রকারের নিশ্চয়তা তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়ায়। আর এই ব্যাপারের — সাক্ষাৎ উৎপাদনকারীদের দখলচ্যুতি ও উচ্ছেদের — ইতিহাস মানব-সমাজের ইতিবৃত্তে লেখা আছে রক্তের ও আগুনের অক্ষরে।

শিল্পের পঃজিপতি বা আজকের নতুন অধীশ্বরদের কেবল-যে কারুশিল্প-গিল্ডগুলির পরিচালকদের একদা স্থানচ্যুত করতে হয়েছিল তাই নয়, ঐশ্বর্যের উৎসগুলির অধিপতি সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদেরও স্থানচ্যুত করতে হয়েছিল তাদের। এই দিক থেকে পঃজিপতিদের সামাজিক ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়ার ব্যাপারটি সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামিত্ব ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘৃণ্য

নানা বিশেষ সুযোগ-সুবিধা এবং গিল্ডসমূহ ও উৎপাদনের স্বাধীন বিকাশ ও মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের অবাধ স্বাধীনতার ওপর তারা যে-বিধিনিষেধের শৃঙ্খল পরিয়ে দিয়েছিল সেই সবকিছুর বিরুদ্ধে জয়যুক্ত সংগ্রামের ফলাফল বলে মনে হতে পারে। আসলে কিন্তু শিল্পের বীরব্রতীরা শস্ত্রপাণি বীরব্রতীদের কৌশলে স্থানচ্যুত করতে সমর্থ হয়েছিল কেবলমাত্র যে-সমস্ত ঘটনার গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে তারা নিজেরাই ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ সেই সমস্ত ঘটনাকে নিজেদের কাজে লাগিয়ে। একদা জনেক মুক্তিপ্রাপ্ত রোমান ক্রীতদাস যে-উপায় অবলম্বন করে তার পৃষ্ঠপোষকের প্রভুতে পরিণত হয়েছিল, শিল্পের এই বীরব্রতীরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে ঠিক ততখানিই ঘৃণ্য উপায় আশ্রয় করে।

ঘটনা-বিকাশের যে-সূচনাবিন্দু একদা মজুরিনির্ভর-শ্রমিক ও সেইসঙ্গে পুঁজিপতির উদ্ভব ঘটিয়েছিল তা হল শ্রমিকের বশ্যতাস্বীকার। এক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটেছিল এই বশ্যতাস্বীকারের ধরন পরিবর্তনে, সামন্ততান্ত্রিক শোষণের পুঁজিতন্ত্রী শোষণে রূপান্তরিত হওয়ার মধ্যে। এই প্রক্রিয়ার বাস্তব পদক্ষেপ লক্ষ্য করতে হলে আমাদের খুব বেশি পেছনে তাকানোর দরকার নেই। যদিও পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদনের প্রথম সূচনার নিদর্শনগুলির সাক্ষাৎ আমরা পাই ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের কিছু-কিছু শহরে, বিক্ষিপ্তভাবে, সেই সুদূর ১৪শ কিংবা ১৫শ শতকেই, তবু সঠিকভাবে বলতে গেলে পুঁজিতন্ত্রী যুগ শুরু হয় ১৬শ শতকে। আর তখন যেখানেই এই যুগের আবির্ভাব ঘটেছে সেখানেই দেখা গেছে ভূমিদাস-প্রথার বিলোপ ঘটে গেছে অনেক আগে এবং মধ্যযুগের উন্নতির সর্বোচ্চ নিদর্শন সার্বভৌম শহরগুলির অস্তিত্বেও ঘুণ ধরে গেছে অনেক আগে থেকেই।

আদিম সঞ্চয়-সংগ্রহের ইতিহাসে যে-সমস্ত বিপ্লব পুঁজিতন্ত্রী শ্রেণীর উদ্দেশ্যসাধনের উপায় হিসেবে কাজ করেছে তা-ই গণ্য হয়েছে যুগ-সৃষ্টিকারী হিসেবে। তবে সবচেয়ে বেশি করে স্মরণ করা হয়ে থাকে সেই মুহূর্তগুলিকে যখন বিপুল সংখ্যক মানুষকে অকস্মাৎ, বলপ্রয়োগে তাদের জীবনধারণের উপায়াদি থেকে উপড়ে নিয়ে শ্রমের বাজারে মুক্ত ও 'অসংসক্ত' প্রলেতারিয়ান হিসেবে ছুড়ে ফেলে দেয়া হয়েছে। কৃষককে জমি থেকে উৎখাত ও দখলচ্যুত করাই হল এই সমগ্র প্রক্রিয়াটির ভিত্তি। ভিন্ন-ভিন্ন দেশে বে-দখল করার এই

ইতিহাস বিভিন্ন ধরনে রূপ-পরিগ্রহ করেছে এবং ভিন্ন-ভিন্ন ক্রমপর্যায়ের দ্বারা অনুসরণ করে ও বিভিন্ন যুগপর্যায়ে তা এই প্রক্রিয়াটির বিভিন্ন স্তর পার হয়েছে। আমরা যে-দেশটিকে উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করেছি একমাত্র সেই ইংলণ্ডেই এই প্রক্রিয়াটি তার ধ্রুপদী রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।*

২। জমি থেকে কৃষিজীবী জনসংখ্যার উচ্ছেদসাধন

ইংলণ্ডে ভূমিদাস-প্রথা কার্যত লোপ পেয়েছিল ১৪শ শতকের শেষ চতুর্থাংশে। জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি অংশ** তখন এবং ১৫শ

---

* পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন যে-দেশে সবচেয়ে আগে বিকশিত হয়ে উঠেছিল সেই ইতালিতে ভূমিদাস-প্রথার অবলোপও ঘটেছিল অন্যান্য দেশের চেয়ে আগে। ওদেশে ভূমিদাস মুক্তি পেয়েছিল জমিতে তার ভোগদখলি-স্বত্বের অধিকার অর্জনের আগেই। ফলত দাসত্ব থেকে তার এই মুক্তি সঙ্গে সঙ্গেই তাকে পরিণত করে স্বাধীন প্রলেতারিয়ানে এবং তদুপরি সে তার নতুন প্রভুকে তার জন্যে প্রতীক্ষায় থাকতে দেখে, প্রায় সব ক্ষেত্রে রোমান আমল থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া, শহরগুলিতে। কিন্তু ১৫শ শতকের (১৯) শেষাশেষি বিশ্ব-বাজারের বিপ্লব যখন উত্তর ইতালির বাণিজ্যিক প্রাধান্যকে নষ্ট করে দিল, তখন আবার বিপরীত মুখে শুরু হল চলা। শহরগুলি থেকে শ্রমিকেরা তখন দলবদ্ধভাবে বিতাড়িত হল গ্রামাঞ্চলে এবং এর ফলে অচিন্তিতপূর্ব এক আবেগের তাড়নায় বাগান করার মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠল এক 'petite culture' (ছোটখাট ছিমছাম সংস্কৃতি)।

** 'ছোট-ছোট জোতজমির মালিক যারা নিজের হাতে জমি চাষ করত এবং অল্পস্বল্প আইনগত অধিকার ভোগ করত... তারা বর্তমানের চেয়ে জাতিটির অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ ছিল। ওই যুগের সবসেরা পরিসংখ্যান-রচয়িতাদের কথা বিশ্বাস করলে বলতে হয়, ১ লক্ষ ৬০ হাজারের কম হবে না এমন জোতজমির মালিক, পরিবারবর্গ সহ যারা দেশের সমগ্র জনসংখ্যার এক-সপ্তমাংশের বেশিই ছিল, তারা জীবিকানির্বাহ করত ছোট-ছোট লাখেরাজ জোতজমি থেকে। এই সমস্ত ছোট জোতমালিকের গড়পড়তা আয়... ছিল হিসাব-অনুযায়ী বছরে ৬০ থেকে ৭০ পাউন্ড। তখনই হিসাব করে দেখা গিয়েছিল যে যত লোক অন্যের জমি চাষ করে তাদের চেয়ে যে-সমস্ত কৃষক নিজের জমি চাষ করে তাদের সংখ্যা বেশি।' (Macaulay, 'History of England'. 10th ed., London, 1854, I, pp. 333, 334.) এমনকি ১৭শ শতকের শেষ তৃতীয়াংশেও ইংলণ্ডের চার-পঞ্চমাংশ লোকই ছিল কৃষিজীবী (উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে, পৃঃ ৪১৩)। আমি বিশেষ করে মেকলের লেখা

শতকে আরও অধিক সংখ্যায় গঠিত ছিল জমির মালিক মুক্ত কৃষকদের নিয়ে। ভূ-সম্পত্তিতে তাদের অধিকার নানা সামন্ততান্ত্রিক স্বত্বস্বামিত্বের সংজ্ঞার আড়ালে যতই চাপা থাকুক-না কেন, এ-ব্যাপারটি ছিল সত্যি। অপেক্ষাকৃত বড়-বড় জমিদারের তালুকে তার আগেকার আমলের ভূমিদাস পুরনো তত্ত্বাবধায়কদের জায়গায় নিযুক্ত হচ্ছিল তখন মুক্ত কৃষকরা। কৃষিতে মজুরিনির্ভর-শ্রমিকদের একটি অংশ ছিল কৃষক, এই কৃষকরা বড়-বড় তালুকে গতরে খেটে তাদের অবসর-সময়টুকু কাজে লাগাত। এছাড়া উপরোক্ত শ্রমিকদের অপর অংশটি ছিল অপেক্ষাকৃত ও অন্যনিরপেক্ষ উভয় দিক থেকেই সংখ্যায় সামান্য, এরা ছিল মজুরিনির্ভর-শ্রমিকদের স্বনির্ভর এক বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই শেষোক্ত শ্রমিকরা আবার কার্যত ওই একই সঙ্গে জোতমালিক কৃষকও ছিল, কেননা গতরে খাটার জন্যে মজুরি পাওয়া ছাড়াও ৪ একর কিংবা তারও বেশি আবাদী জমি সহ বসবাসের জন্যে কুঁড়েও পেত তারা। তাছাড়া অন্যান্য কৃষকদের সঙ্গে তারাও এজমালি জমি ভোগদখলের অধিকার পেত, ওই জমিতে গোরু-ভেড়া বা শুয়োর চরাবার অধিকার, এজমালি জমির অন্তর্ভুক্ত জঙ্গল থেকে কাঠ কাটার ও জ্বালানির জন্যে কাঠ ও পীট সংগ্রহের অধিকার, ইত্যাদি পেত তারা।* ইউরোপের সকল দেশেই সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যথাসম্ভব সবচেয়ে বেশিসংখ্যক অধীনস্থ সামন্ত-স্বত্বভোগীদের মধ্যে জমির বিলিবণ্টন। সার্বভৌম রাজার মতো সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদেরও শক্তিসামর্থ্য নির্ভর করত তাদের খাজনার পরিমাণ দিয়ে নয়,

---

থেকেই উদ্ধৃতি দিচ্ছি, কারণ ইতিহাসের রীতিমাফিক বিকৃতিসাধক হিসেবে তিনি এ-ধরনের তথ্যের গুরুত্ব যথাসম্ভব খাটো করে দেখাতে অভ্যস্ত।

* একথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে এমনকি ভূমিদাসরাও কেবল-যে তাদের গৃহসংলগ্ন জমির টুকরোর মালিক (প্রায়শই সেজন্যে খাজনা দিতে বাধ্য থাকলেও ওইসব জমির মালিক) ছিল তা-ই নয়, এজমালি জমির সহ-মালিকও ছিল তারা। 'কৃষক—(দ্বিতীয় ফ্রিডরিখের অধীনে, সাইলেসিয়ায়) ভূমিদাস।' তৎসত্ত্বেও এই সমস্ত ভূমিদাস এজমালি জমিতে অধিকার ভোগ করত। 'এ পর্যন্ত এজমালি জমি বিভক্ত করার জন্যে সাইলেসিয়াবাসীদের টেনে আনা সম্ভব হয় নি, আবার সেইসঙ্গে নেইমার্ক অঞ্চলে এমন একটি গ্রাম পর্যন্ত নেই যেখানে সফলভাবে জমির এই বাঁটোয়ারা সম্পন্ন হয় নি।' (Mirabeau. 'De la Monarchie Prussienne', Londres, 1788, t. II, pp. 125, 126.)

তাদের অধীনস্থ প্রজাদের সংখ্যা দিয়ে, আর এই শেষোক্ত সংখ্যা আবার নির্ভর করত কৃষক-জোতমালিকদের সংখ্যার ওপর।* অতএব যদিও নর্মান-বিজয়ের পরে (২০) ইংলণ্ডের জমিজায়গা বিলি হয়ে গিয়েছিল ব্যারনদের প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড জমিদারিতে এবং প্রায়শই এই সমস্ত জমিদারির একেকটির অন্তর্ভুক্ত ছিল ৯০০টির মতো পুরনো দিনের অ্যাংলো-স্যাক্সন জমিদারদের তালুক, তবু গোটা দেশ জুড়েই ছড়িয়ে ছিল ছোট-ছোট কৃষক-জোত আর একমাত্র সেগুলির ফাঁকে-ফাঁকে এখানে-ওখানে ছিল বড়-বড় জমিদারের তালুকগুলি। দেশের ভূমি-ব্যবস্থার এই অবস্থা আর এর সঙ্গে ১৫শ শতকের যা ছিল বিশেষ বৈশিষ্ট্য সেই শহরগুলির সমৃদ্ধি জনসাধারণের ঐশ্বর্যের কারক হয়েছিল, চ্যান্সেলর ফর্টেস্ক্যু যার অমন জাঁকালো বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর 'Laudibus legum Angliae' বইয়ে। তবে এই ঐশ্বর্যের পঁুজিতন্ত্রী ঐশ্বর্যে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।

পঁুজিতন্ত্রী উৎপাদন-পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপিত হয় যে-বিপ্লব থেকে তার প্রস্তাবনা-অংশ অভিনীত হয় ১৫শ শতকের শেষ তৃতীয়াংশ ও ১৬শ শতকের প্রথম দশক জুড়ে। ওই সময়ে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীন পোষ্য ব্যক্তিবর্গের দলকে-দল বরখাস্ত হওয়ার ফলে শ্রমের বাজারে এসে আছড়ে পড়ল বেশ একটা বড় সংখ্যার মুক্ত প্রলেতারিয়ানরা। এই উপরোক্ত সামন্ততান্ত্রিক পোষ্যদের সম্পর্কে স্যার জেমস স্টুয়ার্ট যথার্থই বলেছেন যে তারা 'অনর্থক ঘরবাড়ি ও প্রাসাদগুলিতে উপছে পড়েছিল সর্বত্রই' (২১)। নিজেই যা ছিল বুর্জোয়া বিকাশের ফসল সেই রাজশক্তি যদিও স্বৈরতন্ত্র অর্জনের সংগ্রামে ওই পোষ্যবর্গের দলগুলিকে সবলে ভেঙে দেয়ার ব্যাপারটিকে ত্বরান্বিত করে তুলেছিল, তবু এটা কোনোক্রমেই এ-ব্যাপারে একমাত্র নির্ধারক কারণ ছিল না। দেশের রাজা ও পার্লামেন্টের বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্যপূর্ণ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে বড়-বড় সামন্ত-ভূস্বামী জমি থেকে গায়ের জোরে কৃষককুলকে উৎখাত করে

* ভূ-সম্পত্তির বিশুদ্ধ সামন্ততান্ত্রিক সংগঠন ও দেশের বিকশিত ছোটখাট ছিমছাম সংস্কৃতি সহ জাপান ইউরোপীয় মধ্যযুগের অনেক বেশি-পরিমাণে সত্যিকার পরিচয়বাহী আমাদের সব ক'খানা ইতিহাস-গ্রন্থের চেয়ে, কেননা এই ইতিহাসের বইগুলি প্রায় সর্বক্ষেত্রে বুর্জোয়া অন্ধ-সংস্কারবশে লিখিত। মধ্যযুগকে মূল্যস্বরূপে বলি দিয়ে 'উদারনীতিক' সাজাটা ভারি সুবিধাজনক কিনা, তাই।

ও এজমালি জমিগুলি আত্মসাৎ করে তুলনারহিত বৃহত্তর সংখ্যক প্রলেতারিয়ান সৃষ্টি করেছিল তখন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে জমিতে এই কৃষকদের সামন্ততান্ত্রিক অধিকার ছিল সামন্ত-ভূস্বামীদের সমান। ফ্লেমিশ পশমী-বস্ত্রের উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় ও ইংলণ্ডে পশমের দাম সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষকদের জমি থেকে এই উৎখাতের প্রত্যক্ষ প্রেরণা পেয়েছিল ভূস্বামীরা। বড়-বড় সামন্ততান্ত্রিক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে পুরনো দিনের অভিজাতকুল বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আর নতুন অভিজাতকুল ছিল তার সমকালের যোগ্য প্রতিনিধি, তার কাছে অর্থই ছিল সকল শক্তির আদিশক্তি। তাই আবাদী জমিকে মেষচারণক্ষেত্রে পরিণত করাই ছিল এই নতুন অভিজাতকুলের রণধ্বনি। হ্যারিসন তাঁর 'Description of England. Prefixed to Holinshed's Chronicles' গ্রন্থে বর্ণনা করছেন কীভাবে ছোট-ছোট কৃষককে জমি থেকে উচ্ছেদের ফলে দেশ উৎসন্নে যাচ্ছে। তিনি বলছেন, 'আমাদের প্রতাপশালী অবৈধ দখলকারীদের পরোয়া কিসের!' এইভাবে কৃষকদের আবাসস্থল ও কৃষি-মজুরদের কুটিরগুলি ভেঙেচুরে মাটিতে মিশিয়ে দেয়া হল কিংবা পোড়োবাড়িতে পরিণত হতে দেয়া হল।

হ্যারিসন বলছেন, 'প্রতিটি মৌজার পুরনো দলিলপত্র যদি সন্ধান করিয়া দেখা যায়... তাহা হইলে অবিলম্বে ইহা প্রতীয়মান হইবে যে কিছু-কিছু মৌজায় সতেরো, আঠারো, বা বিশখানি করিয়া বাড়ির সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে... প্রতীয়মান হইবে যে ইংলণ্ডে বর্তমানে যেরূপ উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত লোকের অভাব ঘটিয়াছে এরূপ আর কখনও ঘটে নাই... দেখা যাইবে যে বৃহৎ নগরী ও ক্ষুদ্র শহরগুলি হয় সম্পূর্ণত ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে আর নয়তো আকারে এক-চতুর্থাংশ অথবা অর্ধেক হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে, যদিও এখানে-ওখানে এক-আধটি শহরের আকার সামান্য বৃদ্ধি পাইয়া থাকিতে পারে; যে-শহরগুলিকে ধূলিসাৎ করিয়া মেষচারণের উদ্দেশ্যে সমভূমিতে পরিণত করা হইয়াছে সেগুলিতে বর্তমানে ভূস্বামীবৃন্দের বাসগৃহ ব্যতীত আর কিছু দণ্ডায়মান নাই... প্রায় ইহাই বলিতে পারা যায়।'

পুরনো দিনের এই ধরনের ইতিবৃত্তকারদের অভিযোগগুলি যদিও সর্বত্রই অতিরঞ্জন ছাড়া কিছু নয়, তবু উৎপাদনের তৎকালীন অবস্থায় এই বিপ্লব সমকালবর্তীদের মনে কতখানি রেখাপাত করেছিল তার বিশ্বস্ত প্রতিফলন মেলে এগুলির মধ্যে। চ্যান্সেলর ফর্টেস্ক্যু ও টমাস মোর-এর

রচনাদির মধ্যে তুলনা করলে ১৫শ ও ১৬শ শতকের মধ্যে বিপুল পার্থক্যটি ধরা পড়ে। থর্নটন যথার্থই বলেছেন যে ব্রিটিশ শ্রমিক শ্রেণী স্বর্ণযুগ থেকে লৌহযুগে উত্তরণ ছাড়াই সমাজের তলানি হিসেবে গড়ে ওঠে।

এই বিপ্লব দেখে সাংঘাতিক ভয় পেয়ে গেল দেশের আইনপ্রণেতা কর্তৃপক্ষ। এই কর্তৃপক্ষ তখনও পর্যন্ত সভ্যতার সেই তুঙ্গে ওঠে নি, যেখানে 'জাতীয় সম্পদ' (অর্থাৎ, পুঁজির সংগঠন এবং ব্যাপক জনসমষ্টির বেপরোয়া শোষণ ও সর্বস্বাপহরণ) সকল রাষ্ট্রশাসন-কার্যের ultima Thule (শেষকথা) বলে গণ্য। সপ্তম হেনরি-সম্বন্ধীয় ইতিহাস-গ্রন্থে বেকন বলছেন:

'ওই সময়ে (১৪৮৯ সালে) আগের চেয়ে আরও ঘনঘন ঘেরাওয়ের কাজ চলতে থাকে, যার ফলে আবাদী জমিকে (জনসাধারণ ও পরিবারগুলির সাহায্য ছাড়া যাতে সার দেয়ার ব্যবস্থা করা যায় না) পরিণত করা হয় মেষচারণক্ষেত্রে, কয়েকজন মাত্র রাখাল ঘোড়ায় চড়ে যেখানে কাজ চালিয়ে দিতে পারে; এবং বাৎসরিক স্বত্ব, জীবন-স্বত্ব ও ইচ্ছাকালিক স্বত্বে (বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র কৃষকের যা ছিল জীবনধারণের উপায়) বন্দোবস্ত-করা প্রজাস্বত্বের জমিগুলিকে পরিণত করা হয় খাসতালুকে। এর ফলে জনসংখ্যার ক্ষেত্রে ক্ষয়ের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এবং (ফলত) ক্ষয়প্রাপ্ত হয় শহর, গির্জা, খাজনা, ইত্যাদি...। এই অস্বস্তিকর অবস্থার প্রতিকারের ব্যাপারে রাজার এবং পার্লামেন্টের বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায় প্রশংসনীয়ভাবে... ঘেরাও-করা জনশূন্য মৌজাগুলি ও জনশূন্য চারণভূমিগুলির দখল গ্রহণের বিরুদ্ধে পন্থা অবলম্বন করেন তাঁরা।'

সপ্তম হেনরির প্রবর্তিত ১৪৮৯ সালের একটি আইনের ১৯ নং ধারায় গৃহসংলগ্ন অন্ততপক্ষে ২০ একর করে জমি আছে এমন সকল কৃষকের বাড়ি ভেঙে ফেলা নিষিদ্ধ করা হয়। অষ্টম হেনরির রাজত্বের ২৫ম বর্ষে প্রবর্তিত একটি আইনের ওই একই নিষেধাজ্ঞার পুনর্নবায়ন সাধিত হয়। অন্যান্য বহু আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে এই আইনে বলা হয় যে অল্পকিছু লোকের হাতে পুঞ্জীভূত হয়েছে বহু খামার-জমি ও বিপুল সংখ্যক গবাদি পশু, বিশেষ করে ভেড়া, যার ফলে জমির খাজনা বহুগুণে বেড়ে গেছে এবং চাষের অধীন জমির পরিমাণ গেছে কমে, গির্জা এবং বাড়িগুলি ভেঙে ফেলা হয়েছে এবং অবিশ্বাস্য রকমের বিপুল সংখ্যক মানুষ নিজেদের ও পরিবারবর্গের জীবনধারণের উপায় থেকে বঞ্চিত হয়েছে। অতএব এই আইনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে ভগ্নদশাপ্রাপ্ত খামার-বাড়িগুলিকে পুনর্নির্মিত করতে হবে, ফসলের

জমি ও পশুচারণক্ষেত্রের আয়তনের মধ্যে নির্দিষ্ট একটি অনুপাত রক্ষা করে চলতে হবে, ইত্যাদি। ১৫৩৩ সালে জারি-করা অপর একটি আইনে বলা হয়েছে যে কিছু-কিছু গৃহপালিত পশুর মালিক ২৪ হাজার পর্যন্ত ভেড়া পুষেছেন, কিন্তু এই গৃহপালিত ভেড়ার সংখ্যা ঊর্ধ্বপক্ষে ২ হাজারের বেশি হলে চলবে না।* সপ্তম হেনরির রাজত্বকালের পরে ১৫০ বছর ধরে ছোট খামারী ও কৃষকদের জমি থেকে এই উচ্ছেদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ এবং বহুতরো আইনপ্রণয়ন একই রকম ব্যর্থ হল। এই সবকিছুর অকার্যকরতার রহস্য নিজে না-বুঝেই আমাদের কাছে ব্যক্ত করেছেন বেকন।

'Essays, Civil and Moral' গ্রন্থের ২৯-সংখ্যক নিবন্ধে বেকন বলছেন, 'খামার ও কৃষকদের বাস্তুভিটাগুলিকে একটি নির্দিষ্ট মান-অনুযায়ী বিন্যস্ত করার ব্যাপারে রাজা সপ্তম হেনরির কর্মকৌশল ছিল যেমন অনবদ্য তেমনই প্রশংসনীয়; অর্থাৎ, ওই বাস্তুভিটাগুলির সঙ্গে তিনি এমন পরিমাণ জমি যুক্ত করে দিয়েছিলেন যার ফলে প্রতিটি প্রজা স্বস্তিকর স্বচ্ছলতার মধ্যে জীবনধারণ করতে পারত, তাকে কোনো হীন শর্তাদির অধীন হতে হোত না এবং লাঙল যাতে জমির মালিকদের হাতে থাকে ও নিছক ভাড়াটিয়া লোকের হস্তগত না হয় তারও ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি।'**

---

* 'ইউটোপিয়া' নামের গ্রন্থে টমাস মোর লিখছেন যে ইংলণ্ডে 'আপনাদের মেষগুলি যাহারা নাকি পূর্বে এত শান্তশিষ্ট ছিল ও এত স্বল্প আহার গ্রহণ করিত, এখন শুনা যাইতেছে যে তাহারা এমন বিষম পেটুক ও এতই দুর্দান্ত হইয়া উঠিয়াছে যে খোদ মানুষগুলিকেই ধরিয়া ধরিয়া তাহারা চিবাইয়া খাইতেছে ও পানীয়ের সহিত গলাধঃকরণ করিতেছে।' ('Utopia', transl. Robinson, ed. Arber, London, 1869, p. 41.)

** স্বাধীন ও সম্পন্ন কৃষক-সম্প্রদায় এবং ভালোদরের পদাতিক সেনাদলের মধ্যে সম্পর্ক যে কতখানি ঘনিষ্ঠ তা দেখিয়েছেন বেকন। তিনি বলছেন, 'রাজ্যের প্রতাপ-প্রতিপত্তি ও ধরনধারণের সঙ্গে আশ্চর্যরকম সম্পর্কিত এই ব্যাপারটি; অর্থাৎ এমন সমস্ত খামারের অস্তিত্ব বজায় রাখা দরকার যেগুলির মান কৃষকদের দারিদ্র্যদশা থেকে মুক্ত রাখা ও সুস্থ-সবল দেহে বেঁচে থাকার পক্ষে পর্যাপ্ত হবে এবং যা রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত অধিকাংশ জমি ক্ষুদ্র কৃষক অথবা মধ্য-অবস্থার মানুষের দখলে ও নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখার ব্যাপারটিকে কার্যত বিধিবদ্ধ করবে, যাতে এই মধ্যবর্তীদের অবস্থা ভদ্রলোক-সম্প্রদায় এবং কুটিরবাসী ও দরিদ্র কৃষকের মাঝামাঝি থাকে।... কারণ, যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রশ্নে সবচেয়ে বিচক্ষণ মানুষজনের মধ্যে এই সাধারণ মতটি পরিপুষ্ট হতে দেখা গেছে যে... যে-কোনো সেনাবাহিনীর শক্তির প্রধান উৎস হল পদাতিক সৈন্যদল। এবং ভালোদরের পদাতিক-বাহিনী গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন পড়ে এমন সমস্ত লোকের, যারা লালিত

অন্যপক্ষে পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থা যা চাইছিল তা হল, জনসাধারণের এক ব্যাপক অংশের অধঃপতিত ও গোলামের মতো আজ্ঞাধীন অবস্থা, তাদের বেতনভুক জীবে এবং তাদের শ্রমের উপকরণকে পুঁজিতে রূপান্তরিত করা। এই রূপান্তরকরণের পর্যায়ে আইনপ্রণেতা কর্তৃপক্ষও চেষ্টা করে চলেছিল যাতে কৃষিতে মজুরিনির্ভর-শ্রমিকদের কুটিরের সংলগ্ন ৪ একর করে জমি বহাল থাকে এবং তা কুটিরে ভাড়াটে-অতিথি বসানো নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। ১৬২৭ খ্রীস্টাব্দে, প্রথম চার্লসের রাজত্বকালে, ফ্রন্ট মিল-এর রোজার ক্রোকারকে শাস্তি দেয়া হয়েছিল ফ্রন্ট মিল-এর তালুকের মধ্যে চিরস্থায়ী স্বত্বসাপেক্ষ ৪ একর সংলগ্ন জমি ছাড়াই একটি কুটির নির্মাণ করায়। এমনকি আরও পরে ১৬৩৮ খ্রীস্টাব্দে, প্রথম চার্লসের রাজত্বকালেই একটি রাজকীয় কমিশন নিযুক্ত করা হয় পুরনো দিনের আইনগুলিকে, বিশেষ করে গৃহসংলগ্ন ৪ একর জমি-সংক্রান্ত আইনটিকে, কার্যকর করে তোলার উদ্দেশ্যে। এমনকি ক্রমওয়েলের আমলেও গৃহসংলগ্ন ৪ একর জমি না-থাকলে লন্ডনের ৪ মাইলের মধ্যে কোনো বাড়ি তৈরি নিষিদ্ধ ছিল। এমনকি এই সেদিনও, অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধেও, কোনো কৃষি-মজুরের জন্যে নির্দিষ্ট কুটিরের সংলগ্ন এক কিংবা দুই একর জমি না থাকলে ঊর্ধ্বতন ভূস্বামীর বিরুদ্ধে

হয়েছে যো-হুকুম দাসমনোভাব ও অভাব-অনটনের মধ্যে দিয়ে নয়, বরং বেশকিছু পরিমাণে স্বাধীন ও স্বচ্ছল পরিবেশে। অতএব যদি কোনো রাষ্ট্র প্রধানত অভিজাত ও ভদ্রমণ্ডলীর মুখ চেয়ে চলে এবং কৃষক ও হলকর্ষক-সম্প্রদায় যদি ওই প্রথমোক্তদের নিছক আজ্ঞাবহ ও শ্রমিক কিংবা নিছক কুটিরবাসী (যারা মাথা গোঁজার আশ্রয়প্রাপ্ত ভিক্ষুক ছাড়া অন্য কিছু নয়) হিসাবেই থেকে যায়, তাহলে আমরা হয়তো ভালোদরের অশ্বারোহী-বাহিনী পেতে পারি, কিন্তু ভালোদরের স্থায়ী পদাতিক-বাহিনী কখনোই পাব না।... এই ব্যাপারটিই ঘটতে দেখা গেছে ফ্রান্সে এবং ইতালিতে এবং বিদেশের অপর কিছু-কিছু অংশে, যেখানে কার্যত আছে শুধু হয় অভিজাত নয় তো কৃষক-সম্প্রদায়... আর তা এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছেছে যে ওই সমস্ত দেশ তাদের পদাতিক-বাহিনী গড়ার জন্যে সুইজারল্যান্ডবাসী বা ওই ধরনের ভিনদেশী ভাড়াটিয়া লোকজনকে নিযুক্ত করতে বাধ্য হচ্ছে, ফলত অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে ওই সমস্ত জাতির লোকসংখ্যা প্রচুর হলেও তাদের নিজস্ব সৈন্য বলতে বিশেষ কিছু নেই।' ('The Reign of Henry VII etc. Verbatim Reprint from Kennet's England, ed. 1719'. London, 1870, p. 308.)

রীতিমতো অভিযোগ দায়ের করা হোত। বর্তমানে অবশ্য কোনো কৃষি-মজুর যদি গৃহসংলগ্ন ছোট্ট একটুকরো বাগান-জমি পায় কিংবা যদি কুটির থেকে অনতিদূরে এক একরেরও ভগ্নাংশ খানিকটা জমি ভাড়া নিতে পারে তাহলে তার ভাগ্য ভালো বলতে হবে।

ডঃ হান্টার বলছেন, 'জমিদার ও খামারী কৃষকরা এখানে পাশাপাশি কাজ করে থাকে। এখন যদি কৃষক-কুটিরের সঙ্গে কয়েক একর করে জমি জুড়ে দেয়া হয় তাহলে মজুররা বড় বেশি স্বাধীন হয়ে উঠবে।*

বলপ্রয়োগে সাধারণ মানুষকে জমি থেকে উচ্ছেদ করার প্রক্রিয়াটি ষোড়শ শতকে রিফর্মেশন (ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন) (২২) থেকে নতুন করে ভয়াবহরকম অনুপ্রেরণা পেল। এই আন্দোলনের ফলস্বরূপ ব্যাপকভাবে গির্জার সম্পত্তি লুণ্ঠনের মধ্যে দিয়েও অনুপ্রেরণা পেল এই প্রক্রিয়া। রিফর্মেশনের সময়ে ক্যাথলিক গির্জার ধর্মসংস্থাটি ইংলণ্ডের জমিজায়গার এক বিপুল অংশের সামন্ততান্ত্রিক মালিক ছিল। ওই সংস্থার ধর্মীয় মঠ ইত্যাদিকে দমন করার ফলে মঠের বাসিন্দারা নিক্ষিপ্ত হল প্রলেতারিয়েত শ্রেণীতে। গির্জার ভূ-সম্পত্তিগুলির প্রধান একটি অংশ হয় বিতরণ করা হল রাজপরিবারের ভূমিলোলুপ প্রিয়পাত্রদের মধ্যে আর নয়তো নামমাত্র মূল্যে সেগুলি বিক্রি করা হল ফটকাবাজ খামারী ও নাগরিকদের কাছে। এই শেষোক্তরা আবার উত্তরাধিকারসূত্রে অধিকারপ্রাপ্ত কোর্ফা-প্রজাদের সদলবলে জমি থেকে বিতাড়িত করল এবং তাদের ভিন্ন-ভিন্ন জমিগুলিকে মিলিয়ে-মিশিয়ে এক করে নিল। গির্জার ব্যয়নির্বাহের জন্যে নির্দিষ্ট সম্পত্তি ইত্যাদির একটি অংশ যা নাকি আগে আইনসঙ্গতভাবেই অপেক্ষাকৃত দরিদ্র মানুষজনের সম্পত্তি হিসেবে নির্ধারিত ছিল তা বাজেয়াপ্ত করা হল বিনা

---

* ডঃ হান্টার, 'Public Health. 7th Report 1864', London, 1865, p. 134. 'যে-পরিমাণ জমি (পুরনো দিনের আইনগুলিতে) বিলিব্যবস্থার জন্যে নির্ধারিত করে দেয়া হোত আজকের বিচারে তা শ্রমিকদের পক্ষে অতিরিক্ত বেশি বলেই গণ্য হবে, হয়তো বা মনে করা হবে যে এর ফলে কৃষি-মজুররা ছোট খামারীই বনে যাবে।' (George Roberts. 'The Social History of the People of the Southern Counties of England in Past Centuries'. London. 1856, pp. 184, 185.)

বাকাবায়ে।* সারা ইংলন্ড সফর করে এসে রানী এলিজাবেথ তখন সখেদে চেঁচিয়ে বলেছিলেন, 'Pauper ubique jacet' (২৩)। তাঁর রাজত্বের ৪৩শ বছরে ব্রিটিশ জাতি দরিদ্র-প্রতিপালনের জন্যে করের প্রবর্তন করে সরকারিভাবে নিঃস্বতাকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিল।

'এই আইনটির রচয়িতারা আইন-প্রণয়নের কারণ উল্লেখ করতে লজ্জা পেয়েছিলেন বলে মনে হয়, কেননা (প্রচলিত প্রথার অন্যথা ঘটিয়ে) এটির সঙ্গে কোনো প্রস্তাবনার অংশ যোগ করা হয় নি।'**

প্রথম চার্লসের রাজত্বের ১৬শ বর্ষে প্রবর্তিত চতুর্থ আইনে এই দরিদ্র-প্রতিপালনের জন্যে কর-ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী বলে ঘোষণা করা হয়, এবং সত্যি বলতে কি একমাত্র ১৮৩৪ সালেই এই আইনটি নতুন এক কঠোরতর আকার পায়।*** রিফর্মেশনের এই অব্যবহিত ফলাফলগুলি তার সবচেয়ে স্থায়ী

---

* 'গির্জার ব্যয়নির্বাহের জন্যে নির্দিষ্ট সম্পত্তি ইত্যাদির একটি অংশ দরিদ্রদের ভোগ করার অধিকার প্রাচীন সংবিধিগুলির ধারা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত।' (J. D. Tuckett. 'A History of the Past and Present State of the Labouring Population'. London, 1846, Vol. II, pp. 804, 805.)

** William Cobbett. 'A History of the Protestant Reformation', § 471.

*** প্রোটেস্ট্যান্ট-ধর্মের 'মর্মবাণী'টি অন্যান্য ব্যাপারে ছাড়াও নিচের এই ঘটনাগুলির মধ্যে লক্ষ্য করা যেতে পারে। ইংলন্ডের দক্ষিণাঞ্চলের কিছু-কিছু ভূস্বামী ও সম্পন্ন খামারী একত্র বসে মাথা ঘামিয়ে এলিজাবেথের আমলের দরিদ্র-সম্পর্কিত আইনটির যথার্থ ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে দশটি প্রশ্নের একটি তালিকা তৈরি করে। অতঃপর সেই প্রশ্নগুলি তারা মতামতের জন্যে উপস্থাপিত করে সে-যুগের প্রখ্যাত আইনজ্ঞ (পরে প্রথম জেমসের আমলে বিচারক হিসেবে নিযুক্ত) সার্জেন্ট স্নিগ-এর সমনে। ১-সংখ্যক প্রশ্ন — 'যাজক-পল্লীর অপেক্ষাকৃত ধনী কিছু খামারী একটি বেশ কৌশলপূর্ণ ফন্দি বের করেছে যার সাহায্যে এই আইনটি (এলিজাবেথের রাজত্বের ৪৩শ বর্ষে প্রবর্তিত আইন) কার্যকর করার ব্যাপারে যতকিছু ঝামেলা এড়ানো যেতে পারে। তারা প্রস্তাব করেছে যে আমরা যাজক-পল্লীতে একটি জেলখানা খাড়া করব, তারপর প্রতিবেশী পল্লীগুলিকে জানিয়ে দেব যে সেই পল্লীগুলির যে-সমস্ত ব্যক্তি এই যাজক-পল্লীর গরিবদের তাদের খামারের কাজে লাগাতে চায় তারা একটি নির্দিষ্ট দিনে বন্ধ লেফাফায় করে তাদের

প্রস্তাবগুলি পেশ করে আমাদের হেফাজত থেকে ওই গরিবদের ভাড়া নেয়ার নিম্নতম একটি গ্রহণযোগ্য দর জানাক এবং এ-ও জানাক যে ওই উপরিলিখিত জেলখানায় নেই এমন যে-কোনো ব্যক্তিকে কাজে নিতে অস্বীকার করার অধিকার তাদের আছে। এই পরিকল্পনা যারা পেশ করেছে তারা মনে করে যে তাদের আশপাশের জেলাগুলিতে এমন কিছু লোক পাওয়া যাবে যারা নিজেরা পরিশ্রম করতে চায় না এবং যাদের এত অর্থবল বা ঋণ সংগ্রহের যোগ্যতা নেই যে যা দিয়ে তারা খামারের ইজারা নেবে বা জাহাজ ভাড়া করবে যাতে বিনাশ্রমে জীবিকানির্বাহ করতে সমর্থ হয় তারা। এই সমস্ত লোক আলোচ্য যাজক-পল্লীর পক্ষে অত্যন্ত লাভজনক শর্তে প্রস্তাব পেশ করতে প্রলুব্ধ হতে পারে। এই সমস্ত ঠিকাদারের তত্ত্বাবধানে থাকার সময় যদি কোনো গরিবমানুষ মারা পড়ে, তাহলে তার পাপ অর্শাবে তত্ত্বাবধায়ক ঠিকাদারকেই, কেননা আলোচ্য যাজক-পল্লীটি গরিবদের প্রতি তার যথাকর্তব্য তৎপূর্বেই সমাধা করেছে বলে মনে করা যেতে পারে। তবে আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে যে এই ধরনের বিচক্ষণ ব্যবস্থা-অবলম্বন বর্তমান আইনের (এলিজাবেথের আমলের ৪৩শ বর্ষে প্রবর্তিত আইন) সমর্থন পাবে না। আপনাকে অবশ্য জানাতে পারি যে এই জেলার এবং এর সংলগ্ন অন্যান্য জেলার লাখেরাজ ভূ-সম্পত্তিভোগীরা সাগ্রহে মিলিত হয়ে তাদের প্রতিনিধিদের এইমর্মে নির্দেশ দিতে রাজি হয়ে যাবে যে তারা যেন এমন একটি আইনপাশের প্রস্তাব দেয় যে-আইনবলে যাজক-পল্লীর অধিকার জন্মাবে গরিবদের হাজতে আটক করে রাখার ও তাদের দিয়ে কাজ করানোর ব্যাপারে যে-কোনো ব্যক্তির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার এবং এইমর্মে ঘোষণা করে দেয়ার যে যদি কোনো গরিব মানুষ এইভাবে হাজতে আটক থাকতে ও কাজ করতে অস্বীকার করে তাহলে সে কোনোরকম ত্রাণ বা সাহায্য পাওয়ার অধিকারী হবে না। আশা করা যায় যে এই ব্যাপারটি সম্ভব হলে দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিরা আর ত্রাণ চাইতে পারবে না এবং যাজক-পল্লীগুলির অবনতির আর কারণ হবে না।' (R. Blakey. 'The History of Political Literature from the Earliest Times'. London, 1855, v. II, pp. 84, 85.) স্কটল্যাণ্ডে ভূমিদাস-প্রথার বিলোপ ঘটে ইংলণ্ডের থেকে কয়েক শতাব্দীর পরে। এমনকি ১৬৯৮ খৃস্টাব্দেও সালতুনের ফ্লেচর স্কটিশ পার্লামেণ্টে ঘোষণা করেন, 'হিসাব করে দেখা গেছে যে স্কটল্যাণ্ডে ভিক্ষুকের সংখ্যা ২ লক্ষের কম হবে না। এর একমাত্র প্রতিকার নীতিগতভাবে প্রজাতন্ত্রী হিসেবে আমি যা নির্দেশ করতে পারি, তা হল, পুরনো ভূমিদাস-প্রথার পুনঃপ্রবর্তন, যারা নিজেদের জীবনধারনের ব্যবস্থা করতে অপারগ এমন সকলকেই ক্রীতদাসে পরিণত করা।' ইডেন তাঁর 'The State of the Poor' (London, 1797. Book 1, ch. 1. pp. 60, 61) গ্রন্থে লিখছেন, 'কৃষক-প্রজাস্বত্ব হ্রাস পাওয়ার সময়টিই মনে হয় দরিদ্রদের উৎপত্তির যুগ বলে নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত হতে পারে। হস্তশিল্প-কারখানা ও বাণিজ্যই আমাদের জাতীয় দরিদ্রদের পিতামাতা।' আমাদের 'নীতিগতভাবে প্রজাতন্ত্রী' স্কচটির মতো ইডেনও

ফলাফল-যে ছিল তা নয়। গির্জার সম্পত্তি তৎকালীন ভূ-সম্পত্তির ঐতিহ্যগত পরিবেশে ধর্মীয় প্রাকার হিসেবে গড়ে উঠেছিল। সেই প্রাকারটিরই পতন ঘটায় উপরোক্ত ওই পরিবেশ বজায় থাকা আর সম্ভব ছিল না।*

এমনকি সপ্তদশ শতকের শেষ দশকেও ক্ষুদ্র কৃষককুল বা স্বাধীন কৃষকদের সেই সম্প্রদায়টি খামারীদের সম্প্রদায়ের চেয়ে সংখ্যায় ছিল বেশি। ক্রমওয়েলের ক্ষমতার মেরুদণ্ডস্বরূপ ছিল তারা, এবং এমনকি মেকলের স্বীকারোক্তি অনুযায়ীও মাতাল ভূস্বামী ও তাদের ভৃত্যবর্গ এবং প্রভুদের পরিত্যক্ত উপপত্নীদের বিয়ে করতে বাধ্য হোত যারা সেই গ্রাম্য যাজকদের চেয়ে ওই কৃষকরা ছিল উন্নত শ্রেণীর। ১৭৫০ সাল নাগাদ এই ক্ষুদ্র কৃষক-সম্প্রদায় বিলুপ্ত হয়ে যায়**, আর বিলুপ্ত হয়ে যায় অষ্টাদশ শতকের শেষ দশকের মধ্যে খেত-মজুরদের এজমালি জমির শেষ চিহ্নটুকুও। এখানে আমরা এই কৃষি-

---

ভুল করেছেন একটি ব্যাপারে। তা হল, কৃষক-প্রজাস্বত্ব লোপ করার কারণে নয়, কৃষি-মজুরের ভূ-সম্পত্তির বিলোপসাধনই তার প্রলেতারিয়ান ও পরিশেষে নিঃস্ব বনে যাওয়ার কারণ। ফ্রান্সে, যেখানে জমি থেকে উচ্ছেদের প্রক্রিয়াটি ঘটেছিল অন্য ধরনে, সেখানকার ১৫৬৬ সালের ম্যুলাঁসের নির্দেশনামা ও ১৬৫৬ সালের অনুশাসন ইংলন্ডের দরিদ্র-সম্পর্কিত আইনসমূহের অনুরূপ।

* অধ্যাপক রজার্স যদিও আগে প্রোটেস্টান্ট গোঁড়ামির লালনক্ষেত্র অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন, তবু তিনি 'কৃষির ইতিহাস' গ্রন্থের মুখবন্ধে জোর দিয়েছেন রিফর্মেশনের ফলে সংঘটিত ব্যাপ্ত জনসংখ্যার নিঃস্ব অবস্থায় অধঃপতিত হওয়ার এই ব্যাপারটির ওপর।

** 'A Letter to Sir T. C. Bunbury, Brt.: On the High Price of Provisions.' By a Suffolk Gentleman. Ipswich, 1795, p. 4 এমনকি বৃহদাকার খামারের সপক্ষে অমন-যে অতি-উৎসাহী প্রবক্তা, 'Inquiry into the Connection between the Present Price of Provisions and the Size of Farms etc.' London, 1773, p. 139 শীর্ষক গ্রন্থের সেই লেখক বলছেন, 'আমার সবচেয়ে বেশি আক্ষেপ এই যে আমাদের ক্ষুদ্র কৃষককুল, সেই সম্প্রদায়ের মানুষ যারা এই জাতির স্বাধীনতাকে সত্যিসত্যিই একদিন ঊর্ধ্বে তুলে রেখেছিল, তারা বিনষ্ট হয়ে গেছে। এটা দেখেও আমি দুঃখিত যে একচেটিয়া আগ্রাসপ্রবণ ভূস্বামীদের কবলিত ওই কৃষকদের জমিগুলি এখন ছোট-ছোট খামারীকে ইজারা দেয়া হয়েছে আর এই খামারীরা এমন শর্তে সেগুলির ইজারা পেয়েছে যাতে তারা পরিণত হয়ে গেছে যে-কোনো দুষ্টবুদ্ধি-প্রণোদিত ব্যাপারে তাদের ডাক পড়লে হুজুরে হাজির হতে প্রস্তুত প্রায় যো-হুকুম প্রজায়।'

বিপ্লবের বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক কারণগুলি একপাশে সরিয়ে রাখছি, আমরা শুধু আলোচনা করছি এ-ব্যাপারে বলপ্রয়োগে যে-উপায়গুলি অবলম্বন করা হয়েছিল সেগুলি নিয়ে।

স্টুয়ার্ট-রাজবংশের পুনঃক্ষমতাপ্রাপ্তির পর (২৪) ভূস্বামীবৃন্দ আইনসম্মত উপায় অবলম্বনেই পরস্ব আত্মসাৎ করার কাজটি চালিয়ে যায়, আর ইউরোপ মহাদেশ জুড়ে সর্বত্র এই কাজটি চলে কোনোরকম আইনগত আনুষ্ঠানিকতার তোয়াক্কা না-রেখেই। জমিতে সামন্ততান্ত্রিক ভোগদখলের শর্তাবলীর অবলোপ ঘটায় ওই ভূস্বামীবৃন্দ রাষ্ট্রের কাছে এই ভোগদখলজনিত দায়দায়িত্বের হাত থেকে মুক্তিলাভ করে এবং রাষ্ট্রকে এর 'ক্ষতিপূরণ' হিসেবে যোগায় তারা কৃষককুল ও বাকি ব্যাপ্ত জনসাধারণের কাছ থেকে আদায়-করা কর দিয়ে; যে-সমস্ত তালুকে আগে তাদের কেবলমাত্র সামন্ততান্ত্রিক স্বত্ব ছিল সেগুলিতে নিজেদের স্বার্থে এখন তারা কায়েম করে আধুনিক ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারাদি, এবং পরিশেষে প্রবর্তন করায় বসতি-সম্পর্কিত সেই সমস্ত আইনের খুঁটিনাটির বিবরণে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটিয়ে যেগুলি সম্পর্কে বলা যায় যে ব্রিটিশ খেত-মজুরদের ওপর সেগুলির প্রভাবের ফলাফল ছিল একেবারে সেইরকম রুশ কৃষককুলের ওপর যে-ফলাফল দেখা গিয়েছিল তাতার বরিস গদুনোভের রাজকীয় অনুশাসন জারি করার পরে (২৫)।

'Glorious Revolution' (গৌরবময় বিপ্লব) (২৬) অরেঞ্জের উইলিয়ম সহ উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎকারী ভূস্বামী ও পুঁজিপতিদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করল।* এরা নতুন যুগের উদ্বোধন ঘটাল ব্যাপক হারে রাষ্ট্রীয় জমিজায়গা চুরির মধ্যে দিয়ে; এই ধরনের চুরি এর আগে যে ঘটত না তা নয়, তবে তা

---

* এই বুর্জোয়া নায়কের ব্যক্তিগত নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে অন্যান্য অনেক-কিছুর সঙ্গে নিচের ঘটনাটিও উল্লেখ্য: '১৬৯৫ খ্রীস্টাব্দে আয়ার্ল্যান্ডে লেডি অর্কনেকে বিপুল পরিমাণ ভূমিদান রাজার অনুরাগের এবং ওই মহিলার প্রভাব-প্রতিপত্তির একটি প্রকাশ্য নিদর্শন... লেডি অর্কনে-র অমায়িক সেবাযত্ন foeda labiorum ministeria (বা প্রেমের নোংরামিভরা সেবাযত্ন)-এর একটি ফল বলে মনে করা হয়।' (ব্রিটিশ মিউজিয়মে সংরক্ষিত স্লোান-এর পাণ্ডুলিপি-সংগ্রহ, সংখ্যা—৪২২৪। পাণ্ডুলিপিটির শিরনাম: 'The Character and Behaviour of King William, Sunderland etc. as represented in Original Letters to the Duke of Shrewsbury from Somers, Halifax, Oxford, Secretary Vernon etc.' বইখানি আজব নানা ঘটনার বর্ণনায় পূর্ণ।)

ঘটত অপেক্ষাকৃত পরিমিতভাবে, রয়ে-সয়ে। এই সমস্ত তালুক বিতরণ করা হতে লাগল, বিক্রি করা হতে লাগল হাস্যকররকম স্বল্পমূল্যে, কিংবা এমনকি সরাসরি দখল করে নিয়ে ব্যক্তিগত তালুকগুলির সঙ্গে জুড়ে নেয়া হল।* আর এই সবকিছুই হল আইনগত শিষ্টাচার মেনে চলার বিন্দুমাত্র চেষ্টা ছাড়াই। এইভাবে জুয়াচুরির সাহায্যে আত্মসাৎ-করা রাজকীয় জমিজায়গা ও সেইসঙ্গে দস্যুবৃত্তির ফলে সংগৃহীত গির্জার মালিকানাধীন তালুকগুলিই (রিপাবলিকান বিপ্লবের ফলে এই শেষোক্ত তালুকগুলির মধ্যে যেগুলি ফের হস্তচ্যুত হয় নি সেগুলিই) আজকের দিনের ব্রিটিশ সংখ্যাল্পের শাসনাধীন সামন্ত-প্রভুদের জমিদারির ভিত্তি।** বুর্জোয়া পুঁজিপতিরা জমি আত্মসাতের এই ক্রিয়াকলাপের সমর্থক ছিল এই কারণে যে তারা মনে করত অন্যান্য ব্যাপারের সঙ্গে এটি জমি নিয়ে স্বাধীন বাণিজ্যের পথ মুক্ত করবে, বড়-বড় খামার গড়ে উঠবে ও সেখানে আধুনিক কৃষি-ব্যবস্থা প্রসারণের সুবিধা ঘটবে এবং এর ফলে তাদের হাতের কাছে জুটে যাবে অধিক পরিমাণে মুক্ত কৃষি-প্রলেতারিয়ানদের সরবরাহ। তাছাড়া, এইভাবে গড়ে-ওঠা নতুন জমিদার-অভিজাত সম্প্রদায় ছিল নতুন-গজানো ব্যাংক-মালিকতন্ত্রের, এই নবোদ্ভূত ফিনান্স-সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের এবং তৎকালে সংরক্ষণমূলক শুল্কসমূহের ওপর নির্ভরশীল বড়-বড় হস্তশিল্প-কারখানা-মালিকদের স্বাভাবিক মিত্র। ইংরেজ বুর্জোয়ারা তাদের নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে সুইডিশ বুর্জোয়া শ্রেণীর মতোই অতখানি বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ করেছিল; তবে ওই শেষোক্ত বুর্জোয়া শ্রেণীর ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটি ছিল বিপরীত, সুইডিশ বুর্জোয়ারা অর্থনৈতিক

---

* 'আংশিকভাবে বিক্রয় ও আংশিকভাবে ভূমিদানের মারফত রাজকীয় মহালগুলির বে-আইনী হস্তান্তর ইংলণ্ডের ইতিহাসের একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়... সমগ্র জাতির সঙ্গে এটি এক বিরাট জুয়াচুরির ব্যাপার।' (F. W. Newman. 'Lectures on Political Economy'. London, 1851, pp. 129, 130.) [কীভাবে ইংলণ্ডের বর্তমান বৃহৎ ভূস্বামীবৃন্দ তাদের সম্পত্তির অধিকারী হল সে-সম্পর্কে বিশদ বিবরণের জন্যে N. H. Evans. 'Our old Nobility. By Noblesse Oblige'. London, 1879 বইখানি দেখুন। — ফ. এঙ্গেলস]

** উদাহরণস্বরূপ, বেডফোর্ডের ডিউক-বংশ, যার একটি প্রশাখার অন্তর্ভুক্ত হলেন 'উদারনীতির মন্দাঘোড়া' লর্ড জন রাসেল, সে-সম্পর্কিত এ. বার্কের পুস্তিকাটি পড়ুন।

ক্ষেত্রে তাদের মিত্র কৃষক-সম্প্রদায়ের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে সুইডেনের রাজাদের সাহায্য করেছিল বলপ্রয়োগে রাজকীয় জমিজায়গা সংখ্যাল্প অধিকারভোগীর হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়ায়। এটা সেখানে ঘটেছিল ১৬০৪ সাল থেকে এবং পরে রাজা দশম কার্ল ও একাদশ কার্লের রাজত্বকালে।

ওপরে যার আলোচনা করা হল সেই রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি থেকে সর্বদাই স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট সাধারণের এজমালি সম্পত্তি ছিল সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার আওতায় টিকে-থাকা এক প্রাচীন টিউটনিক প্রথা। ইতিপূর্বেই আমরা দেখেছি সাধারণভাবে আবাদী জমিকে মেষচারণক্ষেত্রে পরিণত করার সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে এই এজমালি সম্পত্তিকে বলপ্রয়োগে আত্মসাৎ করার কাজটা শুরু হয় পঞ্চদশ শতকের শেষাশেষি ও তা চলে ষোড়শ শতকেও। তবে ওই সময়ে এই প্রক্রিয়াটিকে বলবৎ করা হচ্ছিল ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের সাহায্যে এবং এর বিরুদ্ধে দেশের আইনপ্রণেতা কর্তৃপক্ষ দেড় শো বছর ধরে বৃথাই লড়াই করে যাচ্ছিল। অষ্টাদশ শতকে এক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটেছিল এই দিক থেকে যে ততদিনে দেশের আইনকানুনই বদলে হয়ে দাঁড়িয়েছিল জনসাধারণের জমি চুরির হাতিয়ার, যদিও বড়-বড় খামারী তাদের নিজ-নিজ ছোটখাট স্বাধীন ব্যবস্থাদিও গ্রহণ করে চলেছিল ওইসঙ্গে।* এই ডাকাতির সংসদীয় চেহারাটা প্রকাশ পাচ্ছিল তখন 'Bills for Inclosures of Commons' থেকে; অর্থাৎ অন্যভাবে বলতে গেলে, সেই সমস্ত ডিক্রি যেগুলির সাহায্যে জনসাধারণের এজমালি জমি ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে জমিদাররা নিজেদের মধ্যে বিলি-বন্দোবস্ত করে নিচ্ছিল এবং জনসাধারণকে জমি থেকে উচ্ছেদ-

---

* 'খামারীরা কুটিরবাসীদের পক্ষে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে নিজেদের ও শিশুদের বাদ দিয়ে অপর কোনো জীবন্ত প্রাণীকে কুটিরে রাখা। এর অজুহাত এই যে যদি তারা কোনো জীবজন্তু কিংবা হাঁস-মুরগি পোষে তাহলে সেগুলির খাদ্য সংগ্রহের জন্যে কুটিরবাসীরা খামারীদের গোলা থেকে ফসল চুরি করবে। খামারীরা আরও বলে থাকে যে কুটিরবাসীদের দারিদ্র অবস্থায় ফেলে রাখ, তাহলে তারা পরিশ্রমে পরাঙ্মুখ হবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে আমার বিশ্বাস, আসল ঘটনা হল এই যে খামারীরা সাধারণের এজমালি জমিগুলির মালিকানার সম্পূর্ণ অধিকার নিজেরা আত্মসাৎ করে নিয়েছে।' ('A Political Inquiry into the Consequences of Enclosing Waste Lands'. London, 1785, p.75.)

সম্পর্কিত উক্তিসমূহ, ইত্যাদি থেকে। স্যার এফ. এম. ইডেন শঠতাপূর্ণ বিশেষ ওকালতি ফলিয়ে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে এজমালি সম্পত্তিগুলি আসলে হল গিয়ে সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদের স্থান নিয়েছে যারা সেই বড়-বড় জমিদারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছাড়া কিছু নয়, আবার নিজেই তিনি নিজের এই শঠ যুক্তিকে খণ্ডন করেছেন যখন তিনি দাবি জানিয়েছেন 'এজমালি জমিগুলি ঘেরাওয়ের জন্যে পার্লামেণ্ট থেকে একটি সাধারণ আইন' প্রণয়নের (অর্থাৎ, স্বীকার করেছেন এজমালি জমিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করার জন্যে সংসদীয় প্রবল হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা) এবং তদুপরি আইনসভার কাছে আহ্বান জানিয়েছেন জমির অধিকার-হারানো দরিদ্রদের ক্ষতিপূরণদানের ব্যবস্থা করার।*

একদিকে যেমন স্বাধীন ক্ষুদ্র কৃষকের স্থান অধিকার করেছিল ইচ্ছানুসারে-বসানো প্রজারা, অর্থাৎ বার্ষিক ইজারাদানের ভিত্তিতে বসানো ও জমিদারের খেয়ালখুশির ওপর নির্ভরশীল হীন আজ্ঞাধীন ইতরশ্রেণীর ছোট খামারীরা, তেমনই অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় ভূ-সম্পত্তি চুরির পরেই সাধারণের এজমালি জমির ওপর নিয়মমাফিক ডাকাতি বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল সেই সমস্ত বড় খামারকে ফাঁপিয়ে-ফুলিয়ে তুলতে অষ্টাদশ শতকে যেগুলিকে বলা হোত অর্থকরী খামার** অথবা বাণিজ্য-খামার*** এবং কৃষিজীবী জনসাধারণকে 'মুক্ত করে' দিতে পণ্যোৎপাদন শিল্পের জন্যে প্রলেতারিয়ান হিসেবে।

তবে অষ্টাদশ শতকে ঊনবিংশ শতকের মতো জাতীয় সম্পদ ও জনসাধারণের দারিদ্র্যের মধ্যে অভিন্নতা অতখানি পুরোপুরি স্বীকৃতি পায় নি। সে-কারণে প্রথমোক্ত শতকের অর্থনীতি-বিষয়ক সাহিত্যে 'এজমালি জমির ঘেরাও' নিয়ে অমন প্রবল তর্কবিতর্কের অবতারণা দেখা যায়। আমার

---

* ইডেন-লিখিত ইতিপূর্বে উল্লিখিত বইখানির মুখবন্ধ দেখুন।

** 'অর্থকরী খামার'। ('Two Letters on the Flour Trade and the Dearness of Corn'. By a Person in Business. London, 1767, pp. 19, 20.)

*** 'বাণিজ্য-খামার'। ('An Enquiry into the Causes of the Present High Price of Provisions'. London, 1767, p. 111, Note.) রচয়িতার ছদ্মনামে প্রকাশিত এই চমৎকার গবেষণা-কর্মটি রেভারেণ্ড নাথানিয়েল ফর্স্টারের পরিশ্রমের ফল।

হাতে এ-সম্পর্কিত যে-লিখিত উপাদানগুলি আছে তা থেকে আমি এমন অল্প কয়েকটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি যা ওই যুগের ঘটনাবলীর ওপর জোরালো আলোকসম্পাত করবে।

এক ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হয়ে লিখছেন, 'হার্টফোর্ডশায়ারের কয়েকটি যাজক-পল্লী জুড়ে গড়পড়তা ৫০ থেকে ১৫০ একর জমিবিশিষ্ট ২৪টি খামার ভেঙেচুরে গড়ে উঠেছে তিনটি বড় খামার।'* নর্দাম্পটনশায়ার ও লেস্টারশায়ারে এজমালি জমি ঘেরাও করে নেয়ার ব্যাপারটা রীতিমতো বিপুল হারে ঘটেছে এবং এই ঘেরাওয়ের ফলে গড়ে-ওঠা নতুন জমিদারিগুলিকে পরিণত করা হয়েছে মেষচারণ-ক্ষেত্রে। এর ফলে বহু জমিদারির অন্তর্ভুক্ত এলাকায় আগে যেখানে চাষবাস হোত ১,৫০০ একর জমিতে, এখন সেখানে বছরে ৫০ একর জমিতেও আবাদ হয় না। এ-সমস্ত জায়গায় এককালের বসতবাড়ি, গোলাঘর, আস্তাবল, ইত্যাদির ভগ্নাবশেষ' প্রাক্তন অধিবাসীদের বসতির একমাত্র চিহ্ন হিসেবে রয়ে গেছে। 'ঘেরাওয়ের আগে কিছু-কিছু গ্রামে যেখানে শ'খানেক বাড়ি ছিল ও তাতে শ'খানেক পরিবার বসবাস করত... সেখানে এখন বসতবাড়ি ও পরিবারের সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে আট থেকে দশের মতো।... বেশির ভাগ যাজক-পল্লীতে, যেখানে মাত্র ১৫ থেকে ২০ বছর আগে এজমালি জমিগুলি ঘেরাও করা হয়েছে, সেখানে জোতজমির মালিকের সংখ্যা এজমালি জমিগুলি ঘেরাওহীন বা মুক্ত অবস্থায় থাকার সময় যত ছিল বর্তমানে তার তুলনায় বহুগুণে হ্রাস পেয়ে সামান্য কয়েকজনে দাঁড়িয়েছে। আগে যে-সমস্ত জমিজায়গা ২০ বা ৩০ জন খামারী, সমসংখ্যক অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র চাষী-প্রজা ও জমির মালিকের হস্তগত ছিল, এখন সেই পরিমাণ জমি সুদ্ধ প্রকাণ্ড একেকটি ঘেরাও-করা জমিদারি ৪ বা ৫ জন ধনী মেষপালকের দখলে থাকাটা মোটেই কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। উপরোক্ত ওই সমস্ত খামারী, চাষী-প্রজা, ইত্যাদি তাদের পরিবারবর্গ এবং প্রধানত তাদের জমিতে কাজকর্মে নিযুক্ত ও ভরণপোষণ-প্রাপ্ত অন্যান্য বহু পরিবার সহ এইভাবে তাদের জীবিকার সংস্থান থেকে বিতাড়িত ও বঞ্চিত হয়েছে।'**

কেবলমাত্র পতিত জমিই নয়, প্রায়শই যে-সমস্ত জমি হয় যৌথভাবে আবাদ করা হচ্ছিল আর নয়তো গ্রামীণ সমাজকে নির্দিষ্ট পরিমাণ একটা খাজনা দিয়ে ভোগদখল করা হচ্ছিল সে-সবও ঘেরাওয়ের অজুহাত দেখিয়ে প্রতিবেশী জমিদাররা দখল করে নিয়েছিল।

---

* Thomas Wright, 'A short Address to the Public on the Monopoly of Large Farms', 1779, pp. 2, 3.

** Rev. Addington. 'Inquiry into the Reasons for or against Inclosing Open Fields'. London, 1772, pp. 37-43, passim.

'এখানে আমার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি যে-সমস্ত মাঠঘাট ও খেতগুলি ঘেরাও করে নেয়ার আগেই চাষের অধীন হয়ে ছিল সেগুলির ঘেরাও-ব্যবস্থা। ঘেরাও-ব্যবস্থার সপক্ষে যাঁরা কলম ধরেছেন তাঁরা পর্যন্ত স্বীকার করেছেন যে এই সমস্ত ক্ষীয়মাণ গ্রাম বড় খামারগুলির একচেটিয়া আধিপত্য বাড়িয়ে দিয়েছে, খাদ্যসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়েছে এবং গ্রামগুলিকে জনশূন্য করে তুলেছে।... এমনকি অনাবাদী জমিগুলি ঘেরাও করে নেয়াতেও (যে-ব্যাপারটি এখন চলছে) গরিবরা আরও দুর্দশায় পড়েছে, কেননা এতেও তারা জীবনধারণের একটি পন্থা থেকে বঞ্চিত হয়েছে আর এর ফলে একমাত্র ইতিমধ্যেই অতিরিক্ত ফেঁপে-ফুলে-ওঠা খামারগুলি আরও বড় হয়ে চলেছে।'* ডঃ প্রাইস বলছেন, 'যখন এই জমি অল্প কয়েকজন বড় খামারীর করায়ত্ত হয় তখন তার ফলাফল অবশ্যম্ভাবীরূপে দাঁড়ায় এই যে ছোট-ছোট খামারী' (এদের প্রাইস এর আগে আখ্যাত করেছেন 'বহুসংখ্যক ছোট জোতজমির মালিক ও চাষী-প্রজা' বলে, 'যারা নিজেদের ও নিজ-নিজ পরিবারের ভরণপোষণ নির্বাহ করে তাদের অধিকৃত জমির ফসল দিয়ে, এজমালি জমিতে প্রতিপালন-করা ভেড়া এবং হাঁস-মুরগি, শুয়োর, ইত্যাদির মাংস খেয়ে ও বিক্রি করে, এবং ফলত এদের জীবনধারণের উপায়-উপকরণ কেনার প্রয়োজন পড়ে সামান্যই') 'পরিণত হয়ে যায় এমন একদল মানুষে যারা তাদের জীবিকানির্বাহ করে অন্যের জন্যে কাজ করে এবং তাদের যা-কিছু দরকার তার জন্যেই প্রয়োজন হয়ে পড়ে বাজারে গিয়ে কেনাকাটা করার।... এ-কারণে সম্ভবত আরও বেশি পরিশ্রম করতে হবে, কেননা পরিশ্রম করার ব্যাপারে বাধ্যতামূলক চাপও থাকবে বেশি।... শহর এবং হস্তশিল্প-কারখানার সংখ্যাও বাড়বে, কেননা আরও বেশিসংখ্যায় মানুষ সেদিকে ছুটবে মাথাগোঁজার আশ্রয় ও কর্মসংস্থানের সন্ধানে। এইভাবেই খামারগুলি আত্মসাৎ করার প্রক্রিয়া স্বাভাবিক নিয়মে অগ্রসর হয়ে থাকে। আর আমাদের এই রাজ্যে বহু বছর ধরে এই প্রক্রিয়াটি ঠিক এই নিয়মেই বাস্তবে কাজ করে চলেছে।'**

জমি ঘেরাও করার ফলাফলকে তিনি সংহতভাবে প্রকাশ করেছেন এই বলে:

'মোটের ওপর সমাজের নিচুতলার মানুষের অবস্থা প্রায় সকল দিক থেকেই বদলেছে, তা খারাপ হয়েছে সবদিক থেকেই। ছোট-ছোট জোতের মালিক থেকে তারা পরিণত

* Dr. R. Price. 'Observations on Reversionary Payments', 6 ed. By W. Morgan. London, 1803, v. II, p. 155. ফর্স্টার, অ্যাডিংটন, কেন্ট, প্রাইস এবং জেমস অ্যান্ডারসনের রচিত গ্রন্থাদি পড়া দরকার এবং সেগুলির পাঠের সঙ্গে তুলনা করা দরকার হীন স্তাবক ম্যাককুলখের 'The Literature of Political Economy'. London, 1845 বিষয়ক তালিকাবদ্ধ বিবরণীতে তাঁর দুঃখদায়ক বকবকানির সঙ্গে।

** প্রাইস, উদ্ধৃত রচনা, পৃষ্ঠা ১৪৭।

4--2702

হয়েছে এখন দিনমজুর ও ভাড়াটে কর্মীতে; আবার সেইসঙ্গে এই শেষোক্ত অবস্থায় পড়ে তাদের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।'*

বস্তুত এজমালি জমিগুলি আত্মসাৎ করার ফলে ও তার সঙ্গে কৃষিতে বিপ্লব ঘটায় তা খেত-মজুরদের অবস্থার ওপর এমন তীব্র আঘাত হানে যে এমনকি ইডেনের মতেও ১৭৬৫ থেকে ১৭৮০ সালের মধ্যে তাদের মজুরি সর্বনিম্ন স্তরের নিচেও নেমে যায় এবং এই ঘাটতি পূরণ করতে হয় সরকারি দরিদ্র-ত্রাণ আইনের

* প্রাইস, উদ্ধৃত রচনা, পৃষ্ঠা ১৫৯। এ-প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে যায় প্রাচীন রোমের কথা। 'ধনীরা অবিভক্ত জমির অধিকাংশের মালিকানা পেয়ে গিয়েছিল। ওই কালের অবস্থাদির ওপর আস্থা ছিল তাদের, তারা মনে করছিল যে ওই সমস্ত জমির মালিকানা তাদের কাছ থেকে ফের ফিরিয়ে নেয়া হবে না, তাই তাদের জমিজায়গার আশেপাশে দরিদ্রদের মালিকানাধীন আরও কিছু-কিছু টুকরো জমি ওইসব জমির মালিকদের মৌন সম্মতিক্রমে তারা কিনে নিল এবং আরও কিছু জমি অধিকার করে নিল বলপ্রয়োগে। ফলে ওই ধনীরা টুকরো-টুকরো জমির পরিবর্তে ব্যাপক ও বিস্তৃত একেকটি ভূখণ্ড নিয়ে চাষবাস শুরু করে দিল। অতঃপর তারা কৃষিতে ও পশুপালনের কাজে নিযুক্ত করল ক্রীতদাসদের, কেননা দাসত্বমুক্ত স্বাধীন নাগরিকদের এসব কাজে নিযুক্ত করলে তাদের কৃষি-শ্রমিকের কাজ থেকে সামরিক বাহিনীর কাজে নিয়ে নেয়ার ভয় ছিল। ক্রীতদাসদের মালিক হওয়ায় ধনীদের লাভ হল বিপুল, কেননা সামরিক বাহিনীতে তাদের অন্তর্ভুক্তি নিষিদ্ধ ছিল বলে ক্রীতদাসদের সন্তান-প্রজননে কোনো বাধা ছিল না, সন্তান-সন্ততি হোতও তাদের প্রচুর সংখ্যায়। এইভাবে প্রতিপত্তিশালী লোকেরা সকল সম্পদ নিজেদের মধ্যে আহরণ করে নিয়েছিল এবং তাদের সকল জমিজায়গা কিলবিল করত ক্রীতদাসে। অপরদিকে সাধারণ ইতালীয়র মধ্যে জনসংখ্যা অনবরত কমে আসছিল, দারিদ্র্য, করভার ও সামরিক বাহিনীতে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করতে বাধ্য হওয়ার ফলে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল তারা। এমনকি যখন দেশে শান্তি থাকত তখনও তাদের সম্পূর্ণ অকর্মণ্য হয়ে থাকতে হোত, কেননা ধনীরাই ছিল দেশের সকল জমিজায়গার মালিক এবং জমিতে চাষের জন্যে তারা মুক্ত নাগরিকদের বদলে ক্রীতদাসদেরই নিযুক্ত করত।' (Appian. 'Römische Bürgerkriege', I, 7.) এই অনুচ্ছেদে লিসিনাসের কৃষি-আইন (২৭) প্রস্তাবনার আগেকার সময়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সামরিক বাহিনীর এই কাজ, যা রোমান জনসাধারণের ধ্বংসকে এত অধিক পরিমাণে ত্বরান্বিত করেছিল, তা-ই আবার ছিল প্রধান উপায় যার সাহায্যে কসাইখানায় অবলম্বিত ব্যবস্থার অনুরূপ উপায়ে শার্লামেন মুক্ত জার্মান কৃষকদের পরিণত করেছিলেন ভূমিদাস ও মুচলেকাবদ্ধ দাসে।

সাহায্য নিয়ে। ইডেন বলছেন, 'খেত-মজ্বরদের মজ্বরি জীবনধারণের পক্ষে একান্ত আবশ্যক চাহিদা মেটানোর চেয়ে পরিমাণে বেশি ছিল না।'

এখন শোনা যাক জমি-ঘেরাওয়ের নীতির জনৈক সমর্থক ও ডঃ প্রাইসের প্রতিপক্ষের একজনের এ-বিষয়ে কী বলার আছে।

'খোলা, ঘেরাওমুক্ত খেতখামারে মানুষজনকে পরিশ্রমের অপচয় ঘটাতে দেখা যাচ্ছে না বলেই গ্রামগুলির জনশূন্যতাকে এ-ব্যাপারের ফলাফল আখ্যা দেয়া উচিত হবে না।... অন্যের হয়ে কাজ করতে বাধ্য থাকবে এমন একদল মানুষে ছোট-ছোট খামারীকে পরিবর্তিত করলে যদি বেশি পরিমাণে শ্রমের উৎপত্তি ঘটে, তাহলে সেটা এমন একটা সুবিধা যা জাতির' (অবশ্য, বলা বাহুল্য, ওই 'পরিবর্তিত' মানুষেরা এই 'জাতি'র অন্তর্ভুক্ত নয়) 'কাম্য হওয়া উচিত।... একেকটি খামারে তাদের শ্রম যৌথভাবে নিয়োজিত হলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হস্তশিল্প-কারখানাগুলির জন্যেও তাদের একটা উদ্বৃত্ত অংশ থেকে যাবে এবং এই উপায়ে হস্তশিল্প-কারখানার — জাতির এই স্বর্ণখনিগুলির — সংখ্যা শস্য-উৎপাদনের পরিমাণের অনুপাতে বৃদ্ধি পাবে।*

আবার যে-মুহূর্তে পর্নজিতন্ত্রী উৎপাদন-পদ্ধতির ভিত্তিস্থাপনের জন্যে প্রয়োজন হচ্ছে সবচেয়ে নির্লজ্জভাবে 'সম্পত্তির ব্যাপারে পবিত্র অধিকার'লঙ্ঘনের এবং ব্যক্তি-মানুষের বিরুদ্ধে স্থূলতম হিংস্রতা প্রদর্শনের, তখনই অর্থশাস্ত্রীর নির্বিকল্প সমাধির ভাবটি প্রকাশ করছেন লোকহিতৈষী এবং তদুপরি আবার রক্ষণশীল 'টোরি' স্যার এফ এম. ইডেন। পঞ্চদশ শতকের শেষ-তৃতীয়াংশ থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত জনসাধারণকে বলপ্রয়োগে জমি থেকে উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে চুরি-বাটপাড়ি, ঘোর দৌরাত্ম্য ও জনসাধারণের দুঃখকষ্টের যে একটানা পালা চলেছিল তা থেকে এই ভদ্রলোক নিছক এই স্বস্তিকর সিদ্ধান্তে পেশছেছেন:

---

* [J. Arbuthnot.] 'An Inquiry into the Connection between the Present Price of Provisions etc.', pp. 124, 129. আবার ফলাফলের দিক থেকে একই ব্যাপার প্রকাশ পেলেও বিপরীত মনোভাবাপন্ন অন্য লেখকের রচনায় বলা হয়েছে: 'শ্রমজীবী মানুষজনকে তাদের আস্তানা কুটিরগুলি থেকে বিতাড়িত করা হচ্ছে এবং কাজের সন্ধানে তারা শহরগুলিতে আসতে বাধ্য হচ্ছে; তবে এর ফলে পাওয়া যাচ্ছে অপেক্ষাকৃত বড় একটি উদ্বৃত্ত উৎপাদ এবং এইভাবে পর্নজির বাড়বৃদ্ধি ঘটছে।' [R. B. Seeley.] 'The Perils of the Nation', 2nd ed., London, 1843, p. XIV.)

'আবাদী জমি ও চারণক্ষেত্রের মধ্যে একটি উপযুক্ত অনুপাত অর্জন করার দরকার ছিল। গোটা চতুর্দশ শতক ও পঞ্চদশ শতকের অধিকাংশ সময় জুড়ে প্রতি এক একর চারণক্ষেত্রের অনুপাতে দেশে ছিল দুই, তিন, এমনকি চার একর পর্যন্ত আবাদী জমি। ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ এই অনুপাতটি বদলে দাঁড়াল প্রতি দুই একর চারণক্ষেত্র-পিছু দুই একর ও পরে এক একর আবাদী জমি। অবশেষে শেষ পর্যন্ত উপযুক্ত অনুপাতটিতে এসে পৌঁছনো গেল, আর তা হল প্রতি তিন একর চারণক্ষেত্র-পিছু এক একর আবাদী জমি।'

অবশ্য কৃষক ও এজমালি ভূ-সম্পত্তির মধ্যে একদিন-যে কোনো একটি যোগসূত্র ছিল ঊনবিংশ শতকে পৌঁছে তার স্মৃতিও গেল হারিয়ে। আরও সম্প্রতিকালের কথা তো বাদই দিলাম, ১৮০১ থেকে ১৮৩১ সালের মধ্যে কৃষিজীবী জনসাধারণের কাছ থেকে যে-৩৫ লক্ষ ১১ হাজার ৭৭০ একর এজমালি জমি অপহরণ করা হল ও সংসদীয় ফন্দি-ফিকিরের সাহায্যে জমিদাররাই তা উপহার দিল জমিদারদের তার জন্যে ওই বঞ্চিত কৃষিজীবীরা কি একটি পয়সাও ক্ষতিপূরণস্বরূপ পেয়েছে?

কৃষিজীবী জনসাধারণকে জমি থেকে পাইকারি হারে উচ্ছেদের শেষ পর্বটি হল, যাকে বলা হয় 'Clearing of Estates' ('তালুকগুলিকে সাফ করা', অর্থাৎ তালুকগুলি থেকে জনসাধারণকে ঝাঁটিয়ে বিদায় করা)। এর আগে পর্যন্ত ইংলণ্ডে যে-সমস্ত উচ্ছেদের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সে-সবের শেষ পরিণতি ছিল এই 'তালুক-সাফ'এ। আগের একটি অধ্যায়ে আধুনিক জীবনের পরিস্থিতির যে-চিত্র দেয়া হয়েছে তা থেকে আমরা দেখেছি যে যেখানে বিতাড়িত করার মতো মুক্ত কৃষক আর অবশিষ্ট নেই সেখানেই শুরু হয়েছে কুটিরগুলিকে 'সাফ করা'র কাজ; যাতে খেত-মজুররা যে-জমি চাষ করছে সেখানে এমনকি নিজস্ব আশ্রয়স্থলটুকুও গড়ার মতো জায়গা না-পায়। তবে 'তালুক-সাফ' বলতে সত্যিসত্যিই ও যথাযথভাবে কী বোঝায় তা আমরা জানতে পারি একমাত্র আধুনিক প্রেমোপাখ্যানের ঈশ্বর-নির্দিষ্ট দেশ স্কটল্যাণ্ডের পার্বত্যাঞ্চলে। সেখানে এই 'তালুক-সাফ'এর প্রক্রিয়াটির বৈশিষ্ট্য হল এর সুসংবদ্ধ প্রকৃতি, এক ধাক্কায় এটিকে কার্যকর করার ব্যাপারে আয়োজনের বিপুলতা (আয়র্ল্যাণ্ডে জমিদাররা একসঙ্গে বেশ কয়েকখানি করে গ্রাম 'সাফ করা' পর্যন্ত এগিয়েছে, আর স্কটল্যাণ্ডে জার্মানির সামন্ত-রাজাদের

রাজ্যের সমান আয়তনের বড়-বড় ভূখণ্ড জুড়ে এ-কাজ চলেছে), এবং পরিশেষে ভচ্ছরূপ-করা জমিগুলি যে-বিশেষ ধরনের সম্পত্তি আখ্যা দিয়ে দখল করে রাখা হয়েছে তার বিশেষত্ব।

স্কটল্যান্ডের পার্বত্য অঞ্চলের কেল্টরা সংগঠিত ছিল উপজাতি-গোষ্ঠীতে এবং এরকম এক্কেকটি গোষ্ঠী যে-জমিতে বসতিস্থাপন করত সেই জমির মালিক হোত তা। গোষ্ঠীটির প্রতিনিধি বা প্রধান অথবা 'গোষ্ঠীপতি' হ'ত ওই ভূ-সম্পত্তির নামেমাত্র মালিক, যেমন সকল জাতীয় ভূ-সম্পত্তির নামেমাত্র মালিক ইংলন্ডের রানী। ইংরেজ গভর্নমেণ্ট যখন এই 'গোষ্ঠীপতিদের' মধ্যেকার অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ-বিগ্রহ ও স্কটল্যান্ডের সমভূমিতে তাদের অনবরত হানা দেয়ার ব্যাপারগুলি দমন করতে সক্ষম হলেন তখনও কিন্তু 'গোষ্ঠীপতি'রা তাদের বহুকালের ডাকাতি-ব্যবসা ত্যাগ করল না কোনোমতেই, তারা কেবল ব্যবসার ধরনটা বদলাল মাত্র। নিজেদেরই কর্তৃত্ববলে তারা তাদের নামেমাত্র বা আনুষ্ঠানিক অধিকারকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারে পরিণত করল, এবং এর ফলে যখন তারা নিজেদেরই গোষ্ঠীর লোকজনের সঙ্গে সংঘর্ষের সম্মুখীন হল তখন মনস্থ করল খোলাখুলি বলপ্রয়োগে তাদের বিতাড়িত করতে। অধ্যাপক নিউম্যানের ভাষায়, 'ইংলন্ডের রাজা যদি দাবি করেন যে তাঁর প্রজাবর্গকে তাড়িয়ে নিয়ে সমুদ্রে ফেলে দেবেন তাহলে সেটা যেমন হয় এ-ও তেমনই।'* রাজসিংহাসনের দাবিদারের (২৮) অনুগামীদের শেষবার অভ্যুত্থানের পর স্কটল্যান্ডে সেই-যে বিপ্লব শুরু হয়েছিল তার প্রথমদিককার স্তরগুলি অনুধাবন করা যেতে পারে স্যর জেমস স্ট্যুয়ার্ট** ও জেমস

---

* F. W. Newman. 'Lectures on Political Economy'. London, 1851, p. 132.

** স্ট্যুয়ার্ট বলছেন: 'যদি আপনারা এই সমস্ত জমির খাজনাকে' (তিনি ভ্রান্তিবশত এই অর্থনৈতিক বর্গের অন্তর্ভুক্ত করেছেন 'টাক্‌স্‌ম্যান'দের (২৯) দেয় গোষ্ঠী-প্রধানদের নজরানাকেও) 'জমির আয়তনের সঙ্গে তুলনা করেন, তাহলে এই খাজনা খুবই সামান্য বলে মনে হবে। তবে যদি এর সঙ্গে তুলনা করেন প্রতিটি খামারে যতজন করে লোককে অন্ন যোগাতে হয় তার, তাহলে দেখতে পাবেন একটি উৎকৃষ্ট ও উর্বর সমভূমি-প্রদেশে একই মূল্যের একটি তালুকে যত লোক প্রতিপালিত হয় সম্ভবত তার দশগুণ লোক প্রতিপালিত হয় স্কটল্যান্ডের পার্বত্যঅঞ্চলের একটি তালুকে।' (James Steuart. 'An Inquiry into the Principles of Political Economy'. London, 1767, v. I, ch. XVI, p. 104.)

অ্যান্ডারসনের* রচনাদি থেকে। অষ্টাদশ শতকে পলায়নপর গেইলদের (৩০) ধরে ফেলার পর তাদের দেশত্যাগ নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছিল, উদ্দেশ্য ছিল এই যে বলপ্রয়োগে তাদের গ্লাসগোয় ও অন্যান্য শিল্প-শহরে চালান করা।** ঊনবিংশ শতকে অবলম্বিত এই পদ্ধতির*** একটি উদাহরণ হিসেবে

* James Anderson. 'Observations on the Means of Exciting a Spirit of National Industry etc.', Edinburgh, 1777.

** ১৮৬০ সালে বলপ্রয়োগে জমি থেকে উচ্ছেদ-করা মানুষদের মিথ্যা অজুহাতে কানাডায় চালান করে দেয়া হয়। এদের মধ্যে কিছু লোক পালিয়ে যায় পাহাড়-অঞ্চলে ও আশপাশের দ্বীপগুলিতে। সেখানেও তাদের তাড়া করে পুলিশ-বাহিনী। পুলিশের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে লিপ্ত হবার পর তারা ফের পালিয়ে যায়।

*** অ্যাডাম স্মিথের রচনাবলীর ভাষ্যকার বুকানন ১৮১৪ সালে লিখছেন: 'স্কটল্যান্ডের পার্বত্যাঞ্চলে সম্পত্তি-সম্পর্কিত প্রাচীন ব্যবস্থা প্রতিদিন একটু-একটু করে ধ্বংস করা হচ্ছে।... জমিদার উত্তরাধিকার-সূত্রে স্বীকৃত প্রজার' (এখানে ভ্রান্তিবশত এই আখ্যাটি দেয়া হয়েছে) 'কথা চিন্তা না-করে সবচেয়ে উঁচু দর হাঁকছে যে তাকেই জমি দিচ্ছে আর এই শেষোক্ত লোকটি জমির উন্নতিসাধনে মনোযোগী হলে সঙ্গে সঙ্গেই সে চাষবাসের নতুন রীতির প্রবর্তন করছে। আগে যেখানে ছোট-ছোট কৃষক-প্রজা ও খেত-মজুরে তালুকগুলি ভরে থাকত, সেখানে এখন জমির উৎপাদনের সমান অনুপাতে লোকের বসতি গড়ে উঠতে লাগল, তবে উন্নত ধরনের চাষের এই নতুন ব্যবস্থা ও বর্ধিত খাজনার আওতায় সম্ভাব্য সবচেয়ে কম খরচে পাওয়া যেতে লাগল সম্ভাব্য সবচেয়ে বেশি ফসল; এবং এই উদ্দেশ্যসাধনে অপ্রয়োজনীয় লোকজনকে স্থানান্তরিত করায় তালুকগুলিতে লোকসংখ্যা কমে গেল — জমি থেকে কত লোক প্রতিপালিত হতে পারে সে হিসেবে নয়, কত লোককে জমিতে কাজ দেয়া যেতে পারে সেই হিসাবে নির্ধারিত হল লোকসংখ্যা। জমির অধিকারচ্যুত প্রজারা হয় জীবিকার সন্ধান করতে পারে আশপাশের শহরগুলিতে,... ইত্যাদি। (David Buchanan. 'Observations on, etc. A. Smith's Wealth of Nations'. Edinburgh, 1814, v. IV, p. 144.) 'স্কটল্যান্ডের সম্ভ্রান্ত অমাত্যরা যেখানে-সেখানে বেড়া তুলে দিয়ে কৃষি-পরিবারগুলিকে জমির দখলচ্যুত করেছিল এবং গ্রামগুলির ও গ্রামের বাসিন্দাদের প্রতি তেমনই আচরণ করেছিল বন্য জীবজন্তুর উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে রেড ইন্ডিয়ানরা জীবজন্তুর আশ্রয়স্থল গহ্বরগুলির যে-অবস্থা করে থাকে।... মানুষকে এখন বিনিময় করা হচ্ছে এক-টুকরো ভেড়ার চামড়া কিংবা ভেড়ার একটা লাশের সঙ্গে, — না, তার চেয়েও শস্তায় বিকোচ্ছে মানুষ।... তা-ই বা বলি কেন? মোগলরা চীনের উত্তরের প্রদেশগুলিতে বলপূর্বক প্রবেশ করেছিল যখন তখন তাদের পরিষদে তারা এইমর্মে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল যে স্থানীয় অধিবাসীদের

সাদারল্যাণ্ডের ডাচেসের 'তালুক-সাফ'-এর কথা বললেই যথেষ্ট হবে এখানে। অর্থশাস্ত্রে সুশিক্ষিতা এই মহিলাটি জমিদারির শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে স্থির করলেন তিনি একেবারে মোক্ষম দাওয়াই বাতলাবেন এবং তাঁর শাসনাধীন গোটা অঞ্চলকে পরিণত করবেন মেষচারণ-ক্ষেত্রে (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই একজাতীয় প্রক্রিয়া এর আগেই প্রয়োগের ফলে ওই তল্লাটের জনসংখ্যা তখনই কমে ১৫ হাজারে দাঁড়িয়েছিল)। ফলে ১৮১৪ থেকে ১৮২০ সালের মধ্যে ওই ১৫ হাজার বাসিন্দা বা প্রায় ৩ হাজার পরিবারকে তাড়িয়ে ফেরা হল ও একেবারে নির্মূল করে দেয়া হল। ভেঙেচুরে পুড়িয়ে দেয়া হল ওই বাসিন্দাদের সব ক'খানি গ্রাম এবং তাদের মালিকানাধীন সকল জমি পরিণত করা হল চারণক্ষেত্রে। ব্রিটিশ সৈন্যরা এই উচ্ছেদকে কার্যকর করে তুলল, স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে হাতাহাতি-মারামারি পর্যন্ত করল তারা। এক বৃদ্ধা তার কুটির ছেড়ে নড়তে অস্বীকার করায় কুটিরে আগুন দিয়ে তাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হল। এইভাবে ওই ভদ্রমহোদয়া আত্মসাৎ করে নিলেন ৭ লক্ষ ৯৪ হাজার একর জমি, যা নাকি অনাদি কাল থেকে ছিল উপজাতি-গোষ্ঠীটির সম্পত্তি। এর পরিবর্তে বহিষ্কৃত অধিবাসীদের জন্যে তিনি বরাদ্দ করে দিলেন সমুদ্রের ধারে আনুমানিক ৬ হাজার একরের মতো জমি — পরিবার-পিছু ২ একর হিসেবে। ওই ৬ হাজার একর জমি তার আগে পর্যন্ত পতিত জমি হিসেবে পড়ে ছিল, এই নতুন মালিকদেরও তা থেকে কোনো আয় হল না। উদারহৃদয়া ডাচেস বস্তুত এতদূর পর্যন্ত দাক্ষিণ্য দেখালেন যে তিনি এই পতিত জমিগুলি একর-পিছু গড়পড়তা ২ শিলিং ৬ পেন্স খাজনায় চাষ করতে দিলেন সেই উপজাতি-গোষ্ঠীর লোকজনকেই যারা শতাব্দীর-পর-শতাব্দী তাঁর পূর্বপুরুষের জন্যে রক্ত দিয়ে এসেছে। এইভাবে চৌর্যবৃত্তির সাহায্যে লব্ধ উপজাতিটির মালিকানাধীন পুরোটা জমি মহামান্যা ডাচেস অতঃপর বাঁটোয়ারা করে দিলেন ২৯টি বড়-বড় মেষ-প্রজন খামারে,

---

২তা করা হোক ও গোটা অঞ্চলকে পরিণত করা হোক পশুচারণ-ক্ষেত্রে। ওই প্রস্তাবটিকেই তাদের নিজেদের দেশে, নিজেদের দেশবাসীর বিরুদ্ধে কাজে পরিণত করেছে পার্বত্য-অঞ্চলের বহু ভূস্বামী।' (George Ensor. 'An Inquiry concerning the Population of Nations'. London, 1818, pp. 215, 216.)

আর প্রতিটি খামারের তত্ত্বাবধানের কাজে নিযুক্ত রইল একটি করে পরিবার। এগুলির বেশিরভাগই ছিল ইংলন্ড থেকে আমদানি-করা খামার-ভৃত্যদের পরিবার। ১৮২৫ সালের মধ্যেই আগেকার সেই ১৫ হাজার গেইল-বাসিন্দার জায়গা নিয়েছিল ১ লক্ষ ৩১ হাজার ভেড়া। সমুদ্রের ধারে আছড়ে ফেলে-দেয়া আদিবাসীদের অবশিষ্টাংশ তখন চেষ্টা করছিল মাছ ধরে জীবিকানির্বাহ করতে। তারা হয়ে দাঁড়িয়েছিল উভচর এবং জনেক ইংরেজ লেখকের ভাষায় বাস করছিল অর্ধেক ডাঙায় ও অর্ধেক জলে, অধিকন্তু মাত্র অর্ধেকটা করে উভয় স্থলে।*

তবে উপজাতি-গোষ্ঠীর 'গোষ্ঠীপতিদের' প্রতি বীর গেইলদের রোমান্টিক ও পার্বত্য জীবন-সঞ্জাত পরম ভক্তির জন্যে তাদের আরও কঠোর-কঠিন প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল। তাদের ধরা মাছের আঁষটে গন্ধ যথারীতি ওই গোষ্ঠীপতিদের নাকে গিয়ে পৌঁছল। এতেও মুনাফার গন্ধ পেয়ে গোষ্ঠীপতিরা সমুদ্রতীর ইজারা দিয়ে দিল লন্ডনের বড়-বড় মৎস্য-ব্যবসায়ীকে। আর দ্বিতীয় বারের মতো গেইলরা আবার তাড়া খেয়ে বিতাড়িত হল।**

---

* যখন সাদারল্যান্ডের বর্তমান ডাচেস লন্ডনে খুব ঘটা করে 'টম-কাকার কুটির' গ্রন্থটির লেখিকা শ্রীমতী বীচের-স্টোকে পান-ভোজনে আপ্যায়িত করে আমেরিকান প্রজাতন্ত্রের নিগ্রো ক্রীতদাসদের প্রতি দরদ দেখানোর প্রয়াস পেলেন (প্রসঙ্গত বলি, ডাচেস-মহোদয়া ও তাঁর সমধর্মী অভিজাতবর্গ এই দরদ দেখানোর ব্যাপারটি কিন্তু আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় বেশ বিচক্ষণতার সঙ্গেই ভুলে বসেছিলেন এবং সে-সময়ে প্রতিটি 'অভিজাত' ইংরেজ-হৃদয় স্পন্দিত হচ্ছিল ক্রীতদাস-মালিকদের প্রতিই দরদে পূর্ণ হয়ে), তখন *New-York Tribune* পত্রিকায় আমি সাদারল্যান্ড-পরিবারের ক্রীতদাসদের সম্পর্কে কিছু তথ্য পেশ করেছিলাম (৩১)। (আংশিকভাবে আমার এই প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করেছেন কেরি তাঁর 'The Slave Trade', Philadelphia, 1853, pp. 203, 204 বইটিতে। আমার এই প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হয় একটি স্কটিশ সংবাদপত্রে এবং তার ফলে ওই সংবাদপত্র ও সাদারল্যান্ড-পরিবারের পারিষদবর্গের মধ্যে বেশ-একটু তর্কাতর্কিও হয়।

** এই মাছের ব্যবসা সম্পর্কে কৌতূহলোদ্দীপক খুঁটিনাটি বিবরণ পাওয়া যাবে মিঃ ডেভিড আর্কার্টের 'Portfolio, New Series' বইটিতে। — নাসাউ ডব্লু. সিনিয়র

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেষচারণ-ক্ষেত্রের একটা অংশ পরিণত হল হরিণ-পালনের অভয়ারণ্যে। প্রত্যেকেরই জানা আছে যে ইংলণ্ডে সত্যিকার অরণ্য বলতে কিছু নেই। বড়লোকদের গৃহসংলগ্ন উদ্যানে পোষা হরিণগুলি লণ্ডনের পুরসভার সম্মানিত সদস্যদের মতোই গোলগাল ও নিছক বিনীত গৃহপালিত জীব ছাড়া কিছু নয়। তাই স্কটল্যাণ্ড হল গিয়ে এই 'অভিজাত শৌখিনতা'র শেষ আশ্রয়।

১৮৪৮ সালে সোমার্স লিখছেন, 'পার্বত্য-অঞ্চলে নতুন-নতুন অরণ্য গজিয়ে উঠছে ব্যাঙের ছাতার মতো। এধারে, গেইক নদীর এপারে আপনি পাবেন গ্লেনফেশি-র নতুন অরণ্য, আর গেইক-এর ওপারে পাবেন আর্ডভেরিকি-র নতুন অরণ্য। ওই একই সরলরেখা-বরাবর আপনি পেয়ে যাবেন ব্ল্যাক মাউণ্ট — সম্প্রতি গড়ে-তোলা বিশাল এক পতিত ভূখণ্ড। পুব থেকে পশ্চিমে — অ্যাবার্ডিনের আশপাশের এলাকা থেকে ওবান-এর পাহাড়-সারির দিকে যেতে এখন আপনি পেয়ে যাবেন বহু অরণ্যের অবিচ্ছিন্ন সারি। এছাড়া পার্বত্য-অঞ্চলের অন্যান্য তল্লাটে আছে লখ আর্কেইগ, গ্লেনগ্যারি, গ্লেনমরিস্টন, ইত্যাদি নতুন-নতুন অরণ্য। 'গ্লেন' বা নদীর সংকীর্ণ উপত্যকাগুলি এককালে ছিল ছোট-ছোট খামারী-কৃষকদের সম্প্রদায়গত আবাসভূমি, পরে সেগুলিতে প্রবর্তন করা হল মেষচারণের; প্রথমোক্তদের সেইসব ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত করা হল আরও বন্ধুর ও অনুর্বর জমিতে জীবনধারণের উপায়সন্ধানে। এখন আবার ভেড়ার জায়গা নিচ্ছে হরিণের পাল, আর এগুলি ফের একবার জমি থেকে উচ্ছেদ করছে ছোট-ছোট প্রজাস্বত্বভোগী কৃষককে — যাদের অবশ্যই হটিয়ে দেয়া হবে আরও বেশি বন্ধুর, পর্বতসংকুল জমিতে, ফেলে দেয়া হবে আরও নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে। হরিণ-পালনের অভয়ারণ্য* এবং মানুষ কখনোই পাশাপাশি সহ-অবস্থান করতে পারে না, এদের একজন-না-একজনকে জায়গা ছেড়ে দিতেই হবে। তাহলে, শতাব্দীর গত চতুর্থাংশে যেমনটা হয়েছে তেমনই আগামী চতুর্থাংশেও অরণ্যগুলি বেড়ে চলুক সংখ্যায় ও আয়তনে আর গেইলরা উৎসন্ন হয়ে যাক তাদের বাসভূমি থেকে।... পার্বত্য-অঞ্চলের ভূস্বামীদের মধ্যে এই ধরনের ক্রিয়াকলাপ

তাঁর (মৃত্যুর পরে প্রকাশিত) বইতে সাদারল্যাণ্ড জেলায় অবলম্বিত ব্যবস্থাদি'কে আখ্যা দিয়েছেন 'মানুষের স্মরণকালে সবচেয়ে হিতকর তালুক-সাফগুলির একটি' বলে। 'Journals, Conversations and Essay relating to Ireland'. London, 1868.

* স্কটল্যাণ্ডের হরিণ-পালনের অরণ্যগুলিতে কিন্তু একটিও গাছ নেই। ন্যাড়া পাহাড়গুলো থেকে ভেড়াদের তাড়িয়ে বের করে নিয়ে গিয়ে সেখানে হরিণদের তাড়িয়ে এনে সেগুলোর নাম দেয়া হয়েছে হরিণ-পালন অরণ্য। সেখানে এমনকি কাঠের জন্যেও গাছ পোঁতা ও সত্যিকার জঙ্গল গড়ে তোলার আবাদও হয় না।

কিছু-কিছু লোকের পক্ষে ভবিষ্যৎ উচ্চাকাঙ্ক্ষার ব্যাপার... কারও-কারও কাছে শিকারের প্রলোভন এটা... আবার অপেক্ষাকৃত বিষয়বুদ্ধি-সম্পন্ন অপর অনেকের কাছে একমাত্র মুনাফার দিকে চেয়ে হরিণ নিয়ে ব্যবসা ছাড়া এটা আর কিছু নয়। কারণ এটা একটা ঘটনা যে একটা পর্বতশ্রেণীকে 'অরণ্য' হিসেবে গড়ে তুললে বহুক্ষেত্রেই তা ভূস্বামীর পক্ষে বেশি লাভজনক হয়ে দাঁড়ায়, ওই পাহাড়-অঞ্চলকে মেষচারণ-ক্ষেত্রে পরিণত করার চেয়ে।... যে-শিকারি হরিণ-পালনের অরণ্য ইজারা নিতে চায় ইজারা-বাবদ খাজনার পরিমাণ নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে একমাত্র নিজের পকেটের অবস্থা ছাড়া আর কোনো সীমাই সে মানে না।... পার্বত্য-অঞ্চলের মানুষের ওপর দুঃখদুর্দশার যে-বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তা নর্মান-রাজাদের অনুসৃত নীতির ফলে সৃষ্ট দুঃখকষ্টের চেয়ে কোনো অংশে কম কঠোর কিনা সন্দেহ। হরিণগুলির জন্যে ছেড়ে দেয়া হয়েছে বিশাল-বিশাল সব এলাকা আর মানুষদের ক্রমশ তাড়িয়ে নিয়ে ঠেসে পুরে দেয়া হচ্ছে সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর বৃত্তের পরিধিতে।... জনসাধারণের একটার-পর-একটা স্বাধীনতাকে সবলে কেড়ে নেয়া হয়েছে।... অত্যাচার-উৎপীড়নের মাত্রা বেড়ে চলেছে প্রতিদিন।... জনসাধারণকে জমি থেকে উৎখাত করে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয়া, তালুক-সাফ করার কাজটা ভূস্বামীরা করে চলেছে পূর্ব নির্ধারিত নীতি হিসেবে, কৃষি-ব্যবস্থার পক্ষে প্রয়োজনীয় একটা কাজ হিসেবে, ঠিক যেমন করে আমেরিকা কিংবা অস্ট্রেলিয়ায় পতিত জমিজায়গা থেকে গাছপালা ও ঝোপঝাড় কেটে সাফ করে ফেলা হয়। আর এই সমগ্র কাজটা চলেছে নিঃশব্দে, ব্যবসাদার-সুলভ সুশৃংখলতার সঙ্গে, ইত্যাদি।'*

---

* Robert Somers. 'Letters from the Highlands; or the Famine of 1847'. London, 1848, pp. 12-28 passim. এই চিঠিগুলি প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল *Times* পত্রিকায়। ইংরেজ অর্থশাস্ত্রীরা অবশ্য ১৮৪৭ সালের গেইল-অঞ্চলের দুর্ভিক্ষের কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন অঞ্চলটিতে জনসংখ্যার আধিক্যকে। ব্যাপারটা যা-ই হোক, বলা হয়েছে যে জনসাধারণ নাকি 'তাদের খাদ্য-সরবরাহের ওপর অতিরিক্ত চাপের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল'। 'তালুক-সাফ'এর ব্যাপারটা, অথবা জার্মানিতে যাতে বলা হয় 'Bauernlegen', তা বিশেষ করে জার্মানিতে সাধিত হয় ত্রিশ-বর্ষব্যাপী যুদ্ধের (৩২) পরে, এবং এর ফলে এমনকি এর অনেক পরে ১৭৯০ সালেও — স্যাক্সনি রাজ্যে কয়েকটি কৃষক-বিদ্রোহ ঘটে। এ-ব্যাপারটা ঘটতে দেখা যায় বিশেষ করে পূর্ব-জার্মানিতে। প্রায় সকল প্রুশীয় প্রদেশেই দ্বিতীয় ফ্রিডরিখ সেই প্রথম কৃষকদের সম্পত্তির অধিকারকে বলবৎ করলেন। সাইলেসিয়া জয় করার পর তিনি ভূস্বামীদের বাধ্য করলেন কৃষকদের কুঁড়েগুলি ও গোলাবাড়ি, ইত্যাদি নতুন করে নির্মাণ করে দিতে এবং কৃষকদের চাষের ঘোড়া ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম যোগাতে। কারণ তাঁর সেনাবাহিনীতে সৈন্যের যোগান ও রাজকোষ পূর্ণ করার জন্যে করদাতা গড়ে তোলার প্রয়োজন ছিল। এছাড়া বাকি সবকিছুর, ফ্রিডরিখের অর্থ-ব্যবস্থা এবং জগাখিচুড়ি স্বৈরাচার, আমলাতন্ত্র ও

সামন্ততান্ত্রিক শাসনের আওতায় কৃষকরা কেমন আনন্দে জীবন কাটাত তার বর্ণনা পাওয়া যাবে ফ্রিড্রিখের গুণমুগ্ধ মিরাবো-র রচনার নিচের উদ্ধৃতি থেকে: 'উত্তর জার্মানির কৃষকদের অন্যতম প্রধান সম্পত্তি হল শণ। কিন্তু মানবজাতির অসুখের জন্যে এ হল শুধু চরম নিঃস্বতার কিছুটা প্রতিকারের উপায়, সচ্ছলতার উৎস নয়। প্রত্যক্ষ কর, বেগার খাটুনি, নানা ধরনের বাধ্যতামূলক পরিশ্রমের ফলে চাষী দরিদ্র হয়, তাছাড়া সে যা-কিছু ক্রয় করে সেই সবকিছুর জন্যে পরোক্ষ কর দেয়... এবং সর্বোপরি বিপদ এই যে সে তার মালপত্র নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী যে-কোনো জায়গায় আর দামে বিক্রি করতে পারে না; যে বণিক উপযুক্ত দামে জিনিসপত্র বিক্রি করতে প্রস্তুত সেই বণিকের কাছ থেকে তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র চাষী কিনতে পারে না। এই পরিস্থিতির ফলে ক্রমে-ক্রমে চাষী দরিদ্র হয়ে পড়ছে, তাছাড়া সুতো না-কাটলে সে প্রত্যক্ষ কর যোগাতেও অক্ষম হচ্ছে। সুতো কাটা তার পক্ষে এক প্রয়োজনীয় সহায়, তাতে তার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, চাকরচাকরানিকে ও তার নিজের শক্তি-সামর্থ্যকে কাজে লাগানো সম্ভব। এই সহায় সত্ত্বেও কী সংঘাতিক জীবন তাদের! গ্রীষ্মকালে জমিচাষ ও ফসল তোলার কাজে সে সশ্রম দণ্ডভোগীর মতো কাজ করে, সন্ধে ৯টায় যায় ঘুমোতে এবং ঘুম থেকে ওঠে রাত ২টোয়। শীতকালে একটু বেশি বিশ্রাম করে তার শক্তি-সামর্থ্যের পুনরুজ্জীবন দরকার হয়ে পড়ে, কিন্তু যদি সে কর দেওয়ার জন্যে তার উৎপন্ন ফসল ইত্যাদির একাংশ বিক্রি করে, তাহলে খাদ্য ও শস্যবীজের উপযোগী শস্যের অনটন ঘটবে তার। এই অভাব পূরণ করার উদ্দেশ্যে সে সুতো কাটতে বাধ্য হয়... বাধ্য হয় খুবই বেশি উৎসাহ নিয়ে সুতো কাটতে। তাই শীতকালে চাষী ঘুমোতে যায় রাত বারোটা বা একটায় এবং ওঠে ভোরবেলায় পাঁচটা বা ছ'টায়, কিংবা ঘুমোতে যায় সন্ধে ন'টায় এবং ওঠে রাত দু'টোয়। এমনিভাবে চলে তার সারাটা জীবন, একমাত্র রবিবার বাদে।... এই অতিরিক্ত জাগরণ, অনিদ্রা এবং অত্যধিক পরিশ্রমে কৃষকের শরীর দুর্বল হয়ে যায়; সে-কারণে শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে নরনারী খুবই অল্প বয়সে বৃদ্ধ হয়।' (মিরাবো, উদ্ধৃত রচনা, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১২ ও তার পরবর্তী অংশ।)

দ্বিতীয় সংস্করণে প্রদত্ত পাদটীকা। ১৮৬৬ সালের এপ্রিল মাসে, অর্থাৎ ওপরে উল্লিখিত রবার্ট সোমার্সের গ্রন্থটি প্রকাশের ১৮ বছর পরে, অধ্যাপক লেওন লেভি রাজকীয় শিল্প-সমিতির (৩৩) এক সভায় মেষচারণ-ক্ষেত্রগুলিকে হরিণ-পালন অরণ্যে রূপান্তরকরণ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় তিনি স্কটিশ পার্বত্য-অঞ্চল বিধ্বস্তকরণের অগ্রগতির বর্ণনা দেন। অন্যান্য নানা কথার সঙ্গে তিনি বলেন: 'তালুকগুলিকে জনশূন্য করা ও সেগুলিকে মেষচারণ-ক্ষেত্রে পরিণত করা ছিল নিখরচায় ভালোরকম আয় করার পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক কয়েকটি উপায়।... আবার মেষচারণ-ক্ষেত্রের জায়গায় হরিণ-পালন অরণ্য

গির্জার সম্পত্তি-লুণ্ঠন, রাষ্ট্রীয় তালুকগুলির প্রতারণাপূর্ণ হস্তান্তর, সাধারণের এজমালি জমিগুলির ওপর ডাকাতি, সামন্ত-ভূস্বামীদের ও

গড়ে তোলা পার্বত্য-অঞ্চলে ছিল পরিবর্তন-সাধনের একটি সাধারণ ধরন। জমিদারেরা একদিন যেমন তাদের তালুক থেকে মানুষজনকে বহিষ্কার করে দিয়েছিল, তেমনই এখন বহিষ্কার করে দিল ভেড়ার পালকে এবং স্বাগত জানাল নতুন প্রজাদের — বন্য পশুপালকে ও হাঁস-মুরগি ইত্যাদি পক্ষিকুলকে।... এখন যে-কেউ ফর্‌ফার্‌শায়ারে আর্ল-অব-ডালহৌসির তালুকগুলি থেকে পায়ে হেঁটে জন ও'গ্রোট্‌সের তালুকে যেতে পারেন একবারের জন্যেও অরণ্যভূমি ছেড়ে বাইরে না-বেরিয়েই।... এই সমস্ত বনের অনেকগুলিতেই শেয়াল, বনবেড়াল, মার্‌টেন, খট্টাশ এবং পাহাড়ি খরগোশ অজস্র দেখা যায়; তদুপরি মেঠো খরগোশ, কাঠবিড়ালী ও ইঁদুরও সম্প্রতি দেখা দিয়েছে প্রমাণ্ডলে। এইভাবে বিশাল-বিশাল ভূখণ্ড, স্কটল্যান্ডের পরিসংখ্যান-সংক্রান্ত বিবরণীতে যার মধ্যে অনেকখানি এলাকাকে উচ্ছ্বসিত ভাষায় সমৃদ্ধ ও বিপুলায়তন চারণক্ষেত্রে বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তা সকল প্রকার চাষ-আবাদ ও উন্নতিসাধন থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে এবং পুরোপুরি নিয়োজিত হয়েছে বছরের মধ্যে অত্যন্ত স্বল্প একটুখানি সময়ের জন্যে মুষ্টিমেয় জন-কয়েক মানুষের শিকার-খেলার প্রয়োজনে।'

লন্ডনের *Economist* (৩৪) পত্রিকার ১৮৬৬ সালের ২ জুনের সংখ্যায় বলা হয়েছে, 'একটি স্কচ পত্রিকায় গত সপ্তাহের সংবাদের তালিকার মধ্যে আমরা পড়লাম: 'সাদারল্যান্ড জেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি মেষপালন-খামারকে এ-বছর বর্তমান ইজারার মেয়াদ শেষ হলে বছরে ১,২০০ পাউন্ড খাজনায় ফের ইজারা নেয়ার একটি প্রস্তাব সম্প্রতি দেয়া হয়েছিল, কিন্তু জানা গেল যে খামারটিকে এখন পরিণত করা হবে একটি হরিণ-পালন অরণ্যে।' এখানে আমরা সামন্ততন্ত্রের আধুনিক সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি... প্রবৃত্তিগুলি অনেকখানি সেই একই রকম প্রক্রিয়ায় কাজ করছে যেমন সেগুলি কাজ করেছিল নর্মান বিজেতা-বীর... যখন ৩৬খানি গ্রাম ধ্বংস করে দিয়েছিলেন 'নতুন অরণ্য' গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে।... বিশ লক্ষ একর জমি... এইভাবে পুরোপুরি অনাবাদী পড়ে রইল, অথচ তার মধ্যে রয়ে গেছে স্কটল্যান্ডের সবচেয়ে উর্বর আবাদগুলির কয়েকটি। টিল্‌ট্ নদী-উপত্যকার স্বাভাবিক ঘাস হচ্ছে পার্থ্-জেলার মধ্যে সবচেয়ে পুষ্টিকর পশুখাদ্য। বেন আল্‌ডারের হরিণ-পালন অরণ্য প্রশস্ত বাডেনখ-জেলার গোটা তল্লাটের মধ্যে ছিল অতুলনীয় রকমের সেরা চারণভূমি; ব্ল্যাক মাউন্ট অরণ্যের একটা অংশ গোটা স্কটল্যান্ডের মধ্যে কালোমুখ ভেড়ার পক্ষে ছিল সবচেয়ে উপযোগী সেরা চারণক্ষেত্র। স্কটল্যান্ডে নিছক শিকার ও আমোদ-প্রমোদের প্রয়োজনে কী পরিমাণ জমিজায়গা-যে পতিত করে ফেলা হয়েছে তার কিছুটা ধারণা পাওয়া যাবে এই তথ্যটি থেকে যে উপরোক্ত জমির আয়তন গোটা পার্থ্-জেলার আয়তনের চেয়ে বেশি। বেন আল্‌ডারের প্রাকৃতিক

উপজাতি-গোষ্ঠীগুলির সম্পত্তি আত্মসাৎকরণ, এবং সঙ্ঘবদ্ধ বেপরোয়া ভীতি-প্রদর্শনের মারফত উপরোক্ত ওই সমস্ত সম্পত্তিকে আধুনিক ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করা — এই সবই ছিল আদিম সঞ্চয় সংগ্রহের কয়েকটি কাল্পনিক সুখ-সারল্যেভরা পদ্ধতি। এই পদ্ধতিগুলির সাহায্যেই জমিজায়গা জয় করে নেয়া হয়েছিল পুঁজিতন্ত্রী কৃষি-ব্যবস্থার বিকাশের জন্যে, জমিকে এগুলি পরিণত করেছিল পুঁজির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে এবং শহরের শিল্প-কারখানাগুলির জন্যে সরবরাহ করেছিল প্রয়োজনীয় 'স্বাধীন' ও আইনের রক্ষণাবেক্ষণ-বঞ্চিত প্রলেতারিয়েত।

৩। পঞ্চদশ শতকের শেষ থেকে জমির দখলচ্যুতদের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী আইনসমূহ। পার্লামেন্টের আইনের সাহায্যে মজুরিবৃদ্ধি-রোধ

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীন মজুরিভোগী ইত্যাদি পোষ্যদের দলকে-দল ভেঙে দেয়া এবং জমি থেকে জনসাধারণকে বলপ্রয়োগে উচ্ছেদ করার ফলে সৃষ্ট তথাকথিত 'স্বাধীন' প্রলেতারিয়েত যত দ্রুত বহির্বিশ্বে নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল সদ্য-জায়মান হস্তশিল্প-কারখানাগুলির পক্ষে ততখানি দ্রুত তাদের কাজে লাগিয়ে দেয়া সম্ভব ছিল না। অপরদিকে অভ্যস্ত জীবনযাত্রা-পদ্ধতি থেকে আচমকা উৎপাটিত পূর্বোক্ত ওই জনসমষ্টির পক্ষেও সম্ভব ছিল না নতুন পরিস্থিতির রীতিনীতির সঙ্গে সহসা নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়াও। ফলে, অংশত মানসিক প্রবণতার কারণে এবং বিপুল সংখ্যাধিকের ক্ষেত্রে ঘটনাচক্রের টানাপড়েনেও সদলবলে তারা পরিণত হল ভিক্ষুক, ডাকাত ও

সম্পদের হিসাব দিলে কিছুটা ধারণা হতে পারে জায়গাটা বলপ্রয়োগে জনশূন্য করে দেয়ায় কতখানি ক্ষতি হয়েছে। ওই জমিতে ১৫ হাজার ভেড়া চরানোর কাজ চলতে পারত এবং যেহেতু ওই অরণ্যভূমি স্কটল্যান্ডের প্রাচীন বনভূমির এক-ত্রিংশাংশের বেশি নয়... অতএব তাকে কাজে লাগানো যেতে পারত, ইত্যাদি ইত্যাদি।... ওই সমগ্র অরণ্যভূমি এমনিভাবে রয়ে গেছে সম্পূর্ণত নিস্ফলা, বন্ধ্যা হয়ে।... গোটা তল্লাটটিকে উত্তর সাগরের জলের তলায় তলিয়ে দেয়া একই ব্যাপার ছিল।... আইনসভার উচিত মানুষের-তৈরি এই ধরনের ঊষর, জনশূন্য জায়গা বা মরুভূমির প্রসার দৃঢ় হস্তক্ষেপে বন্ধ করা।'

ভবঘুরেতে। একারণেই পঞ্চদশ শতকের শেষে ও গোটা ষোড়শ শতক জুড়ে সারা পশ্চিম ইউরোপে আমরা দেখতে পাই ভবঘুরে-বৃত্তির বিরুদ্ধে জারি-করা রক্তক্ষয়ী নানা আইনের ছড়াছড়ি। বর্তমান শ্রমিক শ্রেণীর পূর্বপুরুষ বাধ্যতামূলকভাবে ভবঘুরে ও নিঃস্বতে রূপান্তরিত হওয়ায় এইভাবে তারা দমনপীড়নের সম্মুখীন হল। আইনের চোখে তারা গণ্য হল 'স্বেচ্ছা'-অপরাধী হিসেবে এবং আইন-ব্যবস্থা ধরেই নিল যে সবকিছু নির্ভর করছে যে-পুরনো অবস্থার আর অস্তিত্ব ছিল না সেই অবস্থার আওতায় কাজ করে যাওয়ার ব্যাপারে ওই জনসমষ্টির শুভেচ্ছার ওপর।

ইংলণ্ডে এই আইন-প্রণয়নের কাজ শুরু হয় রাজা সপ্তম হেন্‌রির আমলে :

রাজা অষ্টম হেন্‌রির আমলে ১৫৩০ সালের আইনে বলা হল: যে-সমস্ত ভিক্ষুক বৃদ্ধ ও কর্মক্ষম নয় তারা ভিক্ষাজীবী হিসেবে লাইসেন্স পাবে। অপরপক্ষে শক্তসমর্থ ভবঘুরেদের কপালে জুটবে বেত্রাঘাত ও কারাদণ্ড। এই শেষোক্তদের ঘোড়ায়-টানা গাড়ির পেছনে বেঁধে যতক্ষণ-না তাদের পিঠ বেয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে ততক্ষণ বেত মেরে যাওয়া হবে, তারপর তাদের এইমর্মে শপথ করতে হবে যে তারা নিজ-নিজ জন্মস্থানে ফিরে যাবে অথবা গত তিন বছর যেখানে ছিল ফিরে সেখানে যাবে এবং 'নিজেদের কোনো-না-কোনো কাজে' লাগাবে। কী নিষ্ঠুর পরিহাসই-না এটা! অষ্টম হেন্‌রির রাজত্বের ২৭শ বর্ষের আইনে আগেকার সংবিধির পুনরুক্তি করা হয়েছে বটে, তবে নতুন-নতুন ধারা যোগ করে আইনটিকে আরও বলশালীও করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে ভবঘুরে-বৃত্তির দায়ে কেউ দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তার হলে তার ওপর বেত্রদণ্ডের পুনরাবৃত্তি হবে এবং একটা কানের অর্ধেকটা কেটে ফেলা হবে। তবে তৃতীয়বার এই একই অপরাধের জন্যে অপরাধীকে প্রাণদণ্ড দেয়া হবে, তাকে ঘাগী অপরাধী ও সমাজ-স্বার্থের শত্রু আখ্যা দিয়ে।

রাজা ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের আমলে ১৫৪৭ সালে, অর্থাৎ তাঁর রাজত্বের প্রথম বছরে, জারি-করা সংবিধিতে বলা হয়েছে যে কেউ যদি কাজ করতে অস্বীকার করে তাহলে যে-ব্যক্তি কর্মবিমুখ অলস বলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে তারই কাছে অপরাধীকে ক্রীতদাস হিসেবে দণ্ডভোগ

[illegible] দাস-মালিকেরা ক্রীতদাসকে খেতে দেবে শুধু রুটি আর জল, পাতলা ঝোল আর যখন যেমন প্রয়োজন বোধ করবে তেমন ঝড়তিপড়তি মাংসের টুকরোটাকরা। কাজটা যতই জঘন্য হোক-না কেন দাস-মালিকের অধিকার থাকবে শেকলে দিয়ে বেঁধে ও বেত মেরে ক্রীতদাসকে দিয়ে তা জবরদস্তি করানোর। ক্রীতদাস যদি একপক্ষ-কাল কাজে অনুপস্থিত থাকে তাহলে সারা জীবনের মতো সে পরিণত হবে ক্রীতদাসে এবং তার কপালে কিংবা গালে ইংরেজি 'S'-অক্ষরটি (ইংরেজি 'slave' (দাস) শব্দের আদ্যক্ষর) দেগে দেয়া হবে; যদি পরপর তিনবার সে কাজ ছেড়ে পালিয়ে যায়, তবে 'দুর্বৃত্ত' আখ্যা দিয়ে তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। মালিক তাকে বিক্রি ও দান করতে পারবে, ক্রীতদাস হিসেবে অন্যের কাছে ভাড়া খাটাতেও পারবে, সে হবে অপর যে-কোনো অস্থাবর সম্পত্তি কিংবা গবাদি পশুর সমান। ক্রীতদাসেরা যদি দাস-মালিকদের বিরুদ্ধে কোনোরকম গোলমাল পাকানোর চেষ্টা করে, তাহলেও তাদের প্রাণদণ্ড দেয়া হবে। স্থানীয় নিম্ন আদালতের বিচারকদের কাজ হল, দাসের পলায়ন সম্বন্ধে কোনো খবর পেলে তাড়া করে শয়তানগুলোকে গ্রেপ্তার করা। এমন যদি দেখা যায় যে কোনো ভবঘুরে পরপর তিনদিন কাজকর্ম না-করে কুঁড়েমি করছে, তাহলে তাকে গ্রেপ্তার করে তার জন্মস্থানে নিয়ে যেতে হবে, তারপর তার বুকে জ্বলন্ত লাল লোহার ছেঁকা দিয়ে ইংরেজি 'V'- অক্ষরটি (ইংরেজি 'vagabond' (ভবঘুরে) শব্দের আদ্যক্ষর) দেগে দিয়ে তাকে শেকলে বেঁধে রাস্তার কাজে কিংবা অন্য কোনো শ্রমসাধ্য কাজে নিযুক্ত করা হবে। ভবঘুরেটি যদি তার জন্মস্থানের মিথ্যে পরিচয় দেয়, তাহলে তার উল্লেখ-করা জায়গাটির যাবজ্জীবন ক্রীতদাসে পরিণত হবে সে, দাসত্ব করবে সে সেখানকার অধিবাসীদের অথবা সেখানকার পুরসভার এবং তার গায়ে 'S'-অক্ষরটি দেগে দেয়া হবে। এই ভবঘুরেদের সন্তানসন্ততিকে নিজেদের অধীন করে নেয়ার ও শিক্ষানবিশ হিসেবে তাদের কাজে লাগানোর অধিকার থাকছে সকল মানুষের, ছেলেদের ২৪ বছর ও মেয়েদের ২০ বছর বয়স পর্যন্ত তাদের এইভাবে অধীনে রাখতে পারে সকলেই। যদি তারা পালিয়ে যায় তাহলে তাদের ধরে এনে ওই বয়স না হওয়া পর্যন্ত মালিকদের দাস করে রাখতে হবে তাদের, আর মালিকরা ইচ্ছে করলে তাদের শেকলে বেঁধে রাখতে কিংবা

বেত মারতে পারবে, ইত্যাদি। প্রতিটি দাস-মালিক তার ক্রীতদাসের গলায়, দুই বাহুতে অথবা দুই পায়ে লোহার বেড়ি পরিয়ে রাখতে পারবে, যা দিয়ে তাকে অপেক্ষাকৃত সহজে ও নিশ্চিতভাবে চিনে নেয়া যাবে।* এই সংবিধির শেষাংশে বলা হয়েছে যে কোনো একটি জায়গা বা কিছু-কিছু লোক কিছু-সংখ্যক দরিদ্রকে কাজে নিযুক্ত করতে পারে, যদি তারা ওই দরিদ্রদের খাদ্য-পানীয় দিতে ও তাদের জন্যে কাজ খুঁজে দিতে ইচ্ছুক থাকে। যাজক-পল্লীগুলিতে এই ধরনের ক্রীতদাস পোষণের প্রথা ইংলন্ডে ঊনবিংশ শতকেও বেশ দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত ছিল। এই দাসেরা পরিচিত ছিল 'roundsmen' (ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়-সম্পর্কিত ফরমায়েশ সংগ্রাহক) নামে।

১৫৭২ সালে প্রবর্তিত রানী এলিজাবেথের আইন-অনুযায়ী ১৪ বছরের বেশি বয়সের লাইসেন্সবিহীন ভিক্ষুকদের প্রচণ্ডভাবে বেত্রাঘাত করার এবং তাদের বাঁ-কানে দাগা দিয়ে দেয়ার নিয়ম ছিল, যদি-না কেউ তাদের অন্ততপক্ষে দু'বছরের জন্যে কাজে নিযুক্ত করার দায়িত্ব নিত। ভিক্ষাবৃত্তির এই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটলে এবং ভিক্ষুকদের বয়স ১৮ বছরের বেশি হলে তাদের প্রাণদণ্ড দেয়া হোত, তবে এক্ষেত্রেও কেউ তাদের দু'বছরের জন্যে কাজে নিযুক্ত করতে রাজি হলে দণ্ডাদেশ মকুব করা হোত। কিন্তু তৃতীয়বার ফের এ-ধরনের অপরাধ করলে ভিক্ষুকদের দুর্বৃত্ত বলে গণ্য করে বিন্দুমাত্র অনুকম্পা না-দেখিয়ে তাদের প্রাণদণ্ড দেয়া হোত। এই ধরনের তৎকালীন অপরাপর সংবিধি হল, এলিজাবেথের রাজত্বের অষ্টাদশ বর্ষে জারি করা আইনের ত্রয়োদশ অধ্যায় ও ১৫৯৭ সালের অপর একটি আইন।**

---

* ১৭৭০ সালে প্রকাশিত 'বাণিজ্য, ইত্যাদি বিষয়ক নিবন্ধাবলী'র লেখক বলছেন, 'রাজা ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের রাজত্বকালে মনে হয় ইংরেজ জাতি বস্তুতই আন্তরিকভাবে হস্তশিল্প-কারখানার বিস্তারে উৎসাহ দিতে ও দরিদ্রদের কারখানার কাজে নিযুক্ত করতে শুরু করেছিল। এটি আমরা জানতে পারি একটি বিশেষ উল্লেখ্য সংবিধি থেকে, যা শুরু হয়েছে এইভাবে: 'যে সকল ভবঘুরেকে দেগে দেয়া হবে', ইত্যাদি ইত্যাদি। ('An Essay on Trade and Commerce'. London, 1770, p. 5.)

** টমাস মোর তাঁর 'ইউটোপিয়া' গ্রন্থে বলছেন: 'অতএব লোলুপ ও তৃপ্তিহীন আগ্রাসক এবং স্বদেশের অভিশাপস্বরূপ সেই ব্যক্তি মনে-মনে দুষ্টবুদ্ধি আঁটিয়া একটিমাত্র

বেড়া কিংবা ক্ষুদ্র বৃক্ষসারির সাহায্যে বহু সহস্র একর জমি ঘিরিয়া লইবার পর কৃষকেরা তাহাদের নিজস্ব এলাকা হইতে বহিষ্কৃত হইল, অথবা হয় ফাঁকি ও জুয়াচুরি নয়তো সহিংস উৎপীড়নের সাহায্যে তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করা হইল, অথবা অন্যায় আচরণ ও ক্ষতিসাধনের দ্বারা তাহাদিগকে এতই উত্ত্যক্ত করিয়া তোলা হইল যে তাহারা সর্বকিছু বেচিয়া দিতে বাধ্য হইল: অতএব যে-কোনো উপায়ে, ছলে-বলে যেমন করিয়াই হউক, বিতাড়িত করা হইল সেই দরিদ্র, নিরীহ, হতভাগ্য মানুষগুলিকে, সেই পুরুষ, স্ত্রীলোক, স্বামী, স্ত্রী, অনাথ শিশু, বিধবা, শিশুসন্তান-ক্রোড়ে ক্রন্দনরতা মাতার দলকে এবং তৈজসপত্রের বিচারে সামান্য হইলেও জনসংখ্যার বিচারে যাহা প্রাচুর্যে পূর্ণ (কেননা কৃষক-পরিবারে বহুসংখ্যক কাজের লোকের প্রয়োজন হয় বলিয়া) সেই অগণিত পরিবারকে। তাহাদের চির-পরিচিত, অভ্যস্ত ঘর-সংসার ও পরিবেশ ছাড়িয়া তাহারা উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটিয়া চলিল, এমনকি বিশ্রাম করিবার, মাথা গুঁজিবার আশ্রয়টুকুও পাইল না কোথাও। তাহাদের ঘর-গৃহস্থালির ব্যবহার্য সামগ্রী সমুদায়, আর্থিক মূল্যের বিচারে যৎসামান্য হইলেও যেগুলি অবশ্যই বিক্রয়যোগ্য, দ্রুত ও আকস্মিকভাবে গৃহ হইতে বিতাড়িত হওয়ায় সেগুলি তাহারা বলিতে গেলে বিনামূল্যেই বিকাইয়া দিতে বাধ্য হইল। আর যখন ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে তাহাদের সেই স্বল্প সঞ্চয় বা 'বাপের আধুলি' নিঃশেষ হইয়া গেল, তখন তাহারা চৌর্যবৃত্তি ব্যতীত আর কী-ই বা অবলম্বন করিতে পারিত এবং তাহার পর ন্যায্যত (হা ঈশ্বর!) ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়া পড়া অথবা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা ছাড়া তাহাদের ভাগ্যে আর কী-ই বা ছিল? ইহার পরও ভবঘুরে বলিয়া তাহাদের নিক্ষেপ করা হইল কারাগারে, কারণ তাহারা ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল এবং কোনো কাজ করিতেছিল না: যদিও তাহারা কর্মের সন্ধানে অতিশয় ব্যাকুল হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, তবু কেহই তাহাদিগকে কর্মে নিযুক্ত করিত না।' এই সমস্ত অসহায় পলাতক, যারা দায়ে পড়ে চুরি করতে বাধ্য হত বলে টমাস মোর উল্লেখ করছেন, অষ্টম হেনরির রাজত্বকালে এদের মধ্যে '৭২ হাজার বড় ও ছিঁচকে চোরকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।' (Holinshed. 'Description of England', v. I, p. 186.) রানী এলিজাবেথের সময়ে 'দুর্বৃত্তদিগকে ক্ষিপ্রগতিতে একত্র বাঁধিয়া রাখা হইত এবং তখন সাধারণত এমন একটি বৎসরও কাটিত না যে-বৎসরের মধ্যে তিন অথবা চারিশত ব্যক্তিকে ফাঁসিকাষ্ঠে গলাধঃকরণ করিয়া না-ফেলিত।' (Strype. 'Annals of the Reformation and Establishment of Religion and other Various Occurrences in the Church of England during Queen Elisabeth's Happy Reign', 2nd ed., 1725, v. II.) ওই একই স্ট্রাইপের বিবরণ-অনুযায়ী সমারসেটশায়ারে এক বছরের মধ্যে ৪০ জনকে ফাঁসি দেয়া হয়, ৩৫ জন দস্যুর শরীরে দাগা দেয়া হয়, ৩৭ জনকে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় এবং ১৮৩ জনকে ছেড়ে

প্রথম জেমসের আমল: যে-কোনো লোককে অযথা ঘুরে বেড়াতে ও ভিক্ষা করতে দেখা যাবে তাকেই বদমায়েশ ও ভবঘুরে বলে ঘোষণা করা হবে। স্থানীয় নিম্ন আদালতের বিচারকদের এ-ব্যাপারে সরকারিভাবে অধিকার দেয়া হয়েছে যে Petty Sessions- এর (৩৫) অনুষ্ঠান করে তাঁরা এই সমস্ত অপরাধীকে প্রকাশ্যে বেত্রদণ্ড দিতে পারবেন এবং প্রথম অপরাধের জন্যে অপরাধীদের ৬ মাসের ও দ্বিতীয়বার অপরাধের জন্যে ২ বছরের কারাদণ্ড-বিধান করতে পারবেন। কারাদণ্ড ভোগের সময়ে স্থানীয় নিম্ন আদালতের বিচারকরা যেমন প্রয়োজন বোধ করবেন সেই অনুযায়ী দণ্ডিত ব্যক্তিদের যতবার ও যত ঘনঘন খুশি বেত্রদণ্ডের বিধানও দিতে পারবেন।... সংশোধনের অসাধ্য ও বিপজ্জনক বদমায়েশদের বাঁ-কাঁধে 'R'- অক্ষরটি (ইংরেজি 'Rogue' শব্দের আদ্যক্ষর) দেগে দিতে হবে এবং কঠিন শ্রমসাধ্য কাজে নিযুক্ত করতে হবে তাদের। আর যদি ফের তাদের ভিক্ষা করতে দেখা যায় তাহলে কোনোরকম দয়াদাক্ষিণ্য না-দেখিয়ে প্রাণদণ্ড দিতে হবে তাদের। অষ্টাদশ শতকের সূচনাকাল পর্যন্ত এই সমস্ত সংবিধি আইনসম্মতভাবে কার্যকর ছিল। এগুলি বাতিল হয়ে যায় একমাত্র রানী অ্যান-এর রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষে জারি করা আইনের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের ধারাবলে।

এই একই ধরনের আইনকানুন চালু ছিল ফ্রান্সেও। সেখানে সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি প্যারিসে প্রতিষ্ঠিত হয় ভবঘুরেদের (কাজ-পালানেদের) রাজত্ব। এমনকি রাজা ষোড়শ লুই-এর রাজত্বকালের সূচনাতেও (১৭৭৭ সালের ১৩ জুলাইয়ের বিশেষ ক্ষমতাবলে প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী) ১৬ থেকে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত স্বাস্থ্যবান যে-কোনো লোকের জীবনধারণের সুনির্দিষ্ট উপায় না-থাকলে ও লোকটির বিশেষ কোনো পেশা না-থাকলে তাকে পাঠিয়ে দেয়া হোত পালতোলা প্রাচীন রণতরীতে দাঁড় বাওয়ার কাজে।

দেয়া হয় 'সংশোধনের অসাধ্য ভবঘুরে' আখ্যা দিয়ে। তৎসত্ত্বেও তাঁর মতে এই বিপুল-সংখ্যক বন্দী আসল অপরাধীর এমনকি এক-পঞ্চমাংশেরও কম ছিল। এটা নাকি সম্ভব হয়েছিল স্থানীয় নিম্ন আদালতের বিচারকদের কাজে অবহেলা ও জনসাধারণের নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত দয়াদাক্ষিণ্য প্রদর্শনের ফলেই। এই দিক থেকে ইংলন্ডের অপরাপর জেলার অবস্থা নাকি সমারসেটশায়ারের চেয়ে ভালো ছিল না, বরং কিছু-কিছু জেলার অবস্থা ছিল নাকি আরও খারাপ।

এই একই ধরনের ছিল নেদার্ল্যান্ডসের জন্যে প্রবর্তিত রাজা পঞ্চম কার্লের সংবিধি (১৫৩৭ সালের অক্টোবর মাসে প্রবর্তিত), হল্যান্ডের খণ্ডরাজ্য ও শহরগর্লির প্রথম অনুশাসন (১৬১৪ সালের ১৯ মার্চ তারিখে প্রবর্তিত), সংযুক্ত প্রদেশসমূহের 'প্লাকাত' (সংবিধি) (১৬৪৯ সালের ২৫ জনু তারিখে প্রবর্তিত), ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইভাবে ওই কৃষিজীবী জনসাধারণকে প্রথমে জমি থেকে বলপ্রয়োগে উচ্ছেদ করে ও বাস্তুভিটা থেকে বিতাড়িত করে পরিণত করা হল ভবঘুরেতে, তারপর কিম্ভূতরকমের ভয়ঙ্কর সব আইনের সাহায্যে বেত্রাঘাত, দেহে চিহ্ন দেগে দেয়া, দৈহিক যন্ত্রণাদান ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে তাদের অভ্যস্ত করানো হল মজুরি-প্রথার পক্ষে প্রয়োজনীয় আদবকায়দায়।

সমাজের একটি মেরুতে শ্রমের শর্তগর্লিকে পংজির আকারে সংহত একটি পুঞ্জের রূপদান এবং অপর মেরুতে শ্রমশক্তি ছাড়া যাদের অন্য কিছুই বিক্রি করার নেই সেই জনসমষ্টিকে পুঞ্জীভূত করাটাই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয় না। ওই জনসমষ্টি যে স্বেচ্ছায় স্বীয় শ্রমশক্তি বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে সেটাও যথেষ্ট নয়। পংজিতন্ত্রী উৎপাদন-ব্যবস্থার অগ্রগতি এমন এক শ্রমিক শ্রেণী গড়ে তুলছে যা শিক্ষা, ঐতিহ্য ও অভ্যাসের বশে ওই উৎপাদন-পদ্ধতির শর্তগর্লিকে স্বতঃসিদ্ধ প্রাকৃতিক নিয়ম বলে গণ্য করছে। পংজিতন্ত্রী উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সংগঠন একবার পূর্ণ-বিকশিত হয়ে উঠলে সকল বাধাকে চূর্ণ করে দেয় তা। অনবরত গজিয়ে-ওঠা আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা শ্রমিক-সরবরাহ ও তার চাহিদার নিয়মটিকে এবং এর ফলে মজুরিকে পংজির চাহিদার সঙ্গে খাপ খেয়ে যায় এমন একটি এড়ানোর অসাধ্য বাঁধা-পথে আটকে রেখে দেয়। অর্থনৈতিক পরস্পর-সম্পর্কের একটি একঘেয়ে বাধ্যবাধকতা কায়েম করে তোলে পংজিপতির কাছে শ্রমিকদের আনুগত্য। অর্থনৈতিক শর্তাদির বাইরে প্রত্যক্ষ বলপ্রয়োগ অবশ্যই এখনও কাজে লাগানো হয়, তবে তা ব্যবহৃত হয় কেবলমাত্র বিরল কিছু-কিছু ক্ষেত্রে। সাধারণভাবে চলতি প্রথা-অনুযায়ী অবশ্য শ্রমিককে 'উৎপাদনের স্বাভাবিক নিয়মসমূহ'-এর হাতে, অর্থাৎ পংজির ওপর তার নির্ভরশীলতার কাছে, ছেড়ে রাখা যেতে পারে, যে-নির্ভরশীলতার সূত্রপাত ও তার চিরস্থায়িত্বের নিশ্চয়তাবিধান করছে আবার উৎপাদনের নিজস্ব শর্তাবলী।

পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার ঐতিহাসিক জন্মলগ্নে কিন্তু অবস্থা ছিল অন্যরকম। বুর্জোয়া শ্রেণী তার উদ্ভবের সময় রাষ্ট্রশক্তির কাছে দাবি করেছে ও ওই শক্তিকে ব্যবহার করেছে মজুরি-'নিয়ন্ত্রণ' করার কাজে, অর্থাৎ মজুরিকে উদ্বৃত্ত মূল্য অর্জনের পক্ষে উপযোগী সীমার মধ্যে সবলে আটকে রাখতে, শ্রম-দিনের দৈর্ঘ্য বাড়াতে এবং স্বয়ং শ্রমিককে পরনির্ভরতার স্বাভাবিক মাত্রার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে। এটি হল তথাকথিত আদিম সঞ্চয়ের একটি অপরিহার্য শর্ত।

চতুর্দশ শতকের শেষার্ধে যার উৎপত্তি ঘটে এবং ওই শতকে ও তার পরবর্তী শতকে যা গড়ে ওঠে সেই মজুরিনির্ভর-শ্রমিকদের শ্রেণী ছিল সমগ্র জনসংখ্যার অতি ক্ষুদ্র একটি অংশমাত্র এবং তার ওই অবস্থানে ওই শ্রেণীটি সুরক্ষিত ছিল গ্রামাঞ্চলের স্বাধীন কৃষক জোতমালিক-সম্প্রদায় ও শহরের পেশাভিত্তিক সমবায় সঙ্ঘগুলির সাহায্যে। গ্রামে ও শহরে মালিক ও শ্রমজীবী কর্মী সামাজিক দিক থেকে ঘনিষ্ঠ ছিল। পুঁজির কাছে শ্রমের আনুগত্য ছিল নিছক আনুষ্ঠানিক, অর্থাৎ খোদ উৎপাদন-পদ্ধতিরই তখনও পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট কোনো পুঁজিতন্ত্রী চরিত্র ছিল না। 'বদ্ধ' পুঁজির চেয়ে পরিমাণে বহুগুণ বেশি হোত তখন 'চল' পুঁজি। অতএব পুঁজির প্রতিটি সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত মজুরিনির্ভর শ্রমের চাহিদা দ্রুতভাবে বেড়ে গেল, অথচ মজুরিনির্ভর শ্রমের যোগান বাড়তে লাগল ধীরে-ধীরে। জাতীয় উৎপাদের একটা বড় অংশ পরে বদলে পুঁজির সঞ্চয়ের একটি তহবিলে পরিণত হল, আর এর আগেই তা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল শ্রমিকদের ভোগ্যপণ্যের তহবিলের।

মজুরিনির্ভর শ্রম-সম্পর্কিত আইনকানুনের (প্রথম থেকেই এই সমস্ত আইনকানুনের লক্ষ্য ছিল শ্রমিকদের শোষণ করা এবং যতই ক্রমশ নতুন-নতুন আইন তৈরি হতে লাগল শ্রমিকদের প্রতি সেগুলির বৈরী-মনোভাবে কোনোদিনই কোনো ব্যতিক্রম দেখা গেল না)* সূচনা হয় ইংলণ্ডে, ১৩৪৯ খ্রীস্টাব্দে, রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ডের প্রবর্তিত শ্রমিক-বিষয়ক সংবিধির মধ্যে দিয়ে। ১৩৫০ সালে ফ্রান্সে রাজা জাঁ-এর নামে প্রচারিত বিশেষ ক্ষমতাবলে

---

* 'যখনই আমাদের আইনসভা থেকে চেষ্টা হয়েছে মালিক ও তাদের শ্রমিক-

প্রদত্ত নির্দেশের সঙ্গে উপরোক্ত ওই সংবিধি খাপ খেয়ে যায়। এইভাবে ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে প্রবর্তিত আইনকানুন সমান্তরাল রেখায় চলতে থাকে এবং সেগুলির মর্মকথাও অভিন্ন হতে দেখা যায়। শ্রমিক-বিষয়ক এই সমস্ত সংবিধির লক্ষ্য যেখানে শ্রমদিনের দৈর্ঘ্য বাধ্যতামূলকভাবে প্রসারণের ব্যাপারে নিবদ্ধ সেই দিকটি নিয়ে ফের আমি এখানে আলোচনা করতে চাই না, কেননা এই বিষয়টি আলোচিত হয়েছে এর আগেই (দশম পরিচ্ছেদ, পঞ্চম অংশ দ্রষ্টব্য)।

চতুর্দশ শতকের উপরোক্ত শ্রমিক-বিষয়ক সংবিধিটি ইংলণ্ডের কমন্স-সভার জরুরী আগ্রহাতিশয্যে গৃহীত হয়।

জনেক টোরি-দলভুক্ত সদস্য সরলভাবে বলে ফেলেছেন: 'আগে গরিবরা এত চড়া মজুরি দাবি করছিল যে তার ফলে শিল্প ও সম্পদ বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। আর এখন তাদের মজুরি এতই কম যে তার ফলে শিল্প ও সম্পদ বিপন্ন হয়ে পড়েছে সমানভাবে, হয়তো আরও বেশি করেই। তবে এই বিপদ দেখা দিয়েছে অন্য দিক থেকে।'*

আইনের বলে শহর ও গ্রামাঞ্চলের জন্যে এবং ফুরনের কাজ ও দিনমজুরির জন্যে মজুরিদানের একটি নির্দিষ্ট রীতি স্থির করে দেয়া হয়। বলা হয় যে খেত-মজুররা বার্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে ঠিকা কাজে নিযুক্ত হবে এবং শহরের শ্রমিকরা নিযুক্ত হবে 'খোলা বাজারে' দরাদরির মধ্যে দিয়ে। এই আইনে বিধিবদ্ধ মজুরির চেয়ে বেশি মজুরি দেয়া নিষিদ্ধ ছিল, আইনভঙ্গ করলে কারাদণ্ডের ব্যবস্থা পর্যন্ত ছিল, তবে বেশি মজুরি দেয়ার চেয়ে তা নিলে শাস্তির ব্যবস্থা ছিল আরও কঠোর। [রানী এলিজাবেথের আমলে শিক্ষানবিশ-সংক্রান্ত সংবিধির ১৮ ও ১৯-সংখ্যক ধারা দুটিতেও এমন ব্যবস্থা ছিল। যথা, যে বেশি মজুরি দেবে তার জন্যে ব্যবস্থা দশদিনের

কর্মীদের মধ্যে নানা মতপার্থক্যকে নিয়ন্ত্রণ করার, তখনই দেখা গেছে যে আইনসভার পরামর্শদাতারা সবাই মালিকপক্ষ,' বলছেন আ. স্মিথ (৩৬)। আর লেঙ্গে বলছেন, 'মালিকানা হল আইনকানুনের সারমর্ম' (৩৭)।

* [J. B. Byles.] 'Sophisms of Free Trade'. By a Barrister. London, 1850, p. 206. বিদ্বেষ-ভরা কণ্ঠে তিনি আরও শুধিয়েছেন: 'নিয়োগকর্তার সপক্ষে হস্তক্ষেপের জন্যে আমরা তো যথেষ্টই প্রস্তুত থেকেছি, তা এখন কি শ্রমিকের সপক্ষে কিছুই করা যেতে পারে না?'

কয়েদ-খাটা, কিন্তু যে ওই মজুরি নেবে তার জন্যে নির্দিষ্ট একুশদিনের কয়েদ।] ১৩৬০ সালের এক সংবিধিতে এই শাস্তিদানের মাত্রা বৃদ্ধি করা হয় এবং মালিকদের ক্ষমতা দেয়া হয় আইনসম্মত মজুরির হারের ভিত্তিতে বলপ্রয়োগে শ্রম আদায় করার। যে-সমস্ত জোট, চুক্তি, শপথ, ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে রাজমিস্ত্রি ও ছুতোরমিস্ত্রিরা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকত, সে-সবই তখন বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়। চতুর্দশ শতক থেকে ১৮২৫ সাল পর্যন্ত শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়াটাকে গণ্য করে আসা হয়েছে জঘন্য অপরাধ হিসেবে, একমাত্র ওই ১৮২৫ সালেই সঙ্ঘগুলির বিরুদ্ধে আইনসমূহ (৩৮) নাকচ হয়ে যায়। ১৩৪৯ সালের শ্রমিক-বিষয়ক সংবিধি ও তার পরবর্তী সংবিধিসমূহের মর্মকথাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই ব্যাপারটি মনে রাখলে যে রাষ্ট্র সর্বদা মজুরির সর্বোচ্চমাত্রাই নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, কোনো কারণেই তার নিম্নতম মাত্রা নয়।

আমরা জানি যে ষোড়শ শতকে শ্রমিকদের অবস্থা বহুগুণে খারাপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অর্থের দিক থেকে তখন মজুরির পরিমাণ বেড়েছিল বটে, কিন্তু অর্থের মূল্যহ্রাস ও তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পণ্যদ্রব্যের দর বৃদ্ধি পেয়েছিল যে-পরিমাণে সে-পরিমাণে নয়। ফলে বাস্তবে মজুরি হ্রাসই পেয়েছিল। তৎসত্ত্বেও নিচুহারে মজুরি বেঁধে রাখার আইনকানুন কার্যকর রয়ে গেল, আর কার্যকর রইল 'যাদের চাকরিতে নিয়োগ করতে কেউ রাজি নয়' তাদের কানের অংশ কেটে নেয়া ও গায়ে দাগা দিয়ে দেয়ার রীতিপ্রথা। এলিজাবেথের রাজত্বের পঞ্চম বর্ষে জারি করা শিক্ষানবিশ-সংক্রান্ত সংবিধির তৃতীয় ধারা অনুযায়ী স্থানীয় নিম্ন আদালতের বিচারকদের হাতে ক্ষমতা দেয়া হয় কিছু-কিছু ক্ষেত্রে মজুরি বেঁধে দেয়ার এবং বছরের একেকটা সময় ও পণ্যদ্রব্যের দর অনুযায়ী তার হেরফের ঘটানোর। রাজা প্রথম জেমস শ্রমিক-সম্পর্কিত এই আইনকানুনের পরিধি বিস্তৃত করে তাঁতি, সুতো-কাটনি ও সম্ভাব্য সকল স্তরের শ্রমজীবীকে এর অন্তর্ভুক্ত করে নেন।* রাজা দ্বিতীয় জর্জ শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার বিরুদ্ধে জারি করা আইনগুলির পরিধি বিস্তৃত করে হস্তশিল্প-কারখানাগুলিকেও তার আওতায় আনেন।

---

* রাজা প্রথম জেমসের আমলের দ্বিতীয় বর্ষে জারি করা সংবিধির ষষ্ঠ অধ্যায়

হস্তশিল্প-কারখানার যুগেই পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন-পদ্ধতি এমন যথেষ্ট পরিমাণে সবল হয়ে উঠেছিল যে তা মজুরির হারের আইনসঙ্গত নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাকে যেমন অপ্রয়োজনীয় তেমনই অবাস্তব করে তুলেছিল; তবু শাসক শ্রেণীগুলি পাছে দরকার পড়ে এই সম্ভাবনার কথা ভেবে পুরনো অস্ত্রাগারে মজুত হাতিয়ারসমূহ হাতছাড়া করতে রাজি ছিল না। তাই দেখি, রাজা দ্বিতীয় জর্জের রাজত্বের অষ্টম বর্ষে জারি করা সংবিধিতে লন্ডন ও তার

থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিছু-কিছু বস্ত্র-প্রস্তুতকারক স্থানীয় নিম্ন আদালতের বিচারকের পদাধিকার-বলে তাদের নিজেদের তাঁতশালে কর্মীদের মজুরি নির্ধারণের ব্যাপারে সরকারি হার নির্ণয়ের দায়িত্ব নিজে থেকেই গ্রহণ করেছে। জার্মানিতে, বিশেষ করে ত্রিশ-বর্ষব্যাপী যুদ্ধের পরে, মজুরির হার নিচু পর্যায়ে বেঁধে রাখার উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত সংবিধিগুলি প্রচলিত ছিল সাধারণভাবেই। 'জনবসতি-মুক্ত জেলাগুলিতে গৃহভৃত্য ও জনমজুরের অভাব জমির মালিকদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সকল গ্রামবাসীকে নিষেধ করে দেয়া হয়েছিল অবিবাহিত, একক কোনো পুরুষ বা স্ত্রীলোককে তাদের ঘর ভাড়া দিতে। বলা হয়েছিল এই ধরনের কোনো পুরুষ বা স্ত্রীলোক গ্রামে এলে সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষকে সে-সম্বন্ধে খবর দিতে এবং তারা যদি গৃহভৃত্য হতে রাজি না-হয় তাহলে এমনকি অন্য কোনো কাজে তারা নিযুক্ত থাকলেও — যেমন, দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কৃষকদের হয়ে জমিতে বীজবোনা, অথবা এমনকি শস্য-কেনাবেচার কাজে রত থাকলেও — জেলখানায় পোরা হবে তাদের।' ('Kaiserliche Privilegien und Sanctionen für Schlesien', I, 125.) গোটা একটা শতাব্দী জুড়ে ছোট-ছোট জার্মান রাজ্যের রাজাদের হুকুমনামাগুলিতে বারে-বারে এই তিক্ত আক্ষেপ উচ্চারিত হতে দেখা যায় যে দুষ্টবুদ্ধি ও উদ্ধত ইতর জনসাধারণ কিছুতেই নিজেদের মন্দভাগ্যকে মেনে নিতে রাজি নয়, কিছুতেই তারা সন্তুষ্ট নয় আইনসম্মত মজুরি পেয়ে। ওই সমস্ত হুকুমনামায় জমির মালিকদের জনে-জনে নিষেধ করা হয়েছে রাষ্ট্র শ্রমিকদের মজুরির যে-হার নির্দিষ্ট করে দিয়েছে তার চেয়ে বেশি মজুরি দিতে। তবু, তাসত্ত্বেও, ওই সময়কার, বিশেষ করে যুদ্ধের পরে কোনো-কোনো সময়ে, কর্মনিয়োগের শর্তাদি ওর ১০০ বছর পরেকার অবস্থার চেয়ে ভালোই ছিল। যেমন, সাইলেসিয়ার খামার-ভৃত্যরা ১৬৫২ সালে সপ্তাহে দু'বার করে মাংস খেতে পেত, অথচ এমনকি আমাদের বর্তমান শতকেও এমন অনেক জেলা আছে যেখানে ওই খামার-ভৃত্যরা বছরে মাত্র বার-তিনেক মাংস খেতে পায়। তদুপরি, যুদ্ধের পরে মজুরির হারও ছিল পরবর্তী শতকের চেয়ে বেশি।' (G. Freytag. ['Neue Bilder aus dem Leben des deutschen Volkes'. Leipzig, 1862, S. 35, 36.])

পার্শ্ববর্তী এলাকায় ঠিকা দরজিদের দৈনিক ২ শিলিং ৭·৫ পেন্সের চেয়ে বেশি হারে মজুরি দেয়া নিষিদ্ধ করা হচ্ছে; জাতীয় শোকপালনের বিশেষ-বিশেষ সময় কেবল ছিল এর ব্যতিক্রম। তাই দেখি, তৃতীয় জর্জের রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষে জারি করা সংবিধির ৬৮-সংখ্যক অধ্যায়ে রেশমবস্ত্র-বয়ন-শিল্পীদের মজুরির হার নির্ধারণের ভার দেয়া হচ্ছে স্থানীয় নিম্ন আদালতের বিচারকদের হাতে। তাই দেখি, মজুরির হার নির্ধারণের ব্যাপারে স্থানীয় নিম্ন আদালতের বিচারকদের নির্দেশ কৃষি-বহির্ভূত শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য কিনা তা স্থির করার জন্যে ১৭৯৬ সালে উচ্চতর আদালতগুলির পক্ষ থেকে দু'বার রায় দেয়ার প্রয়োজন হচ্ছে। তাই দেখি, ১৭৯৯ সালে পার্লামেন্টের একটি আইন নির্দেশ দিচ্ছে যে স্কচ খনি-শ্রমিকদের মজুরির হার তখনও নিয়ন্ত্রিত হবে রানী এলিজাবেথের আমলের একটি সংবিধি এবং ১৬৬১ ও ১৬৭১ সালে প্রবর্তিত দুটি স্কচ আইনের ধারা-অনুযায়ী। অথচ ইতিমধ্যে সময় ও পরিবেশ যে কী সম্পূর্ণত বদলে গিয়েছিল তার প্রমাণ মেলে ইংলন্ডের কমন্স-সভায় সংঘটিত অশ্রুতপূর্ব এক ঘটনায়। ওই সভায়, যেখানে তার আগের ৪০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে মজুরির সর্বোচ্চ হার (যার চেয়ে বেশি হারে মজুরিবৃদ্ধি একেবারেই অনুচিত বলে গণ্য) নির্ধারণ-সম্পর্কিত আইনকানুন প্রবর্তিত হয়ে আসছিল, সেখানে ১৭৯৬ সালে হুইটব্রেড প্রস্তাব করে বসলেন খেত-মজুরদের জন্যে আইনসম্মত সর্বনিম্ন মজুরির হার নির্ধারণের। পিট এ-প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন, তবে স্বীকার করলেন যে 'গরিবদের অবস্থা সত্যিই শোচনীয়'। পরিশেষে ১৮১৩ সালে মজুরির হার নিয়ন্ত্রণ-সম্পর্কিত আইনগুলি বাতিল করা হল। আইনগুলি অবশ্য ইতিমধ্যে হয়ে দাঁড়িয়েছিল কিম্ভূত এক ব্যতিক্রমবিশেষ, কারণ বাস্তবে পুঁজিপতি তার কারখানা নিয়ন্ত্রণ করছিল নিজের-তৈরি আইনকানুনের বলে এবং দারিদ্র-সাহায্য তহবিল থেকে ভরতুকি দিয়ে খেত-মজুরদের মজুরি অপরিহার্য ন্যূনতম হারে বেঁধে রাখতে সক্ষম হচ্ছিল। তবে মালিক-কর্মীর মধ্যে চুক্তি, ছাঁটাই করা বা কাজ ছাড়ার নোটিশ দেয়া এবং এই ধরনের অন্যান্য ব্যাপারে শ্রমিক-সম্পর্কিত সংবিধিগুলির সংশ্লিষ্ট শর্তাদি আজও পর্যন্ত পূর্ণ ক্ষমতায় বহাল আছে, যা নাকি চুক্তিভঙ্গকারী মালিকের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র দেওয়ানি মামলা রুজু করারই

অনুমতি দেয়, অথচ বিপরীতপক্ষে চুক্তিভঙ্গকারী শ্রমিক-কর্মীর বিরুদ্ধে অনুমতি দেয় ফৌজদারি মামলা রুজু করার।

প্রলেতারিয়েতের মারমুখী আচরণের মুখোমুখি হওয়াতে সঙ্ঘগুলির বিরুদ্ধে জারি করা বর্বর আইনকানুনের অবসান ঘটে ১৮২৫ সালে। তবে, এর অবসান ঘটে আংশিকভাবেই। পুরনো সংবিধির কিছু-কিছু আহামরি টুকরোটাকরা অন্তর্ধান করে একমাত্র ১৮৫৯ সালে। আর তারপর, অবশেষে ১৮৭১ সালের ২৯ জুনের পার্লামেণ্টারি আইনে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে আইনসম্মত স্বীকৃতি দিয়ে এই শ্রেণীর আইনকানুনের শেষ আভাসটুকু দূর করার একটা ভান করা হয়। তবে ওই একই তারিখে প্রবর্তিত অপর এক পার্লামেণ্টারি আইনের বলে (সহিংস আচরণ, ভীতি-প্রদর্শন ও দৈহিক উৎপীড়ন-সম্পর্কিত ফৌজদারি আইন সংশোধন-বিষয়ক আইনের সাহায্যে) বস্তুতপক্ষে পুরনো ব্যাপারটিকেই নতুন চেহারা দিয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠা দেয়া হল। পার্লামেণ্টারি এই মারপ্যাঁচের সাহায্যে ধর্মঘট বা 'লক-আউট'-এর সময়ে শ্রমিকরা যে-সমস্ত আইনগত উপায় অবলম্বন করতে পারত সেগুলিকে সর্বসাধারণের প্রচলিত আইনের আওতা থেকে প্রত্যাহার করে নেয়া হল এবং তা অন্তর্ভুক্ত করা হল বিশেষ ধরনের ফৌজদারি দণ্ডবিধির, আর এইসব ধারার ব্যাখ্যার দায়িত্ব অর্শাল স্থানীয় নিম্ন আদালতের বিচারক হিসেবে সেই মালিকদেরই ওপর। এর দু'বছর আগে ওই একই কমন্স-সভায় সেই এক মিঃ গ্লাডস্টোন তাঁর সুপরিচিত স্পষ্টবক্তার ধরনে একটি প্রস্তাব পেশ করেন শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার বিশেষ ফৌজদারি আইন অবলোপের উদ্দেশ্যে। কিন্তু সেই প্রস্তাবটিকে কখনোই সংসদে দ্বিতীয়বার পাঠের বেশি এগোতে দেয়া হয় নি এবং এইভাবে ব্যাপারটা নিয়ে টানাহেঁচড়ায় কালক্ষেপ করার পর অবশেষে 'মহান উদারনীতিক পার্টি' যে-প্রলেতারিয়েতের সাহায্যে ক্ষমতায় আসীন হয়েছিল টোরিদের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তির বলে বলীয়ান হয়ে তারই বিরুদ্ধে যাবার মতো সাহস সঞ্চয় করে। শুধু তা-ই নয়, এই বিশ্বাসঘাতকতায়ও সন্তুষ্ট না-হয়ে 'মহান উদারনীতিক পার্টি' শাসক শ্রেণীগুলির সেবায় সদাই তৎপর ইংরেজ বিচারকদের অনুমতি দেয় ফের একবার 'ষড়যন্ত্র'-এর (৩৯) বিরুদ্ধে সেই পুরনো আইনগুলিকে কবর খুঁড়ে বের করতে এবং শ্রমিকদের মৈত্রীজোটগুলির বিরুদ্ধে তা প্রয়োগ করতে।

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে ও কেবলমাত্র জনসাধারণের চাপে পড়েই ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ধর্মঘট ও ট্রেড ইউনিয়নের বিরুদ্ধে প্রবর্তিত আইনকানুন ত্যাগ করেছে, এবং তা করেছে নিজে ৫০০ বছর ধরে নির্লজ্জ স্বার্থপরের মতো শ্রমিকদের বিরুদ্ধে পুঁজিপতিদের এক স্থায়ী ট্রেড ইউনিয়নের চেহারা নিয়ে বেঁচেবর্তে থাকার পর।

বিপ্লবের একেবারে প্রথম ঝড়ের দাপটের মধ্যেই ফরাসি বুর্জোয়া শ্রেণী শ্রমিকদের সদ্য-অর্জিত সংঘবদ্ধ হওয়ার অধিকার কেড়ে নিতে সাহস করে। ১৭৯১ সালের ১৪ জুনের হুকুমনামা অনুসারে তারা ঘোষণা করে শ্রমিকদের সকল রকমের মৈত্রীজোট 'স্বাধীনতা ও মানুষের অধিকার-সম্পর্কিত সনদের বিরোধী কার্যকলাপ' এবং তা শাস্তিযোগ্যও। এর শাস্তি হল, ৫শো লিভ্র জরিমানা এবং তার সঙ্গে এক বছরের জন্যে একজন সক্রিয় নাগরিককে তার অধিকারাদি থেকে বঞ্চিত করা। রাষ্ট্রিক জবরদস্তির হাতিয়ারে সজ্জিত হয়ে পুঁজি এবং শ্রমিকের মধ্যেকার সংগ্রামকে পুঁজির পক্ষে স্বস্তিকর সীমার মধ্যে আবদ্ধ করে রেখে উপরোক্ত ওই আইন* সকল বিপ্লব ও রাজবংশগুলির উত্থানপতন সত্ত্বেও এই সেদিন পর্যন্তও টিকে ছিল। এমনকি ফরাসি বিপ্লবোত্তর সন্ত্রাসের সরকারও (৪০) এর গায়ে হাত দেয় নি। একেবারে সম্প্রতি ফৌজদারি দণ্ডবিধি থেকে বাদ দেয়া হয়েছে এই আইনটিকে। এই বুর্জোয়া 'কুদেতা'র সপক্ষে যে-অজুহাত দেখানো হয়েছে তার চেয়ে বৈশিষ্ট্যসূচক আর কিছুই নয়। শাপেলিয়ে বলছেন, 'ধরেই নেয়া

---

* এই আইনের প্রথম ধারায় বলা হয়েছে: 'একই সম্পত্তি বা একই পেশার ব্যক্তিদের সবধরনের সঙ্ঘ গঠনের অস্বীকৃতি ফরাসি সংবিধানের অন্যতম মৌলিক ভিত্তি বলে যে-কোনো অজুহাতে এবং যে-কোনো রূপে ওই সংঘগুলির পুনঃস্থাপন নিষেধ'। চতুর্থ ধারায় বলা হয়েছে: 'যদি একই পেশা, শিল্পকলা বা হস্তশিল্পের অনুগামী নাগরিকরা এইমর্মে স্থির করে কিংবা এমন একটা বোঝাপড়ায় আসে যার উদ্দেশ্য হল একসঙ্গে মিলে চুক্তি অমান্য করা বা তাদের শিল্পগত কার্যকলাপ ও ব্যক্তিগত কাজ দিয়ে শুধু নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকে উপকার করতে রাজি হওয়া তাহলে উপরোক্ত ষড়যন্ত্র ও বোঝাপড়া... সংবিধানবিরোধী এবং স্বাধীনতা ও মানুষের অধিকার-ঘোষণার বিরোধী বলে মনে করা দরকার, ইত্যাদি', অর্থাৎ, শ্রমিক-বিষয়ক পুরনো সংবিধিগুলিতে যেমন এখানেও তেমনই গুরুতর দুর্বৃত্তির প্রকাশ দেখা যাচ্ছে। ('Révolutions de Paris'. Paris, 1791, III, p. 523.)

গেল না-হয় যে মজুরির হার এখন যা আছে তার চেয়ে সামান্য কিছুটা বেশি হওয়া দরকার, ... যে মজুরি পাচ্ছে তার পক্ষে মজুরি এতটা বেশি হওয়া দরকার যাতে সে জীবনধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অভাবের দরুন একান্ত পরনির্ভরতার অবস্থা থেকে অব্যাহতি পেতে পারে, মুক্তি পেতে পারে সেই পরনির্ভরতা থেকে যা নাকি প্রায় ক্রীতদাসত্বেরই সমতুল্য।' তবু কিন্তু নিজেদের স্বার্থ ও ভালোমন্দ সম্বন্ধে কোনোরকম বোধে শ্রমিকদের উত্তীর্ণ হতে দেয়া, কিংবা একযোগে সক্রিয় হতে দেয়া এবং এই উপায়ে তাদের 'সেই একান্ত পরনির্ভরতা ... যা নাকি প্রায় ক্রীতদাসত্বেরই সমতুল্য' তার বোঝা হালকা করতে দেয়া একেবারেই উচিত হবে না, কেননা সত্যি বলতে কি এমন কাজ করতে গিয়ে শ্রমিকরা ক্ষুন্ন করবে 'তাদের প্রাক্তন প্রভু বা বর্তমান শিল্পপতি নিয়োগকর্তাদের স্বাধীনতাকে'। তাছাড়া পুর-প্রতিষ্ঠানগুলির প্রাক্তন প্রভুদের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এ-ধরনের মৈত্রীজোট গঠনের অর্থই নাকি—(কল্পনা করুন তো কী!)—ফরাসি সংবিধানের বিধি অনুযায়ী বিলুপ্ত সেই পুর-প্রতিষ্ঠানগুলিরই পুনরুদ্ধার ছাড়া কিছু নয়।*

৪। পুঁজিতন্ত্রী খামারীর উৎপত্তি

এ-পর্যন্ত আমরা আলোচনা করেছি আইনের রক্ষণাবেক্ষণ-বঞ্চিত প্রলেতারিয়ানদের একটি শ্রেণী বলপ্রয়োগে সৃষ্টি করার কাহিনী, রক্তক্ষয়ী আইনশৃঙ্খলার পেষণে ওই প্রলেতারিয়ানদের মজুরিনির্ভর-শ্রমিকে পরিণত করার কথা এবং শ্রমিক-শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি করে পুঁজি সঞ্চয়ের প্রক্রিয়া দ্রুততর করার উদ্দেশ্যে পুলিশ নিয়োগ করার মতো রাষ্ট্রের লজ্জাকর ক্রিয়াকলাপের বিবরণ নিয়ে। অতঃপর প্রশ্ন থেকে যায়: একেবারে গোড়ায় পুঁজিপতিরা এল কোথা থেকে? কেননা কৃষিজীবী জনসাধারণকে জমি থেকে উচ্ছেদের ফলে সরাসরি যা সৃষ্টি হয় তা বড়-বড় ভূস্বামী ছাড়া অন্যকিছু নয়। তবে খামারীর উৎপত্তির কথা বলতে গেলে আমরা সে-ব্যাপারের আলোচনায় অনায়াসেই নামতে পারি, কারণ এটি এমন একটি মন্থর

* Buchez et Roux. 'Historie Parlementaire', t. X, pp. 193-195 passim.

প্রক্রিয়া যার ক্রমবিকাশ ঘটেছে বহু শতাব্দী ধরে। ভূমিদাসরা এবং সেইসঙ্গে ছোট-ছোট জোতজমির স্বাধীন মালিকরা জমি ভোগদখল করত একেবারে ভিন্ন-ভিন্ন ধরনের দখলিস্বত্ব অনুযায়ী, কাজেই তারা মুক্তি পেয়েছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে।

ইংলণ্ডে খামারীর প্রথম প্রকাশ ঘটে ভূস্বামীর নিযুক্ত-করা জমিদারির bailiff বা তত্ত্বাবধায়ক রূপে, এই তত্ত্বাবধায়ক নিজেই ছিল তখন ভূমিদাস। তার পদমর্যাদা ছিল প্রাচীনকালের রোমান villicus- এর সমান, তবে তার কর্মক্ষেত্র ছিল অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ। চতুর্দশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই ভূমিদাস তত্ত্বাবধায়কের স্থান নিয়েছে খামারী প্রজা, আর এই খামারীকে ভূস্বামী সরবরাহ করেছে বীজ, ঘোড়া ইত্যাদি পশু ও চাষের যন্ত্রপাতি। এই খামারীর অবস্থা তখন সাধারণ কৃষকের চেয়ে বড়-একটা তফাত ছিল না। কেবল সে অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণে মজুরিনির্ভর খেত-মজুরের শ্রম শোষণ করত এইমাত্র। অল্পদিনের মধ্যে এই খামারী বনে যায় 'métayer', বা আধা-খামারী। সে কৃষিতে ব্যবহারযোগ্য পুঁজির একটা অংশ যোগাতে থাকে আর ভূস্বামী যোগাতে থাকে বাকি অংশ। জমিতে উৎপন্ন ফসলের মোট পরিমাণ পূর্ববর্তী চুক্তির শর্ত অনুযায়ী তারা নিজেদের মধ্যে আনুপাতিক হারে বাঁটোয়ারা করে নিতে থাকে। তবে ইংলণ্ডে ইজারার এই প্রথা দ্রুত লুপ্ত হয়ে যায় এবং এর জায়গায় উৎপত্তি ঘটে পুরোদস্তুর খামারীর, যে মজুরিনির্ভর খেত-মজুর নিযুক্ত করে নিজের পুঁজিই খাটাতে থাকে এবং উদ্বৃত্ত উৎপাদের একটা অংশ, তা সে অর্থে কিংবা ফসলে যা-ই হোক-না কেন, জমির খাজনা হিসেবে দিতে থাকে ওপরওয়ালা ভূস্বামীকে।

তবে যতদিন—অর্থাৎ পঞ্চদশ শতকে—স্বাধীন কৃষক এবং নিজের জমিতে ও মজুরির বিনিময়ে অপরের জমিতেও কর্মরত খেত-মজুর নিজেদের গতরের বিনিময়ে সম্পদ আহরণে নিরত থেকেছে, ততদিন খামারীর ও তার উৎপাদন-ক্ষেত্রের অবস্থা আর্থিক বিচারে থেকেছে একই রকম মাঝারি স্তরে। পঞ্চদশ শতকের শেষ তৃতীয়াংশে যে কৃষি-বিপ্লবের সূচনা ঘটে এবং যা প্রায় গোটা ষোড়শ শতক ধরে বিবর্ধিত হয় (ওই শতকের শেষ কয়েক দশক কেবল বাদ দিয়ে) তা ওই পূর্বোক্ত খামারীকে যেমন দ্রুত ধনী করে তোলে

তেমনই দ্রুত তা দরিদ্র করে তোলে সমগ্র কৃষিজীবী জনসাধারণকে।* এজমালি জমিগুলি আত্মসাৎ করায় ওই খামারীর পক্ষে বলতে গেলে প্রায় নিখরচায় সম্ভব হয় ঘোড়া, গোরু, ইত্যাদি পশুর পাল বহুগুণে বাড়িয়ে তোলা, আবার এই গবাদি পশুর সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে জমিচাষের জন্যে আরও অধিক পরিমাণে সারের যোগানও পেয়ে যায় সে।

এর সঙ্গে ষোড়শ শতকে আবার যুক্ত হয় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ওই সময়ে খামার ইজারা দেয়ার চুক্তি করা হোত দীর্ঘমেয়াদী হারে, প্রায়ই ৯৯ বছরের জন্যে। আর ওই সময়েই সোনা-রুপো ইত্যাদি মূল্যবান ধাতুর দাম ক্রমশ পড়ে যেতে থাকে এবং ফলত পড়ে যায় মুদ্রার মূল্যও, আর খামারীদের ধুলোমুঠি সোনামুঠি হয়ে ওঠে। এর আগে অন্যান্য যে-সমস্ত ব্যাপারের কথা আলোচিত হয়েছে তা ছাড়াও এর ফলে মজুরির হার গেল পড়ে। খেত-মজুরদের প্রাপ্য এই মজুরির একটা অংশ তখন যুক্ত হল খামারের লাভের অঙ্কের সঙ্গে। শস্য, পশম, মাংস, এক কথায় সকল কৃষিজাত উৎপাদের অনবরত দরবৃদ্ধির ফলে খামারীর তরফ থেকে বিনা প্রয়াসেই তার মুদ্রার পুঁজি ফুলেফেঁপে উঠল, অপরদিকে জমির ইজারাবাবদ যে-খাজনা সে ওপরওয়ালা ভূস্বামীকে দিত তার মূল্য (আগেকার মুদ্রার ভিত্তিতে হিসাব করা হোত বলে) বাস্তবে হ্রাস পেল।** এইভাবে খামারীরা তাদের ভাড়াটে

---

* হ্যারিসন তাঁর 'Description of England' শীর্ষক বইয়ে বলছেন, 'যদি-বা ঘটনাচক্রে চারি পাউণ্ডের পুরনো খাজনার হারকে বৃদ্ধি করিয়া চল্লিশ পাউণ্ডে পরিণত করা হয় এবং তাহার ইজারার মেয়াদ শেষ হইবার মুখে ওই খাজনা পঞ্চাশ অথবা এক শত পাউণ্ডে দাঁড়ায়, তাহা হইলে ছয় বা সাত বৎসরের বকেয়া খাজনা তাহার কাছে বাকি পড়িয়া না-থাকিলে খামারী তাহার লাভ অতি যৎসামান্য বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে।'

** ষোড়শ শতকে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ওপর মুদ্রার মূল্যহ্রাসের প্রভাব সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্যে 'A Compendious or Briefe Examination of Certayne Ordinary Complaints of Divers of our Countrymen in these our Dayes'. By W. S., Gentleman (London, 1581). শীর্ষক বইখানি দেখুন। কথোপকথনের ঢঙে লিখিত এই বইখানি স্বয়ং শেক্সপিয়রের রচনা বলে দীর্ঘদিন লোকের বিশ্বাস ছিল এবং এমনকি ১৭৫১ সালেও বইখানি ছাপা হয়েছিল তাঁর নামে। আসলে এ-বইয়ের লেখক ছিলেন উইলিয়ম স্ট্যাফোর্ড। বইটির এক জায়গায় মধ্যযুগীয় 'নাইট' বা বীরব্রতী যুক্তি দেখাচ্ছেন এই বলে:

মজুর ও ওপরওয়ালা ভূস্বামী উভয় তরফের ক্ষতির বিনিময়ে নিজেরা ধনী হয়ে উঠল। অতএব এতে বিস্মিত হবার কিছু থাকে না যখন দেখি যোড়শ শতকের শেষাশেষি ইংলণ্ডে 'পুঁজিতন্ত্রী খামারীর' এমন একটি শ্রেণী গড়ে উঠেছে যে-শ্রেণীটিকে তখনকার অবস্থার বিচারে ধনীই বলা চলে।*

নাইট: 'ওহে পড়শী কৃষক, ওহে বস্ত্র-ব্যবসায়ী কারুশিল্পী এবং তুমি পিপা-নির্মাতা গৃহস্থ, তোমরা অপরাপর কারিগরদের সহিত বেশ ভালোভাবেই আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে সমর্থ। কারণ সকল দ্রব্যসামগ্রীর দর পূর্বাপেক্ষা যেমত বৃদ্ধি পাইয়াছে সেমত তোমরাও তোমাদিগের নির্মিত দ্রব্যাদির এবং তোমাদিগের শ্রমের দরবৃদ্ধি ঘটাইয়া তাহা বিক্রয় করিতেছ। কিন্তু আমাদিগের বিক্রয় করিবার মতো এমন কিছুই নাই যাহা দ্বারা তোমাদিগের নিকট চড়া দামে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া আমাদিশকে যাহা ক্রয় করিতেই হইবে সেই সকল দ্রব্যের দরের সমতারক্ষা করিতে পারি।' অন্য এক জায়গায় 'নাইট' ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করছেন: 'আচ্ছা, বলুন তো মহাশয়, আপনি যাহাদের কথা বলিতেছেন তাহারা কোন স্তরের ব্যক্তি? এবং প্রথমত, তাহারাই-বা কাহারা যাহাদের কোনোপ্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইতেছে না বলিয়া আপনি মনে করেন?' **ডাক্তার:** 'আমি সেই সম্প্রদায় ব্যক্তির কথাই বলিতেছি যাহারা ক্রয়-বিক্রয় করিয়া জীবিকানির্বাহ করিয়া থাকে, কারণ তাহারা একহাটে চড়া দামে কেনে ও অতঃপর বিক্রয় করে অপর হাটে।' **নাইট:** 'আচ্ছা, ইহা দ্বারা লাভবান হইবে এমন অপর কোন স্তরের ব্যক্তিদের কথা বলিতেছিলেন যেন?' **ডাক্তার:** 'কেন? হা ঈশ্বর! আমি তাহাদের কথাই বলিতেছিলাম যাহারা পুরনো খাজনায় নিজ-নিজ তত্ত্বাবধানে (চাষাবাদের অধীনে) খামারসমূহ ইজারা লইয়াছে। ইহারা খাজনা দেয় পুরনো হারে আর বিক্রয় করে নূতন হারে — অর্থাৎ, ইহারা জমির জন্যে খাজনা দেয় অতীব সামান্য অর্থ, আর জমি হইতে উৎপন্ন সকল দ্রব্য বিক্রয় করে চড়া দরে।' **নাইট:** 'আচ্ছা, অপর কোন স্তরের লোকের কথা আপনি বলিতেছিলেন ইহার ফলে যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে পূর্বোক্ত ব্যক্তিবর্গের মুনাফার মাত্রার অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে?' **ডাক্তার:** 'ইঁহারা হইলেন সকল অভিজাত, ভদ্রলোক এবং অপরাপর সকলে যাঁহারা প্রাণধারণ করিয়া থাকেন কার্পণ্যসহকারে বণ্টিত খাজনা বা ভাতা সম্বল করিয়া, অথবা যাঁহারা জমি নিজ তত্ত্বাবধানে (চাষবাসের অধীনে) রাখেন না, অথবা ক্রয়-বিক্রয়ের কারবারে লিপ্ত নহেন।'

* ফ্রান্সে régisseur, মধ্যযুগের গোড়ার দিকে ভূ-সম্পত্তিগুলির যতসব বেতনভুক্ত পরিচালক, দেওয়ান, সামন্তভূস্বামীদের তরফ থেকে যতসব আদায়-উসুলকারী লোকজন ছিল, কিছুকালের মধ্যেই তারা বনে গেল একেকটি কর্তাব্যক্তি এবং জবরদস্তি আদায়, প্রতারণা, ইত্যাদির সাহায্যে স্রেফ জালিয়াতি করেই পুঁজিপতি বনে গেল তারা।

৫। শিল্পে কৃষি-বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া। শিল্প-পুঁজির জন্যে অভ্যন্তরীণ বাজার-সৃষ্টি

কৃষিজীবী জনসাধারণকে জমি থেকে উচ্ছেদ ও এলাকা থেকে বহিষ্কারের প্রক্রিয়াটি থেকে-থেকে হলেও ফিরে-ফিরে বারবার তা সক্রিয় হয়ে ওঠার ফলে কীভাবে শহরের কলকারখানাগুলি যৌথ সমবায়-সংস্থাগুলির সঙ্গে পুরোপুরি সম্পর্কচ্ছিন্ন ও সেগুলির দ্বারা অ-নিয়ন্ত্রিত প্রলেতারিয়ানদের এক বিপুল জনসংখ্যার যোগান পেয়ে গেল তা আমরা দেখেছি। এটা ছিল এমনই একটা সৌভাগ্যসূচক ঘটনা যা দেখে সেকালের অন্যা. অ্যাণ্ডারসন (এঁকে পরবর্তী জেমস অ্যাণ্ডারসনের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলবেন না) তাঁর 'বাণিজ্যের ইতিহাস' (৪১) শীর্ষক বইয়ে ব্যাপারটিকে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ বলে গণ্য করেছেন। আদিম সঞ্চয়ের এই বিশেষ দিকটি নিয়ে আমাদের আরও অল্প-একটু আলোচনা করা দরকার। জোফ্রেয় স্যাঁ হিল্যার যেভাবে মহাকাশের একটা জায়গায় মহাজাগতিক বস্তুপুঞ্জের তনুভবনের

পূর্বোক্ত এই সমস্ত régisseur- এর মধ্যে কেউ-কেউ অভিজাত-সম্প্রদায়ের লোকও ছিল। যেমন, 'দিশোঁ শহরে বুর্গোঁ-এর ডিউক ও কাউণ্ট মহাশয়ের কাছে প্রভুর তরফে হিসাবের এই বিবরণ পেশ করছে জাক দ্য তোরেস, বেসাঁসোঁনে প্রাসাদরক্ষকদের নাইট; ১৩৫৯ সালের ২৫ ডিসেম্বর থেকে ১৩৬০ সালের ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত উপরোক্ত প্রাসাদের শাসিত অঞ্চল থেকে প্রাপ্য খাজনা সংক্রান্ত বিবরণী। (Alexis Monteil, 'Traité des Matériaux Manuscrits ets.' p. 234, 235).
এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কেমন করে সমাজ-জীবনের সকল ক্ষেত্রেই মধ্যগ দালালের কপালে লাভের সিংহভাগ জুটে যাওয়াটা ওরই মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেমন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যবসায়ে মূলধন-বিনিয়োগকারী, শেয়ার-বাজারের ফাটকাবাজ, ব্যবসায়ী ও দোকানদাররা মেরে দিচ্ছে দুধের সরটুকু; আইন-সংক্রান্ত ব্যাপারে আইনজীবী মক্কেল ঠকিয়ে নাস্তানাবুদ করছে; রাজনীতিতে ভোটদাতাদের চেয়ে বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে নির্বাচিত প্রতিনিধি, সার্বভৌম রাজার চেয়ে বেশি মন্ত্রীমশাই; আর ধর্মক্ষেত্রে খোদ ঈশ্বরকে পেছনে ঠেলে দিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন 'মধ্যস্থ' অবতার, আবার অবতারকেও পেছনে ঠেলে দিয়ে 'মহৎ মেষপালক' খ্রীস্ট ও তাঁর 'মেষপাল'-এর মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে অবশ্যম্ভাবীরূপে সেই মধ্যগ দালাল — অর্থাৎ পাদ্রি-পুরোহিতকুল। যেমন ইংলণ্ডে তেমনই ফ্রান্সেও বড়-বড় সামন্ততান্ত্রিক ভূখণ্ড বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল অসংখ্য ছোট-ছোট বাস্তুভিটেয়, তবে

ফলে অপর একটি জায়গায় ওই বস্তুপুঞ্জের ঘনীভবনের ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করেছেন* সেইভাবে স্বাধীন স্ব-নির্ভর কৃষকদের সংখ্যাহ্রাস ঘটানোর ফলে খেতখামারের জনবিরলতা কেবল-যে শহরে শ্রমশিল্পের প্রলেতারিয়েতের ভিড় বাড়িয়ে তুলল তা-ই নয়। জমিতে হলচাষীর সংখ্যাহ্রাস সত্ত্বেও দেখা গেল যে আগেও যেমন ছিল পরেও তেমনই জমিতে একই পরিমাণ কিংবা আরও বেশি ফলন হতে লাগল, কেননা ভূ-সম্পত্তির পরিবেশে বিপ্লব ঘটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল উন্নত ধরনের চাষের পদ্ধতি, অধিকতর পারস্পরিক সহযোগিতা, উৎপাদনের উপায়সমূহের কেন্দ্রীভবন, ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং পরিশেষে এর ফলে কৃষিতে মজুরিনির্ভর-শ্রমিকদের আগের চেয়ে আরও তীব্রভাবে-যে খাটানো হতে লাগল তা-ই নয়,** ওই শ্রমিকরা যে-সমস্ত ছোট-ছোট খেতে নিজেদের জন্যে কাজ করতে পারত সেগুলির সংখ্যাও ক্রমে আসতে লাগল ক্রমশ। অতএব কৃষিজীবী জনসাধারণের একটি অংশকে মুক্ত করে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের জীবনধারণের প্রাক্তন উপায়াদিও গেল মুক্ত হয়ে। আর সেই উপায়াদি এখন রূপান্তরিত হয়ে গেল 'চল'-পুঁজির বস্তুগত

তা ঘটেছিল সাধারণ মানুষের পক্ষে তুলনার অতীত এমন বহুগুণে বেশি প্রতিকূল পরিস্থিতিতে। চতুর্দশ শতকের মধ্যে ফ্রান্সে গড়ে উঠল খামার বা 'terrier' (ঘেরাও-করা জমি)-গুলি। এই সমস্ত খামারের সংখ্যা অতঃপর অনবরত বেড়ে চলল এবং এক লক্ষের সীমা ছাড়িয়ে গেল বহুদূর। খামারগুলির তরফ থেকে জমির খাজনা দেয়া হোত মুদ্রায় কিংবা ফসলে, সেগুলির উৎপাদের ১/১২ অংশ থেকে ১/৫ অংশের হিসাবে। এই সমস্ত খামার জমিজায়গার দাম ও পরিমাণ অনুযায়ী নির্দিষ্ট ছিল উত্তরাধিকার-সূত্রে অথবা রাজসরকারে কাজের পুরস্কার হিসেবে প্রাপ্ত জায়গির নামে, তবে এগুলির মধ্যে বহু খামারই ছিল মাত্র কয়েক একর করে জমির সমষ্টি। অথচ এই সমস্ত খামারের মালিকদের কিছু-পরিমাণে আইনগত নিয়ন্ত্রণের অধিকার ছিল তাদের জমিতে বসবাসকারী সাধারণ মানুষের ওপর। এই আইনগত অধিকার ছিল আবার চারটি স্তরে বিন্যস্ত। পরপীড়ক এইসব ক্ষুদে শাসকের অধীনে কৃষিজীবী জনসাধারণ যে কতখানি উৎপীড়িত হত তা সহজেই অনুমেয়। মঁতেই বলছেন, একদা ফ্রান্সে ছিল ১ লক্ষ ৬০ হাজার বিচারপতি, আর আজ সে-জায়গায় স্থানীয় নিম্ন আদালতের বিচারকরা সহ ৪ হাজার বিচার-সভাতেই দিব্যি কাজ চলে যাচ্ছে।

* 'Notions de Philosophie Naturelle'. Paris, 1838. বইটি দ্রষ্টব্য।

** আলোচ্য এই বিষয়টির ওপর স্যর জেমস স্ট্যুয়ার্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন (৪২)।

উপাদানসমূহে। জমি থেকে উৎখাত-হওয়া ও ইতস্তত ভেসে-বেড়ানো কৃষকদের অবস্থা দাঁড়াল এই যে অতঃপর তাদের নিজেদের মূল্য মজুরির আকারে তাদের নতুন প্রভু শিল্পের পুঁজিপতিদের কাছ থেকে ক্রয় করা ছাড়া উপায়ান্তর রইল না। আর যা পূর্বোক্ত জীবনধারণের উপায়াদি সম্বন্ধে প্রযোজ্য ছিল, তাই-ই প্রযোজ্য ছিল দেশের অভ্যন্তরীণ কৃষির ওপর নির্ভরশীল শিল্পে-কারখানার কাঁচামালের ক্ষেত্রেও। এই কাঁচামাল রূপান্তরিত হল 'বদ্ধ'-পুঁজির একটি উপাদানে।

যেমন, একটা উদাহরণ দেয়া যাক। ধরুন, ওয়েস্টফালিয়ার কৃষকদের একটি অংশ যারা সকলেই আগে, রাজা দ্বিতীয় ফ্রিড্রিখের আমলে, শণের সুতো কাটত তারা বলপ্রয়োগের ফলে জমি থেকে উচ্ছেদ ও গ্রাম থেকে বিতাড়িত হল, আর তাদের অপর যে-অংশটি গ্রামে রয়ে গেল তারা পরিণত হল বড় বড় খামারীর অধীন দিনমজুরে। আবার সেইসঙ্গে গজিয়ে উঠল শণ থেকে সুতো কাটার ও কাপড় বোনার বড়-বড় প্রতিষ্ঠান আর সেইসব প্রতিষ্ঠানে ওই সময়ে তথাকথিত 'ছাড়া-পাওয়া' প্রাক্তন কৃষকেরা কাজ করতে লাগল মজুরির ভিত্তিতে। শণের তন্তুর চেহারা কিন্তু এতে এতটুকুও বদলাল না। তার একটি তন্তুতেও পরিবর্তন ঘটল না বটে, তবে তার দেহে সঞ্চারিত হল নতুন এক সামাজিক সত্তা। শণ এখন হয়ে দাঁড়াল তাঁত-কারখানার মালিকের 'বদ্ধ'-পুঁজির একটা অংশ। আগে যা ছিল কিছু-সংখ্যক ছোট উৎপাদনকারীর মধ্যে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় — যে-উৎপাদনকারীরা নিজেরা শণের চাষ করত এবং নিজ-নিজ পরিবারের সাহায্যে খুচরো হারে তা থেকে সুতো কাটত — তা এখন কেন্দ্রীভূত হল এমন একজনমাত্র পুঁজিপতির হাতে যে অন্যদের নিযুক্ত করল তার হয়ে শণের সুতো কাটতে ও কাপড় বুনতে। শণের সুতো কাটায় ইতিপূর্বে যে-অতিরিক্ত শ্রম খরচ হোত তা উঠে আসত কৃষক-পরিবারগুলির অতিরিক্ত আয়ে, কিংবা রাজা দ্বিতীয় ফ্রিড্রিখের আমলে হয়তো-বা প্রাশিয়ার রাজার জন্যে দেয় অতিরিক্ত করে। কিন্তু অতঃপর সেই অতিরিক্ত পরিশ্রম উসুল হতে লাগল অল্প জনকয়েক পুঁজিপতির মুনাফা হিসেবে। সুতো কাটার তকলি ও কাপড় বোনার তাঁতযন্ত্র, আগে যা নাকি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল গোটা দেশ জুড়ে, এখন সেগুলি ভিড় জমাল অল্প কয়েকটি প্রকাণ্ড শ্রমিক-ব্যারাকে, শ্রমিক আর কাঁচামালের ভিড়ে

স্তূপীকৃত হয়ে। আর ওই তক্‌লি, তাঁতযন্ত্র আর কাঁচামাল এখন সুতো-কাটুনি আর তাঁতিদের স্বনির্ভর অস্তিত্বরক্ষার উপায়াদি থেকে রূপান্তরিত হয়ে গেল তাদেরই ওপর হুকুমজারি করার ও তাদের থেকে মজুরি-ফাঁকি-দেয়া শ্রম বা বেগার-খাটুনি শুষে নেয়ার উপায়াদিতে।* আজকের দিনের বড়-বড় কারখানা ও খামারের দিকে তাকিয়ে দেখলে মনেই হয় না যে সেগুলির উৎপত্তি হয়েছে বহু ছোট উৎপাদন-কেন্দ্রকে মিলিয়ে-মিশিয়ে এক করার ফলে এবং সেগুলি গড়ে উঠেছে বহু ছোট স্বাধীন উৎপাদনকারীকে জমি ও বাস্তুচ্যুত করে। তাসত্ত্বেও জনসাধারণের স্বজ্ঞাকে দোষারোপ করা যায় না। কেননা বিপ্লবের সিংহ বলে কথিত মিরাবো-র সময়েও বড়-বড় হস্তশিল্প-কারখানাকে বলা হোত 'একত্রীভূত কারখানা' বা মিলিয়ে-মিশিয়ে এক-করে-তোলা ওয়র্কশপ, যেমন অনেক খেত এক-করে-তোলার কথা বলে থাকি আমরা।

মিরাবো বলছেন: 'আমরা কেবলমাত্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আসছি সেই বড়-বড় কারখানার দিকে, যেখানে শ'য়ে-শ'য়ে লোক কাজ করছে একজন পরিচালকের অধীনে এবং যে-কারখানাগুলিকে সচরাচর বলা হয়ে থাকে 'একত্রীভূত হস্তশিল্প-কারখানা'। কিন্তু যেখানে আরও বেশি, বিপুল-সংখ্যক শ্রমিক কাজ করে চলেছে, প্রত্যেকে পৃথকভাবে ও নিজের উপকারার্থে, সেগুলিকে আমরা বিবেচনার মধ্যে ধরি না বললেই হয়। প্রথমোক্ত কারখানাগুলি থেকে এগুলি সীমাহীন দূরত্বের ব্যাপার। এটা কিন্তু আমাদের একটা মস্ত ভুল, কেননা এই শেষোক্ত ব্যাপারগুলিই একমাত্র জাতীয় উন্নতির সত্যিকার গুরুত্বপূর্ণ সোপান।... বড়-বড় কারখানা (বা 'একত্রীভূত কারখানা') একজন বা দু'জন নিয়োগকর্তা কারখানা-মালিককে বিস্ময়করকমে ধনী করে তুলবে, কিন্তু সেখানকার শ্রমিকরা হয়ে থাকবে কেবলমাত্র ঠিকমজুর, বেতন পাবে মোটামুটিরকম আর কারখানাটির বাড়বাড়ন্তের কোনো ভাগই পাবে না তারা। অথচ, বিপরীতপক্ষে, কোনো একটি বিযুক্ত কারখানায় (বা 'পৃথক কারখানা'য়) কেউই ধনী হয়ে উঠতে পারবে না বটে, তবে বহু শ্রমিকই

---

* পুঁজিপতি বলছে: 'আমার সেবা করার মর্যাদা আমি তোমাদের দিই এই শর্তে: এ পর্যন্ত তোমাদের সামান্য যা-কিছু আছে, তোমাদের পরিচালনার দায়িত্ব নিজের হাতে নেওয়ার জন্যে সেই সবকিছু তোমরা আমাকে দেবে।' (J. J. Rousseau, 'Discours sur l'Économie Politique'.)

আরামে থাকতে পারবে; মিতব্যয়ী ও পরিশ্রমী যে সে জমাতে পারবে সামান্য একটু মূলধন, সংসারে শিশুর জন্মের প্রয়োজনে বাঁচাতে পারবে অল্প-একটু অর্থ, সম্ভাব্য অসুখবিসুখের জন্যে, নিজেদের শখসাধ মেটাতে ও ঘর-গৃহস্থালির জিনিসপত্র কিনতে কাজে লাগাতে পারবে সেই বাড়তি অর্থ। এর ফলে সঞ্চয়ী ও পরিশ্রমী শ্রমিকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে, কেননা তারা দেখবে যে সৎ আচরণ করা ও কর্মঠ হওয়া মূলত তাদের নিজেদের অবস্থার উন্নতিবিধানেরই সহায়ক, মজুরির সেই সামান্য একটু বৃদ্ধির মাত্র সহায়ক নয় — যে-মজুরিবৃদ্ধি কোনোরকমেই ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াতে পারে না এবং যার ফলাফল হল একমাত্র মানুষকে আরও সামান্য একটু ভালোভাবে, ও তা কেবলমাত্র দৈনন্দিন ভিত্তিতেই, জীবনযাপনে সাহায্য করা।... অপরপক্ষে বড়-বড় যতসব ওয়র্কশপ, কিছু-কিছু লোকের ব্যক্তিগত প্রকল্পগুলি, নিছক মুনাফা অর্জনের জন্যে কাজ করিয়ে শ্রমিকদের প্রতিদিন মজুরি দেয় যারা, তারা ওই সমস্ত ব্যক্তিবিশেষের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে পারে বটে, তবে তারা কখনোই গভর্নমেন্টগুলির মনোযোগ আকর্ষণের যোগ্য হতে পারে না। একমাত্র বিচ্ছিন্ন ওয়র্কশপগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ছোট-ছোট জোতজমির চাষের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় স্বাধীন প্রয়াস হিসেবে গণ্য হবার যোগ্য।'*

কৃষিজীবী জনসাধারণের একটি অংশকে চাষের জমি ও বাস্তুভিটে থেকে উচ্ছেদের ফলে কেবল-যে শিল্প-পুঁজির পক্ষে অনুকূল শ্রমিককুল, তাদের জীবিকার উপায়াদি ও শ্রমের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহের স্রোত মুক্তি পেল তা-ই নয়, এর ফলে গড়ে উঠল অভ্যন্তরীণ বাজারও।

বস্তুত, যে-ঘটনাবলী ছোট-ছোট কৃষককে মজুরিনির্ভর-শ্রমিকে ও তাদের জীবিকার উপায়াদি ও শ্রমের উপায়াদি পুঁজির বৈষয়িক উপাদানে রূপান্তরিত করেছিল তা ওই একই সঙ্গে গড়ে তুলেছিল পুঁজির প্রয়োজনে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারও। ইতিপূর্বে এককেটি কৃষক-পরিবার নিজেরাই উৎপাদন করত তাদের জীবনধারণের উপায়াদি ও কৃষিজাত কাঁচামাল এবং এর

---

* মিরাবো, উদ্ধৃত রচনা, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ২০ থেকে ১০৯, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে স্থানে-স্থানে। মিরাবো যে পৃথক-পৃথক ওয়র্কশপকে 'সম্মিলিত' ওয়র্কশপগুলির চেয়ে আর্থিক দিক থেকে বেশি বিচক্ষণতার সঙ্গে পরিচালিত ও বেশি উৎপাদনক্ষম বলে মনে করেছেন এবং শেষোক্ত কারখানাগুলিকে গণ্য করেছেন গভর্নমেন্টের উৎসাহপুষ্ট নিছক কৃত্রিম ও বহিরাগত উদ্ভট ব্যাপার বলে, তার ব্যাখ্যা মেলে তৎকালীন ইউরোপ-ভূখন্ডগত অধিকাংশ হস্তশিল্প-কারখানার অবস্থা থেকে।

বেশির ভাগটাই তারা নিজেরা ভোগ করত। সেই কাঁচামাল ও জীবনধারণের উপায়াদি অতঃপর হয়ে দাঁড়াল পণ্য; বড়-বড় খামারী এখন তা বিক্রি করতে লাগল ও তার বাজার খুঁজে পেল হস্তশিল্প-কারখানাগুলিতে। সুতী ও ক্ষৌমবস্ত্র এবং মোটা পশমী কাপড়—যেগুলির কাঁচামাল আগে প্রতিটি কৃষক-পরিবারের নাগালের মধ্যে ছিল ও যা থেকে কৃষক-সমাজ সুতো কাটত ও নিজের ব্যবহার্য পোশাক-আশাক বুনে নিত—তা এখন পরিণত হল ব্যাপক হারে উৎপাদনের সামগ্রীতে আর দেশের জেলাগুলি পরিণত হল ওই পণ্যদ্রব্যের বাজারে। এর আগে পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন কারুশিল্পীরা নিজেদের ভরণপোষণের জন্যে কর্মরত দেশের চতুর্দিকে ছড়ানো-ছিটনো অসংখ্য ছোট-ছোট খরিদ্দারের মধ্যে যে-ক্রেতার সন্ধান পেত তারা এখন শিল্প-পুঁজির দৌলতে কেন্দ্রীভূত হয়ে গেল প্রকান্ড এক বাজারে।* এইভাবে স্বয়ংভর কৃষকদের জমি থেকে উচ্ছেদসাধন ও উৎপাদনের উপায়-উপকরণ থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য কুটির-শিল্পের ধ্বংসসাধন এবং হস্তশিল্পের ক্ষেত্রে শিল্পোৎপাদন ও কৃষির মধ্যে বিচ্ছেদের প্রক্রিয়াটিও চলেছিল সমান তালে। আর একমাত্র গ্রাম্য কুটির-শিল্পের এই ধ্বংসসাধনের ফলেই পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন-ব্যবস্থার পক্ষে যা প্রয়োজনীয় একটি দেশের অভ্যন্তরীণ বাজার সেই পরিমাণে ব্যাপক ও অবিচল হতে পারে।

তবু যথাযথভাবে যাকে হস্তশিল্পোৎপাদনের যুগ বলা যেতে পারে তা এই রূপান্তরসাধনের প্রক্রিয়াকে মূলগতভাবে ও সম্পূর্ণত সফল করে তুলতে সমর্থ হয় না। এ-প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে যথাযথভাবে যাকে বলা চলে

---

* 'কুড়ি পাউন্ড পশম যখন অলক্ষ্যে কোনো একটি শ্রমিক-পরিবারের অন্য কাজের ফাঁকে-ফাঁকে তার নিজস্ব পরিশ্রমের ফলে তৈরি পরিবারটির পোশাক-পরিচ্ছদে পরিণত হয় তখন সেদিকে কারও নজর থাকে না; কিন্তু ওই পরিমাণ পশম যখন বাজারে আমদানি হয়, তারপর ফ্যাক্টরিতে যায়, আর তারপর আসে দোকানদারের হাতে, তখনই এক বিপুল বাণিজ্যিক লেনদেনের কারবার শুরু হয়ে যায় আর নামমাত্র পুঁজি তার বিশগুণ মূল্যের অর্থের সঙ্গে যায় জড়িয়ে।... এইভাবে শ্রমিক শ্রেণীকে শোষিত হতে হয় ফ্যাক্টরির হতভাগা জনসমষ্টি, পরোপজীবী দোকানদার-শ্রেণী ও এক কাল্পনিক বাণিজ্যিক, মুদ্রা-সংক্রান্ত ও আর্থিক ব্যবস্থা সমর্থনের জন্যে।' (ডেভিড আর্কার্ট, উদ্ধৃত রচনা, পৃষ্ঠা ১২০।)

হস্তশিল্প-কারখানার ব্যবস্থা তা কেবলমাত্র আংশিকভাবেই জয় করে নিতে সমর্থ জাতীয় উৎপাদনের রাজ্যপাটকে এবং তা সর্বদাই চূড়ান্ত ভিত্তি হিসেবে নির্ভর করে শহরের কারুশিল্প ও গ্রামাঞ্চলের কুটির-শিল্পের সহায়তার ওপর। যদিও বা তা এই শেষোক্ত গ্রাম্য হস্তশিল্প ও শহরের কারুশিল্পকে কোনো এক ধরনে, শিল্পের কোনো এক নির্দিষ্ট শাখায় ও নির্দিষ্ট জায়গায় ধ্বংস করেও ফেলে, তবু অন্যত্র আবার এগুলির পুনরুদ্ধারে ব্রতী হয়, কেননা বিশেষ একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত কাঁচামাল প্রস্তুত করে তোলার জন্যে এগুলির প্রয়োজন হয় তার। অতএব হস্তশিল্প-ব্যবস্থা তৈরি করে ছোট-ছোট খামারীদের নতুন একটি শ্রেণী, যে-শ্রেণীর মানুষেরা চাষবাসকে আনুষঙ্গিক একটি পেশা হিসেবে গ্রহণ করলেও প্রধান জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করে থাকে শিল্পোৎপাদনের শ্রমকে, আর এই শ্রমের ফসল তারা হয় সরাসরি আর নয়তো ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে শিল্পপতি মালিকদের কাছে বিক্রি করে থাকে। বিশেষ এক ঘটনার এটি প্রধান না হলেও এমন একটি কারণ যা ইংলন্ডের ইতিহাসের ছাত্রকে প্রথম দৃষ্টিতে বিভ্রান্ত করে। পঞ্চদশ শতকের শেষ তৃতীয়াংশ থেকে কিছুকাল পর-পর মাঝে-মাঝে একেকটি বিরতির সময় বাদ দিয়ে তিনি অনবরত গ্রামাঞ্চলে পুঁজিতান্ত্রিক খামারের অনুপ্রবেশ ও কৃষককুলের ক্রমবর্ধমান বিনষ্টির ব্যাপারে নানা অভিযোগের সম্মুখীন হতে থাকেন। আবার অপরদিকে তিনি এই কৃষককুলকে ফিরে-ফিরে আবির্ভূত হতে দেখেন, তবে তা ক্রমশই কম-কম সংখ্যায় ও সর্বদাই অপেক্ষাকৃত খারাপ অবস্থায়।* এর প্রধান কারণ হল এই যে ইংলন্ড পর্যায়ক্রমে যুগে-যুগে কখনও দেখা দিয়েছে প্রধানত শস্য-উৎপাদক হিসেবে, আবার কখনও-বা প্রধানত খামারপালিত পশু-প্রজনক হিসেবে, আর এর সঙ্গে সঙ্গে কৃষিজাত উৎপাদনের মাত্রার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটেছে। একমাত্র আধুনিক শিল্পই পরিশেষে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে পুঁজিতান্ত্রিক কৃষি-ব্যবস্থার স্থায়ী ভিত্তিটি যুগিয়ে দিয়েছে, কৃষিজীবী জনসংখ্যার বিপুল এক সংখ্যাধিক অংশকে মূলগতভাবে

---

* ক্রমওয়েলের আমল ছিল একমাত্র এর ব্যতিক্রম। যতদিন এই প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল ততদিন সকল স্তরের সমগ্র বৃটিশ জনসাধারণ টিউডর-রাজবংশের আমলে যে-দুর্দশায় তারা অধঃপতিত হয়েছিল তা থেকে উন্নতির সোপান বেয়ে উঠতে সমর্থ হয়।

পুঁজি থেকে উদ্বৃত্ত সুদ নেয়ার ফলে... আর এটাও বড় কম আশ্চর্য নয় যে ইউরোপের সকল আইনপ্রণেতা কর্তৃপক্ষই চেষ্টা করেছেন এই ব্যাপারটিকে সংবিধির সাহায্যে, অর্থাৎ তেজারতি কারবারের বিরুদ্ধে প্রবর্তিত সংবিধির সাহায্যে রোধ করতে।... দেশের সকল সম্পদের ওপর পুঁজিপতির এই আধিপত্য সম্পত্তির অধিকারের ক্ষেত্রে আসলে একটা পরিবর্তন ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু প্রশ্ন এই, কোন আইন অথবা ধারাবাহিক আইনসমূহের সাহায্যে কার্যকর হল এই ব্যাপারটি?*

লেখকের অবশ্য এক্ষেত্রে মনে রাখা উচিত ছিল যে বিপ্লব কখনও আইনের বলে সমাধা হয় না।

মহাজনী কারবার ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে সৃষ্ট আর্থিক পুঁজিকে শিল্প-পুঁজিতে পরিণত করার ব্যাপারটির প্রতিরোধ করা হয় গ্রামাঞ্চলে সামন্ততান্ত্রিক সংবিধান ও শহরগুলিতে 'গিল্ড'-সংস্থাগুলির মধ্যে।** সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অবলোপ, গ্রামবাসী জনসাধারণকে জমি থেকে উচ্ছেদ ও আংশিকভাবে বাস্তুভিটে থেকে বিতাড়নের সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত বাধা-বিপত্তি অবশ্য দূর হয়ে গেল। নতুন হস্তশিল্প-কারখানাগুলি স্থায়ীভাবে জাঁকিয়ে বসল সমুদ্র-বন্দরগুলিতে, অথবা দেশের অভ্যন্তরে কিছু-কিছু জায়গায়, পুরনো পুর-সভাগুলি ও সেগুলির 'গিল্ড'এর নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এরই ফলে ইংলণ্ডে এই সমস্ত নতুন শিশু-শিল্প লালনাগারগুলির বিরুদ্ধে পুর-সভা-নিয়ন্ত্রিত শহরগুলির তীব্র, তিক্ত সংগ্রাম চলে।

আমেরিকায় সোনা ও রুপোর আবিষ্কার, সেখানকার আদি অধিবাসীদের সদলবলে উন্মূলন, দাসত্বে ও খনিগুলিতে তাদের কবরস্থ করে রাখা, ইস্ট ইণ্ডিজ-এ বিজয়-অভিযানের ও সে-অঞ্চলটি লুণ্ঠনের সূচনা, আফ্রিকাকে বাণিজ্যিক প্রয়োজনে কালো-চামড়ার মানুষের শিকারক্ষেত্রে পরিণত করা, ইত্যাদি ব্যাপার পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের কালপর্বের রক্তিমাভ নব-

---

* 'The Natural and Artificial Right of Property Contrasted', London, 1832, pp. 98, 99. বেনামা এই বইখানির লেখক হলেন টি. হজ্‌স্কিন।

** এমনকি এই সেদিন, ১৭৯৪ সালেও লীড্‌সের ছোট-ছোট বস্ত্র-বয়নকারী পার্লামেন্টে একটি প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে এইমর্মে এক দরখাস্ত পেশ করে যে ব্যবসায়ীদের বড় আকারে শিল্প-উৎপাদক হয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ করে একটি আইন প্রণয়ন করা হোক। (Dr. Aikin, 'Description of the Country from 30 to 40 miles round Manchester', London, 1795.)

প্রভাতের সূচনা ঘটাল। এই সমস্ত কাব্যিক, সুখময় ব্যাপারস্যাপারই হল আদিম সঞ্চয়ের গতিবেগের প্রধান উৎস। এরই পিছু-পিছু বেধে গেল গোটা ভূগোলকজোড়া রণক্ষেত্রে ইউরোপীয় জাতিসমূহের মধ্যে বাণিজ্যিক যুদ্ধ। এর সূচনা ঘটল স্পেন থেকে নেদারল্যান্ডসের পৃথক হওয়ার মধ্যে দিয়ে (৪৩), বিশাল বিস্তৃতি পেল এ ইংলন্ডের জ্যাকোবিন-বিরোধী যুদ্ধে (৪৪) এবং এখনও এই যুদ্ধ চলেছে চীনের বিরুদ্ধে অহিফেন-যুদ্ধগুলির মধ্যে দিয়ে (৪৫), ইত্যাদি।

আদিম সঞ্চয়ের গতিবেগের বিভিন্ন চিহ্ন এখন কমবেশি কালানুক্রমিক পর্যায়ে দৃশ্যমান সর্বত্র—বিশেষ করে স্পেন, পোর্তুগাল, হল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইংলন্ডে। ইংলন্ডে সপ্তদশ শতকের শেষে তা রূপ নিয়েছে একটি সুসংবদ্ধ সম্মিলনের, যেমন তার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে উপনিবেশগুলি, জাতীয় ঋণসম্ভার, কর ধার্য করার এক আধুনিক পদ্ধতি ও জাতীয় বাণিজ্য সংরক্ষণ-ব্যবস্থা। এই ব্যাপারগুলি অংশত নিষ্ঠুর বলপ্রয়োগের ওপর নির্ভরশীল, যেমন ধরুন, ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ওপর। তবে এই সবকটি ব্যাপারই সমাজের কেন্দ্রীভূত ও সংগঠিত শক্তিকে, অর্থাৎ রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে, নিয়োগ করে থাকে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতিকে পুঁজিতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়াটিকে 'হটহাউস'এ চাষের পদ্ধতিতে দ্রুততর ও এই উত্তরণের কালকে হ্রস্বতর করে তোলার উদ্দেশ্যে। নতুন সমাজের গর্ভধারিণী প্রতিটি পুরনো সমাজের ধাত্রী হল বলপ্রয়োগ। বলপ্রয়োগ নিজেই এক অর্থনৈতিক শক্তির দ্যোতক।

খ্রীস্টিয়ান ধর্মের ব্যাপারে বিশেষ চর্চার দাবিদার ডব্লু. হাউইট খ্রীস্টিয়ানদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য-প্রসঙ্গে বলছেন:

> তথাকথিত খ্রীস্টিয়ানকুল বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চল জুড়ে এবং যে-জাতিকে তারা পদানত করতে সমর্থ হয়েছে তাদের ওপর যে-বর্বর আচরণ ও বেপরোয়া দৌরাত্ম্য চালিয়েছে তার তুলনা মেলে না পৃথিবীতে অপর কোনো যুগের অপর কোনো মানবকুলের বর্বরতা ও দৌরাত্ম্যে, তা সে বর্বরতা যতই হিংস্র, যতই স্বতঃস্ফূর্ত এবং দয়ামায়া ও লাজলজ্জা সম্পর্কে যতই বেপরোয়া হোক-না কেন।*

* William Howitt, 'Colonization and Christianity. A Popular History of the Treatment of the Natives by the Europeans in all their

হল্যান্ডের ঔপনিবেশিক শাসনের ইতিহাস (প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে সপ্তদশ শতকে হল্যান্ডই ছিল পুঁজিবাদী দেশগুলির মাথা)—'হল বিশ্বাসঘাতকতা, উৎকোচ-প্রদান, গণহত্যা ও নীচতার সবচেয়ে অবিশ্বাস্য পারস্পরিক সম্পর্কের একটি নিদর্শন।'* জাভা দ্বীপের জন্যে ক্রীতদাস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে হল্যান্ডের ঔপনিবেশিক শাসকদের মানুষচুরির ব্যবস্থার চেয়ে এ-ব্যাপারে বেশি বৈশিষ্ট্যসূচক আর কিছু হতে পারে না। মানুষ-চোরদের এ-উদ্দেশ্যে বিশেষরকম প্রশিক্ষণ দেয়া হোত; এই ব্যবসায়ে চোর, দোভাষী আর বিক্রেতা ছিল প্রধান-প্রধান পক্ষ, স্থানীয় ছোট-ছোট রাজা ছিল এ-ব্যাপারে প্রধান মানুষবিক্রেতা। তরুণ ছেলেদের চুরি করার পর সেলিবিস দ্বীপে তাদের মাটির নিচের অন্ধকার ও গোপন কয়েদখানায় আটক রাখা হোত, ক্রীতদাসবাহিত জাহাজগুলিতে পাঠানোর জন্যে যতদিন-না তৈরি হোত তারা। এ-সম্পর্কে একটি সরকারি রিপোর্টে বলা হয়েছে:

'যেমন, উদাহরণস্বরূপ, মাকাসারের মতো এই একটি শহরই গোপন কয়েদখানায় পূর্ণ আর সেগুলির একটির চেয়ে অপরটি আবার আরও বীভৎস, ভয়ঙ্কর; তার পরিবারবর্গের কাছ থেকে সবলে বিচ্ছিন্ন-করা, লোভ ও অত্যাচারের শিকার শৃঙ্খলবদ্ধ হতভাগ্যদের দিয়ে সেই কয়েদখানাগুলি ঠাসা।'

মালাক্কা-দ্বীপ দখলের উদ্দেশ্যে ওলন্দাজরা সেখানকার পোর্তুগিজ শাসককে ঘুসের লোভ দেখায়। ফলে ১৬৪১ সালে ওই শাসক তাদের শহর-প্রবেশের অনুমতি দেয়। কিন্তু শহরে ঢুকেই ওলন্দাজরা দ্রুত ওই শাসকের আবাসস্থলে উপস্থিত হয়ে তাকে হত্যা করে, শাসকের বিশ্বাসঘাতকতার মূল্যস্বরূপ ২১,৮৭৫ পাউন্ড তাকে দেয়া থেকে 'বিরত' থাকার উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা নেয়া হয়। এইভাবে ওলন্দাজরা যেখানেই পা দিয়েছে সেখানেই

Colonies'. London, 1838, p. 9. ক্রীতদাসদের প্রতি আচরণ সম্বন্ধে তথ্যের ভালো একটি সংগ্রহ পাওয়া যাবে: Charles Comte. 'Traité de Législation', 3ème éd. Bruxelles. 1837. এই বই প্রত্যেকের খুঁটিয়ে পড়া দরকার এটা বোঝার জন্যে যে বুর্জোয়া শ্রেণী যেখানেই পেরেছে সেখানেই পৃথিবীর ছাঁচ নিজের চরিত্রানুগ করে ঢেলে সাজার জন্যে বাধাবন্ধহীন ভাবে নিজেকে ও শ্রমিককে নিয়ে কী কান্ডটাই-না করেছে।

* Thomas Stamford Raffles, late Lieut. Gov. of that island. 'The History of Java'. London, 1817 [v. II, p. CXC-CXCI, পরিশিষ্ট]।

পেছনে রেখে গেছে সর্বব্যাপী ধ্বংসস্তূপ ও জনহীন শূন্যতা। জাভার একটি প্রদেশ বাঞ্জুওয়াঙ্গিতে ১৭৫০ সালে জনসংখ্যা ছিল ৮০ হাজারেরও বেশি আর ১৮১১ সালে সেখানে জনসংখ্যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছিল মাত্র ৮ হাজারে। মধুর বাণিজ্যের এই হল ফল!

একথা সুবিদিত যে ব্রিটিশ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কম্পানি (৯৬) ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করা ছাড়াও সেখানকার চায়ের ব্যবসাতেও নিরঙ্কুশ একচেটিয়া অধিকার কায়েম করেছিল। সেইসঙ্গে হস্তগত করেছিল তারা সাধারণভাবে চীনের বাণিজ্য এবং ইউরোপ ও প্রাচ্য দেশগুলির মধ্যে পণ্যদ্রব্যের আমদানি-রপ্তানির ব্যবসাও। তবে ভারতের সমুদ্রোপকূলবর্তী ও দ্বীপগুলির মধ্যেকার বাণিজ্য এবং সেইসঙ্গে সেদেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যও ওই কম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারিদের একচেটিয়া অধিকারে ছিল। লবণ, আফিম, পান ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের একচেটিয়া ব্যবসা ছিল ঐশ্বর্যের অফুরন্ত খনি। উপরোক্ত কম্পানির কর্মচারিরা এই সমস্ত পণ্যদ্রব্যের দর বেঁধে দিত নিজেরাই এবং খুশিমতো হতভাগ্য ভারতীয়দের পণ্যদ্রব্যাদি লুটে নিত। এই বে-সরকারি জুয়াচুরির কারবারে অংশীদার ছিলেন ইংরেজ গভর্নর-জেনারেল স্বয়ং। তাঁর প্রিয়পাত্ররা এমন সব শর্তে ব্যবসায়ের ঠিকাদারি পেত, যার ফলে অপরসায়নবিদদের চেয়েও ধূর্ত তারা ধূলিমুঠিকে সোনামুঠি বানিয়ে নিত। ফলে ব্যাঙের ছাতার মতো রাতারাতি গজিয়ে উঠল বহু লোকের ঐশ্বর্যের পাহাড়; দাদন বাবদ এক শিলিং খরচা ছাড়াই আদিম সঞ্চয় পুঞ্জীভূত হতে লাগল। ওয়ারেন হেস্টিংসের বিচারের মামলায় উদ্ঘাটিত হল এমনই সব ঘটনার ছড়াছড়ি। যেমন, একটা উদাহরণ দেয়া যাক। আফিম-চাষের অঞ্চল থেকে বহু দূরবর্তী ভারতের একটি এলাকায় সরকারি কাজ উপলক্ষে যাত্রার প্রাক্কালে সালিভান নামে জনেক ব্যক্তিকে আফিম-ক্রয়ের একখানি চুক্তিপত্র দেয়া হয়। সালিভান ৪০ হাজার পাউণ্ডের বিনিময়ে ওই চুক্তিপত্রখানি বিক্রি করে বিন নামে অপর এক ব্যক্তিকে; বিন আবার ওইদিনই সেখানি বিক্রি করে ৬০ হাজার পাউণ্ডের বিনিময়ে, আর শেষপর্যন্ত যে-ব্যক্তি ওই চুক্তিপত্রটি কেনে ও চুক্তিমতো কাজটি নিষ্পন্ন করে সে জানায় যে সবকিছু খরচখরচা বাদ দিয়েও সে প্রচুর লাভ করেছে। ওই সময়ে পার্লামেন্টের সামনে পেশ-করা একখানি দলিল থেকে দেখা যায়

যে ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৬ সালের মধ্যে ইস্ট-ইন্ডিয়া কম্পানি ও তার কর্মচারিরা মোট ৬০ লক্ষ পাউন্ড উপহার হিসেবে পেয়েছে ভারতীয়দের কাছ থেকে। ১৭৬৯-১৭৭০ সালের মধ্যে ইংরেজরা ভারতে উৎপন্ন সব চাল কিনে নিয়ে ও অসম্ভব চড়া দামে ছাড়া তা বিক্রি করতে গররাজি হয়ে সেদেশে কৃত্রিমভাবে তৈরি করে সাংঘাতিক এক দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি (ভারতে এই দুর্ভিক্ষ ভারতীয় সন ১১৭৬'এর অথবা সাধারণভাবে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে কুখ্যাত। — অনু.)।*

ওয়েস্ট ইন্ডিজ (বা উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের মধ্যে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জ। — অনু.)-এর মতো শুধুমাত্র রপ্তানি বাণিজ্যের জন্যে নির্ধারিত আবাদী বাগানের উপনিবেশগুলির এবং মেক্সিকো ও ইস্ট ইন্ডিজের মতো লুটপাটের লীলাক্ষেত্র সমৃদ্ধ ও জনবহুল দেশগুলির আদি বাসিন্দাদের প্রতি ব্যবহার ছিল স্বভাবতই অমানুষিক ও ভয়াবহ। তবে যথাযথভাবে যাদের বলা চলত উপনিবেশই, এমনকি সে-সব জায়গাতেও আদিম সঞ্চয়ের খ্রীস্টিয়ান চরিত্র আত্মপ্রকাশে পরাঙ্মুখ হয় নি। ১৭০৩ সালে প্রোটেস্টান্ট-ধর্মের নীতিবাগীশ ধ্বজাধারী নিউ ইংলন্ড অঞ্চলের 'পিউরিটান'রা তাদের আইনসভার নানা ডিক্রি অনুযায়ী প্রতিটি রেড ইন্ডিয়ানের মুণ্ড ও প্রতিটি বন্দী লাল চামড়ার লোকের জন্যে ৪০ পাউন্ড করে পুরস্কার বরাদ্দ করে। ১৭২০ সালে ওই মুন্ডপিছু পুরস্কারের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০০ পাউন্ড করে। ম্যাসাচুসেট্স-উপসাগরের ঘটনার পরে রেড ইন্ডিয়ানদের একটি বিশেষ উপজাতি-গোষ্ঠীকে বিদ্রোহী বলে ঘোষণা করা হয় এইমর্মে: যথা, ১২ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের পুরুষের মুন্ডপিছু ১০০ পাউন্ড (নতুন মুদ্রায়), পুরুষ বন্দীপিছু ১০৫ পাউন্ড, স্ত্রীলোক ও শিশু বন্দীপিছু ৫৫ পাউন্ড এবং স্ত্রীলোক ও শিশুর মুন্ডপিছু ৫০ পাউন্ড। আবার এর কয়েক দশক পরে ধর্মপ্রাণ 'পিউরিটান' এই নতুন বসতি-স্থাপনকারীদের সন্তানসন্ততিরা ইতিমধ্যে রাজদ্রোহী হয়ে ওঠায় ব্রিটিশ

* ১৮৬৬ সালে শুধুমাত্র ওড়িষা প্রদেশেই ১০ লক্ষেরও বেশি ভারতীয় মারা যায় অনাহারে। তৎসত্ত্বেও বুভুক্ষু জনসাধারণের কাছে জীবনধারণের উপযোগী প্রাথমিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যে-দামে বিক্রি করা হয় তা দিয়ে ভারতীয় রাজকোষ পূর্ণ করে তোলার চেষ্টা চলে।

ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা তাদের ওপর প্রতিশোধ নিতেও ভোলে না। ইংরেজদের উস্কানিতে আর টাকা খেয়ে লাল চামড়ার লোকেরা এবার ওই বসতকারীদেরই রেড ইন্ডিয়ান যুদ্ধ-কুঠারের ঘায়ে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এই মানুষ-মৃগয়া আর মুন্ডশিকারকে ঘোষণা করে 'ঈশ্বর ও প্রকৃতিদত্ত পড়ে-পাওয়া সুযোগসুবিধা' বলে।

ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা 'হটহাউস'-এর কৃষি-ব্যবস্থার মতো পাকিয়ে তুলল বাণিজ্য আর নৌ-চলাচলকে। পুঁজির কেন্দ্রীভবনের কাজে শক্তিশালী চালক-শক্তি ছিল লুথারের 'একচেটিয়া বণিক-সমিতি'গুলি। উঠতি হস্তশিল্পগুলির জন্যে উপনিবেশসমূহ বিক্রির বাজার নিশ্চিত করে তুলল এবং এইসব বাজারের ওপর একচেটিয়া কর্তৃত্ব নিশ্চিত করল ক্রমবর্ধমান সঞ্চয়কে। অপ্রচ্ছন্ন লুটপাট, দাসত্ব আরোপ ও খুনখারাপির ফলে যে-ঐশ্বর্য ইউরোপের বাইরে হস্তগত হল তা চালান হয়ে এল ইউরোপের নানা দেশে আর পরিণত হল পুঁজিতে। হল্যান্ডই প্রথম তার ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাকে পূর্ণবিকশিত করে তোলে এবং ১৬৪৮ সালের মধ্যেই দেশটি তার বাণিজ্যিক গৌরবের চূড়া স্পর্শ করে।

'দেশটি ছিল ইস্ট ইন্ডিয়ার বাণিজ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের মধ্যেকার ব্যাপক ব্যবসায়ের প্রায় একচেটিয়া অধিকারী। সে-দেশের মাছের কারবার, জাহাজ চলাচল ও হস্তশিল্প-কারখানাগুলি সংখ্যায় ও উৎকর্ষে ছাড়িয়ে গিয়েছিল অপর সকল দেশকেই। প্রজাতন্ত্রটির মোট পুঁজির পরিমাণ সম্ভবত ইউরোপের বাকি সকল দেশের মিলিত পুঁজির চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল' (৪৭)।

তবে গুলিখ এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন যে ১৬৪৮ সাল নাগাদ হল্যান্ডের জনসাধারণ বাকি ইউরোপের মিলিত জনসাধারণের চেয়েও ছিল অত্যধিক খাটুনিতে বেশি জর্জরিত, বেশি দরিদ্র ও অধিক নিষ্ঠুরভাবে উৎপীড়িত।

আজকের দিনে শিল্পগত প্রাধান্যই বাণিজ্যগত প্রাধান্যের পরিচায়ক। কিন্তু যথাযথ হস্তশিল্প-কারখানার যুগে ব্যাপারটির ছিল উলটো, তখন বাণিজ্যিক প্রাধান্য শিল্পের ক্ষেত্রে প্রাধান্য অর্জনের সহায়ক ছিল। এ-কারণেই সে-সময়ে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা পালন করেছে অমন এক প্রভাবশালী ভূমিকা।

এই ব্যবস্থা ছিল সেই 'অভিনব দেবতা' যে ইউরোপের প্রাচীন দেবতাদের সঙ্গে পূজাবেদীতে গালে গাল ঠেকিয়ে বসে ছিল, আর তারপর এক শুভদিনে এক ধাক্কায়, একটি লাথির ঘায়ে সে বাকি সবাইকে নিক্ষেপ করেছিল আবর্জনাস্তূপে। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাই উদ্বৃত্ত মূল্যকে করে তুলল মানবসমাজের অর্জনীয় একটিমাত্র ও পরম লক্ষ্য ও পরিণতির দিগন্ত।

সেই সুদূর মধ্যযুগে জেনোয়া ও ভেনিসে যার উৎপত্তির উৎসের সন্ধান পাই আমরা সেই সামাজিক ক্রেডিট বা রাষ্ট্রীয় ঋণ-সংগ্রহ ব্যবস্থা ব্যাপক হারে হস্তশিল্প-কারখানাগুলির যুগে সাধারণভাবে ইউরোপের প্রধান ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়াল। সমুদ্রপথের বাণিজ্য ও বাণিজ্যিক যুদ্ধাদি সহ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়াল এই প্রথাকে দ্রুত পাকিয়ে তোলার ক্ষেত্রস্বরূপ। এইভাবে এই প্রথা প্রথম শিকড় গাড়ল হল্যান্ডে। রাষ্ট্রীয় ঋণগ্রহণ, অর্থাৎ স্বৈরশাসিত, সংবিধানসম্মত অথবা প্রজাতন্ত্রী যে-ধরনের রাষ্ট্রই হোক-না কেন তার বিচ্ছিন্নতা, পুঁজিতান্ত্রিক যুগের ওপর নিজস্ব মোহরছাপ অঙ্কিত করে দিল। তথাকথিত জাতীয় সম্পদের একমাত্র যে-অংশ সত্যিসত্যিই আধুনিক জাতিসমূহের যৌথ মালিকানার অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে তা হল তাদের এই রাষ্ট্রীয় ঋণ-সংগ্রহ।* এর ফলেই, এর প্রয়োজনীয় ফলাফল হিসেবেই, এই আধুনিক তত্ত্বটির উদ্ভব ঘটেছে যে কোনো জাতি যত গভীরভাবে ঋণে ডুবে থাকে ততই সে ধনী হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রীয় ক্রেডিট এইভাবে হয়ে দাঁড়িয়েছে পুঁজির 'ধর্মবিশ্বাস' স্বরূপ। আর এই রাষ্ট্রীয় ঋণ-সংগ্রহের মাত্রাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ঋণ-সংগ্রহ সম্পর্কে আস্থার অভাব ক্রমশ স্থান নিয়েছে আগেকার কালের সেই ঈশ্বরনিন্দার সমতুল্য হয়ে আর তা প্রায়শই ক্ষমার অযোগ্য বলে গণ্য হচ্ছে।

রাষ্ট্রীয় ঋণ-সংগ্রহ হয়ে দাঁড়িয়েছিল আদিম সঞ্চয়ের ব্যাপারে সবচেয়ে শক্তিশালী অন্যতম চালক-শক্তি। কেননা ঐন্দ্রজালিকের যাদুদণ্ডের একবারমাত্র আস্ফালনে তা অনুৎপাদী অর্থকে ডিম পাড়ার ক্ষমতা দিয়ে তাকে পরিণত করল পুঁজিতে, নিজেকে শিল্পে অথবা এমনকি তেজারতি কারবারে নিযুক্ত

---

* উইলিয়ম কবেট মন্তব্য করেছেন যে ইংলন্ডে সকল জনপ্রতিষ্ঠানই 'রাজকীয়' বিশেষণে ভূষিত; তবে এর ক্ষতিপূরণস্বরূপ 'রাষ্ট্রীয়' ঋণ-সংগ্রহের ব্যাপারটি অবশ্য রয়ে গেছে।

করার সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্কে বাঁধা কষ্টটুকু ও ঝুঁকিটুকুও নেয়ার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার না-করেই। রাষ্ট্রের ঋণদাতারা আসলে কিছুই দিয়ে দেয় না, কেননা যে-অর্থ তারা ঋণ হিসেবে দেয় তা রূপান্তরিত হয় সহজে বিনিময়যোগ্য রাষ্ট্রীয় মুচলেকা পত্রে এবং সেগুলি তাদের হাতে নগদ মুদ্রার মতোই কার্যকর থেকে যায়। কিন্তু এইভাবে একশ্রেণীর অলস বার্ষিক বৃত্তিপ্রাপক তৈরি করা ও পুঁজি-বিনিয়োগকারীদের বা গভর্নমেন্ট ও জাতির মধ্যবর্তী দালালদের হাতের কাছে তৈরি সম্পদের যোগান দেয়া ছাড়াও, এবং সেইসঙ্গে প্রতিটি রাষ্ট্রীয় ঋণের একটা মোটা অংশ আকাশ-থেকে-পড়া পুঁজি হিসেবে যাদের সেবায় লাগে সেই ইজারাদার খামারী, ব্যবসায়ী ও ব্যক্তিগত শিল্পোৎপাদকদের বাদ দিয়েও, রাষ্ট্রীয় ঋণগ্রহণ-ব্যবস্থা জন্ম দিয়েছে নানা জয়েন্ট-স্টক কম্পানির, বহুবিচিত্র ধরনের বিনিময়যোগ্য ফলাফলযুক্ত কাজ-কারবারের এবং স্টক-এক্সচেঞ্জ কারবারের — অর্থাৎ এক কথায়, স্টক-এক্সচেঞ্জের জুয়াখেলার ও আধুনিক ব্যাঙ্ক-মালিক চক্রের।

জাতীয় নানা খেতাবে ভূষিত বড়-বড় ব্যাঙ্ক তাদের জন্মলগ্নে ছিল ব্যক্তিগত ফাটকাবাজদের সংঘমাত্র। এই সংঘগুলি অবস্থান করত গভর্নমেন্টগুলির পাশাপাশি এবং নানারকম সুযোগসুবিধে পাওয়ার দৌলতে রাষ্ট্রকে অর্থ ঋণ দেয়ার অবস্থায় ছিল তারা। ফলত, রাষ্ট্রীয় ঋণের ক্রমাগত সঞ্চয়বৃদ্ধির অব্যর্থ পরিমাপ ওই সমস্ত ব্যাঙ্কের শেয়ারের ক্রমান্বয় বংশবৃদ্ধি ছাড়া অন্য কিছু নয়। ওই সমস্ত ব্যাঙ্কের পূর্ণবিকাশ ঘটেছে ১৬৯৪ সালে ব্যাঙ্ক-অব-ইংলন্ডের প্রতিষ্ঠা থেকে। প্রতিষ্ঠার পর ব্যাঙ্ক-অব-ইংলন্ড গভর্নমেন্টকে নিজস্ব অর্থ ঋণ দিতে শুরু করল ৮ শতাংশ সুদের হারে, সেইসঙ্গে পার্লামেন্টের কাছ থেকে তা ক্ষমতা পেল ওই একই পুঁজি ব্যাঙ্কনোটের আকারে জনসাধারণকে ফের ঋণ হিসেবে দিয়ে তা থেকে দু'পয়সা কামাতে। ব্যাঙ্কটিকে অধিকার দেয়া হল হুণ্ডি থেকে বাট্টার অংশ কেটে নেয়া, বিভিন্ন পণ্য ক্রয়বাবদ অগ্রিম দেয়া এবং সোনা-রুপো ইত্যাদি মূল্যবান ধাতু কেনার কাজে ওই ব্যাঙ্কনোটগুলি ব্যবহার করার। এর অল্পদিনের মধ্যেই দেখা গেল যে ব্যাঙ্কের নিজের কর্জকরা এই অর্থ রাষ্ট্রকে দেয় ব্যাঙ্ক-অব-ইংলন্ডের ঋণদানের অর্থ হয়ে দাঁড়াল এবং রাষ্ট্রের তরফে তা রাষ্ট্রীয় ঋণের সুদবাবদ পরিশোধ করা হতে লাগল। এক হাতে যা দিতে

লাগল ব্যাঙ্ক কেবল-যে অন্য হাতে তার চেয়ে বেশি ফিরিয়ে নিতে লাগল এটাও যথেষ্ট বলে বিবেচিত হল না, এমনকি অর্থ ফেরত পেয়ে চলা সত্ত্বেও আগাম-বাবদ-দেয়া শেষ শিলিংটি ফেরত পাওয়া পর্যন্ত ব্যাঙ্ক রয়ে গেল জাতির চিরস্থায়ী উত্তমর্ণ হিসেবে। ক্রমশ অবশ্যম্ভাবীরূপে ব্যাঙ্ক হয়ে দাঁড়াল দেশের মূল্যবান ধাতুর সমগ্র সঞ্চয়ের আধার এবং সকল বাণিজ্যিক ব্যাপারে ঋণদানের ভরকেন্দ্র। অকস্মাৎ এই ব্যাঙ্ক-মালিকচক্র, পুঁজিলগ্নীকারী, বাণিজ্যে বা সরকারি লগ্নীপত্রে অর্থ-বিনিয়োগকারী, দালাল, শেয়ার-বাজারের দালাল, ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর উদ্ভব এদের সমকালীনদের মনে কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তা জানা যায় ওই সময়কার নানা রচনা, যেমন বোলিংব্রোকের রচনা থেকে।*

রাষ্ট্রীয় ঋণগ্রহণ-ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক ঋণদান-ব্যবস্থারও উদ্ভব ঘটল। অমুক বা তমুক জাতির আদিম সঞ্চয়ের একটি উৎসকে প্রায়শই আড়াল করে রেখেছে এই ব্যবস্থাটি। ভেনিসীয় চৌর্যবৃত্তির প্রথার শয়তানি হল্যান্ডের পুঁজি-সম্পর্কিত ঐশ্বর্যের গোপন ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কেননা ভেনিস তার অবক্ষয়ের যুগে মোটা-মোটা অর্থ ঋণ দিয়েছিল হল্যান্ডকে। হল্যান্ড ও ইংলন্ডের মধ্যেও ব্যাপারটা ঘটেছিল একই রকম। অষ্টাদশ শতকের সূচনা নাগাদ হল্যান্ডের হস্তশিল্প-কারখানাভিত্তিক উৎপাদন বহু পরিমাণে পেছনে পড়ে গিয়েছিল। প্রধানত বাণিজ্য ও শিল্পভিত্তিক জাতির ভূমিকা হল্যান্ডের তখন আর ছিল না। এ-কারণে ১৭০১ থেকে ১৭৭৬ সাল পর্যন্ত হল্যান্ডের ব্যবসায়ের অন্যতম প্রধান একটি ধারা হয়ে দাঁড়িয়েছিল বিপুল পরিমাণ পুঁজি বিদেশকে, বিশেষ করে সে-দেশের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ইংলন্ডকে, ঋণ হিসেবে দেয়া। এই একই ব্যাপার বর্তমানে চলেছে ইংলন্ড ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে। আজকের দিনে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যে-বিপুল পরিমাণ পুঁজি উৎপত্তির পরিচয়-পত্র ছাড়াই দেখা দিচ্ছে তা গতকাল ছিল ইংলন্ডে, পুঁজিতে পরিণত শিশুদের রক্ত হিসেবে।

জনসাধারণের কাছ থেকে আদায়ী রাজস্ব রাষ্ট্রীয় ঋণবাবদ দেয়

---

* 'যদি আমাদের কালে ইউরোপ তাতারে পরিপূর্ণ হোত তাহলে আমাদের মধ্যে পুঁজিলগ্নীকারীর তাৎপর্য কী তা তাদের বোঝানো হয়ে দাঁড়াত খুবই কঠিন।' (Montesquieu, 'Esprit des loix', éd. Londres, 1769, t. IV, p. 33.)

বাৎসরিক সুদ ইত্যাদি পুষিয়ে দিতে বাধ্য থাকার ফলে রাষ্ট্রীয় ঋণ যেমন তার নির্ভর খুঁজে পেল জন রাজস্বের মধ্যে, তেমনই আধুনিক কর-নির্ধারণ ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়াল রাষ্ট্রীয় ঋণগ্রহণ-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় পূরকস্বরূপ। এই সমস্ত সরকারি ঋণগ্রহণের ফলে করদাতারা সঙ্গে সঙ্গে তা টের না-পেলেও গভর্নমেণ্ট তার অতিরিক্ত নানা খরচখরচা মেটাতে পারছে বটে, তবে এর ফলেই আবার প্রয়োজন হয়ে পড়ছে কর বৃদ্ধি করার। অন্যদিকে আবার একটার-পর-একটা নতুন-নতুন ঋণের বোঝা ঘাড়ে চেপে যাওয়ায় গভর্নমেণ্ট যেমন কর বৃদ্ধি করে চলেছে, তেমনই নতুন-নতুন অতিরিক্ত খরচখরচা মেটানোর জন্যে গভর্নমেণ্ট সর্বদাই নতুন-নতুন ঋণ গ্রহণ করতেও বাধ্য হচ্ছে। জীবনধারণের পক্ষে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ওপর কর-নির্ধারণ (ফলে ওই সকল দ্রব্যের দরবৃদ্ধি) যে রাজস্ব-সংক্রান্ত আধুনিক নীতির অক্ষদন্ড, তার মধ্যেই এইভাবে স্বয়ংক্রিয় ক্রমবৃদ্ধির বীজ নিহিত থাকে। অতিরিক্ত করভার-বৃদ্ধি তাই বিশেষ কোনো ঘটনা নয়, বরং তা একটি নীতিই বলা চলে। তাই দেখা যায় হল্যান্ডে, যেখানে এই ব্যবস্থার প্রথম সূত্রপাত ঘটেছিল, সেখানে মহান দেশপ্রেমিক ডে উইট তাঁর 'সুভাষিতাবলী'তে (৪৮) মজুরিনির্ভর-শ্রমিকদের বশ্যবাধ্য, মিতব্যয়ী, পরিশ্রমী ও শ্রমভারে অতিরিক্ত জর্জরিত করে রাখার পক্ষে এটি সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা বলে উল্লেখ করে এর গুণগানে মুখর হচ্ছেন। মজুরিনির্ভর-শ্রমিকদের অবস্থার ওপর এই ব্যবস্থার ধ্বংসাত্মক প্রভাব নিয়ে এখানে অবশ্য আমরা ততটা মাথা ঘামাচ্ছি না, যতটা বিবেচনা করতে চাইছি এর ফলে সংঘটিত কৃষক, কারুশিল্পী এবং এক কথায় পেটি বুর্জোয়ার সকল স্তরের মানুষের বলপ্রয়োগে উচ্ছেদ নিয়ে। এ-ব্যাপারে এমনকি বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রীদের মধ্যেও দ্বিমত দেখা যায় না। উচ্ছেদের ব্যাপারে এর ফলপ্রসূতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে এ-ব্যবস্থার অচ্ছেদ্য অঙ্গের একটি সংরক্ষণ-ব্যবস্থার দৌলতে।

রাষ্ট্রীয় ঋণ-সংগ্রহ ও তার সঙ্গে সুসমঞ্জস রাজস্ব-সংগ্রহ ব্যবস্থা সম্পদের পুঁজিতে পরিণতকরণ ও জনসাধারণের উচ্ছেদের ক্ষেত্রে বড় একটি ভূমিকা পালন করায় কবেট, ডাব্‌ল্‌ডে ও অন্যান্য বহু লেখক ভ্রান্তিবশত রাষ্ট্রীয় ঋণ-সংগ্রহ ও রাজস্ব-সংগ্রহ ব্যবস্থার মধ্যেই আধুনিক জাতিসমূহের দুঃখদুর্দশার মৌল কারণের সন্ধান করে ফিরেছেন।

শিল্পোৎপাদনকারীদের উৎপাদন, স্বাধীন শ্রমিকদের নিঃস্বকরণ, জাতীয় উৎপাদনের ও জীবনধারণের উপায়-উপকরণকে পুঁজিতে পরিণতকরণ এবং মধ্যযুগ থেকে আধুনিক উৎপাদন-পদ্ধতিতে উত্তরণকে বলপ্রয়োগে সংক্ষিপ্তকরণের ব্যাপারে সংরক্ষণ-ব্যবস্থা ছিল একটি কৃত্রিম উপায়। এই আবিষ্কারটির একচেটিয়া অধিকারভোগের জন্যে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি একে অপরকে ছিঁড়ে টুকরোটুকরো করে দেয়, এবং উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎপাদকদের সেবায় একবার নিযুক্ত হবার পর এই উদ্দেশ্যসাধনে কেবল-যে তারা পরোক্ষভাবে সংরক্ষণমূলক শুল্কাদি কায়েম করে ও প্রত্যক্ষভাবে রপ্তানি-বাণিজ্যে বিশেষ সুযোগসুবিধাদি দিয়ে তাদের নিজ-নিজ জাতিকেই এর অধীন করল তা-ই নয়, বলপ্রয়োগে তাদের অধীনস্থ দেশগুলির সকল শিল্পকেই নির্মূল করল তারা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আয়র্ল্যান্ডের পশমী বস্ত্রশিল্পকে ঠিক এইভাবেই নির্মূল করেছিল ইংলন্ড। ইউরোপ মহাদেশে কলবেরের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী এই প্রক্রিয়াটিকে অনেক সরল করে তোলা হয়েছিল। এখানে আদিম শিল্প-পুঁজির আংশিক যোগান পাওয়া গিয়েছিল সরাসরি রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকেই।

মিরাবো সচিৎকার বলছেন, 'আরে, সাত-বর্ষব্যাপী যুদ্ধের আগে (৪৯) স্যাক্সনির হস্তশিল্প-কারখানা-ব্যবস্থার মাহাত্ম্যের কারণ খুঁজতে অতদূরে যাওয়ার দরকার কী? রাজাদের গৃহীত ১৮ কোটি-সংখ্যক ঋণের দিকে একবার তাকালেই তো হয়!'*

ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় ঋণ, রাজকরের গুরুভার, সংরক্ষণ-ব্যবস্থা, বাণিজ্যিক যুদ্ধ, ইত্যাদি সত্যিকার হস্তশিল্প-কারখানার উৎপাদনের যুগের এই সমস্ত ফলাফল বিরাট আকার ধারণ করে আধুনিক শিল্পের শৈশবাবস্থাতেই। শেষোক্ত ওই ব্যাপারটির জন্ম সূচিত হয় শিশুদের এক বিপুল নিধনযজ্ঞের মধ্যে দিয়ে। রাজকীয় নৌ-বহরের মতোই ফ্যাক্টরিগুলির জন্যেও তখন কর্মী-সংগ্রহ করা হয় আড়কাঠিবাহিনীর সাহায্যে। পঞ্চদশ শতকের শেষ তৃতীয়াংশ থেকে তাঁর নিজের কাল, অষ্টাদশ শতকের শেষপর্যন্ত, জমি থেকে কৃষিজীবী জনসাধারণের উচ্ছেদের ভয়াবহতা সম্বন্ধে স্যর এফ. এম. ইডেন যেমন নির্বিকার, যতখানি আত্মসন্তুষ্টি নিয়ে তিনি

---

* মিরাবো, উদ্ধৃত রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০১।

খুশি হয়ে বলতে পারেন যে ওই প্রক্রিয়াটি পুঁজিতান্ত্রিক কৃষি-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা এবং 'আবাদী জমি ও গোচারণ-ক্ষেত্রের মধ্যে যথাযথ অনুপাত' সৃষ্টির ব্যাপারে 'অপরিহার্য' একটি প্রক্রিয়া; ততখানি অর্থনৈতিক অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় তিনি অবশ্য দিতে পারেন নি হস্তশিল্প-কারখানাভিত্তিক উৎপাদন-ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শোষণকে ফ্যাক্টরি-সংশ্লিষ্ট শোষণে রূপান্তরের উদ্দেশ্যে এবং পুঁজি ও শ্রমশক্তির মধ্যে 'খাঁটি সম্পর্ক' প্রতিষ্ঠায় শিশুচুরি ও শিশু-দাসত্বের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিয়ে। এ-প্রসঙ্গে তিনি বলছেন:

'এ-ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করা সম্ভবত জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের যোগ্য যে কোনো কারখানায় সফলভাবে কাজ পরিচালনা করতে হলে দরিদ্র শিশুদের সন্ধানে কৃষকদের কুটিরগুলি ও দরিদ্রবসতিগুলি তন্নতন্ন করে ঢুঁড়ে দেখা প্রয়োজন কিনা? ওই শিশুদের পালাক্রমে রাত্রের বেশির ভাগ সময় কাজে নিযুক্ত করা এবং যে-বিশ্রামটুকু সকল মানুষের পক্ষে, বিশেষ করে শিশুদের পক্ষে তো বটেই, বিশেষ অপরিহার্য তা থেকে তাদের বঞ্চিত করা উচিত কিনা? উচিত কিনা বিভিন্ন বয়স ও স্বভাবের বেশকিছু-সংখ্যক ছেলেমেয়েকে একত্র জমায়েত করে রাখা যাতে অসৎ সংসর্গের ছোঁয়াচে ভ্রষ্টাচার ও লাম্পট্যের প্রাদুর্ভাব না-ঘটে পারে না? এতে কি ব্যক্তিগত ও জাতীয় সুখসৌষ্ঠবের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে?'*

ফিলডেন বলছেন, 'ডার্বিশায়ার, নটিংহ্যামশায়ার এবং বিশেষ করে ল্যাঙ্কাশায়ারের জেলাগুলিতে জলের তোড়ে চালক-চক্রগুলি ঘোরাতে সমর্থ এমন সমস্ত নদীর ধারে নির্মিত বড়-বড় ফ্যাক্টরিসমূহে নতুন-আবিষ্কৃত নানা যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হচ্ছিল। এ-কারণে এই সমস্ত কাজের জায়গায় আচমকা প্রয়োজন হয়ে পড়ল হাজার-হাজার শ্রমিকের, অথচ জায়গাগুলো ছিল শহর থেকে বেশ দূরে। বিশেষ করে ল্যাঙ্কাশায়ার তখনও পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত স্বল্পবসতিপূর্ণ ও বন্ধ্যা অঞ্চল ছিল বলে তার পক্ষে খুবই বেশি প্রয়োজন হয়ে পড়ল কর্মী-জনগণের। ছোট-ছোট শিশুর কচি-কচি হাতের চটপটে কর্মতৎপর আঙুলের চাহিদা সবচেয়ে বেশি করে দেখা দিয়েছিল বলে সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডন, বার্মিংহাম ও অন্যান্য জায়গার নানা যাজকপল্লীর দরিদ্র-বসতিগুলি থেকে **শিক্ষানবিশ** সংগ্রহ করাটা রীতিমতো একটা প্রথায় দাঁড়িয়ে গেল। ৭ বছর থেকে ১৩ বা ১৪ বছর বয়সী হাজার-হাজার এইসব খুদে, দুর্ভাগা জীবদের পাঠিয়ে দেয়া হল দেশের উত্তরাঞ্চলে। মালিকই তার শিক্ষানবিশদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করবে এবং ফ্যাক্টরির কাছাকাছি এক 'শিক্ষানবিশ-আলয়ে' তাদের থাকতে দেবে এই ছিল রীতি। শিশুদের কাজের তদারক করার জন্যে

---

* ইডেন, উদ্ধৃত রচনা, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ, প্রথম অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৪২১।

উপদর্শকেরা নিযুক্ত হত। এদের স্বার্থ ছিল শিশুদের যতদূর-সম্ভব বেশি খাটিয়ে নেয়া, কারণ যে-পরিমাণ কাজ তারা আদায় করতে পারত সেই অনুপাতে বেতন পেত তারা। বলা বাহুল্য, এর পরিণামে ছিল নিষ্ঠুরতা।... অনেকগুলি শিল্প-কারখানা অঞ্চলে, তবে আমার আশঙ্কা এই যে আমি যে-জেলার (ল্যাংকাশায়ার) অধিবাসী বিশেষ করে সেই জেলায়, সবচেয়ে হৃদয়বিদারক নিষ্ঠুরতার চর্চা চলেছিল সেই নির্দোষ ও বন্ধুহীন অসহায় জীবগুলির ওপর — যাদের এইভাবে সঁপে দেয়া হয়েছিল কারখানা-মালিকদের হেফাজতে। অতিরিক্তরকম খাটিয়ে ছেলেমেয়েগুলিকে হয়রান করে একেবারে মৃত্যুর কিনারায় এনে ফেলা হয়েছিল... সবচেয়ে নিদারুণ মার্জিত নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়ে তাদের বেত মারা, শিকলে বেঁধে রাখা ও উৎপীড়ন করা হোত।... বহুক্ষেত্রেই তাদের নিরম্বু উপবাস করিয়ে রেখে বেত মেরে কাজ করানো হোত এবং... এমনকি কোনো-কোনো ক্ষেত্রে... এমন অবস্থায় এনে ফেলা হোত তাদের যাতে তারা আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে বাধ্য হয়।... এইভাবে সৌন্দর্যে অনুপম ডার্বিশায়ার, নটিংহ্যামশায়ার ও ল্যাংকাশায়ারের রোমান্টিক উপত্যকাগুলি লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে হয়ে উঠেছিল উৎপীড়নের ও বহুক্ষেত্রে নরহত্যারও নিরানন্দ নির্জন কবরখানার তুল্য। এতে কারখানা-মালিকদের মুনাফা জুটেছিল প্রচুর, কিন্তু এতে ক্ষুধার নিবৃত্তি হওয়া দূরে থাক, তাদের লালসা গেল আরও বেড়ে; আর তাই কারখানা-মালিকরা এমন এক পদ্ধতি অবলম্বন করল যার ফলে মনে হয় তাদের মুনাফা-লোটার পথ যে শুধু প্রশস্ত ও নিশ্চিত হল তা-ই নয়, তা সকল সীমা ছাড়িয়ে গেল। তারা চালু করল যাকে বলা হয় 'রাতের কাজ'এর পদ্ধতি, অর্থাৎ একদল ছেলেপিলেকে সারাদিন ধরে খাটিয়ে ক্লান্ত করে ফেলে তারা আরেক দল ছেলেপিলেকে কারখানায় ঢোকাত সারা রাত ধরে কাজ করানোর জন্যে। রাতের শিশু-মজুরের দল যে-বিছানা সবে ছেড়ে এসেছে দিনের শিশু-মজুরের দল তখন গিয়ে শুত সেই বিছানায়, আবার সকালবেলায় তাদের পালা এলে দিনের মজুরের দল যে-বিছানা ছেড়ে আসত সেই বিছানায় গিয়ে শুত রাতের মজুরের দল। বিছানাগুলো কখনও মানুষের দেহের উত্তাপ ভুলে ঠাণ্ডা হবার সময় পায় না — এটাই হল ল্যাংকাশায়ারের প্রচলিত ঐতিহ্য।"*

---

* John Fielden. 'The Curse of the Factory System', London, 1836, pp. 5, 6. ফ্যাক্টরি-ব্যবস্থার এরও পূর্ববর্তী কলংকজনক অধ্যায়ের কথা জানার জন্যে দেখুন ডঃ আইকিনের (১৭৯৫ সাল) গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ২১৯, এবং Gisborne. 'Inquiry into the Duties of Men', 1795. Vol. II. স্টীম এঞ্জিন আবিষ্কারের ফলে দেশের ফ্যাক্টরিগুলিকে যখন গ্রামাঞ্চলের ঝর্নার ধার থেকে শহরগুলির মাঝখানে সরিয়ে আনা হল, তখন উদ্বৃত্ত মূল্যের 'মিতাচারী' উৎপাদকরা ফ্যাক্টরির কাজে শিশু-শ্রমিকদের পেয়ে গেল একেবারে হাতের কাছেই, দরিদ্র-বসতিগুলিতে ক্রীতদাসের সন্ধানে ছুটতে হল না আর তাদের। ১৮১৫ সালে স্যার আর. পীল ('বাকপটু মন্ত্রী'র

হস্তশিল্পভিত্তিক বড় আকারের উৎপাদনের যুগে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় জনমত লজ্জা ও বিবেক-দংশনের অবশেষটুকুও হারিয়ে বসল। পুঁজিতান্ত্রিক সঞ্চয় গড়ে তোলার উপায় হিসেবে যে-কোনো জঘন্য অসৎ কাজ তাদের সহায়ক হলেও নির্লজ্জভাবে তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হল ইউরোপীয় জাতিগুলি। উদাহরণস্বরূপ মহদাশয় অ্যা. অ্যান্ডারসনের কলাকৌশলবর্জিত সরল বাণিজ্যের ইতিবৃত্ত-সংক্রান্ত বইখানি পড়ুন। এ-বইয়ে বগল বাজিয়ে ব্রিটিশ রাষ্ট্র-পরিচালনকৌশলের পরাকাষ্ঠা বলে জাহির করা হয়েছে ইউট্রেখ্‌টে যুদ্ধ শান্তির ব্যাপারটিকে। এই শান্তিস্থাপনের ফলে আসিয়েন্তো চুক্তি (৫০) অনুযায়ী ইংলন্ড স্পেনদেশীয়দের কাছ থেকে আদায় করে নেয় নিগ্রো দাস-ব্যবসায় পরিচালনার সুযোগসুবিধা। এর আগে পর্যন্ত এই ব্যবসায় পরিচালিত হোত কেবলমাত্র আফ্রিকা ও ব্রিটিশ ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং আফ্রিকা ও স্প্যানিশ আমেরিকার মধ্যে। ওই চুক্তির বলে ইংলন্ড ১৭৪৩ সাল পর্যন্ত স্প্যানিশ আমেরিকাকে বছরে ৪.৮০০ জন করে নিগ্রো-দাস সরবরাহের অধিকার লাভ করে। এই সঙ্গে আলোচ্য চুক্তিটি ব্রিটিশ চোরাচালানি

[illegible] যখন শিশুদের সংরক্ষণ-সম্পর্কিত আইনের প্রস্তাবিত খসড়াটি পার্লামেন্টে উপস্থাপিত করেন তখন 'বুলিয়ান (ধাতুখণ্ডের বাট) নিয়ন্ত্রণ কমিটির' প্রধান ও রিকার্ডোর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ফ্রান্সিস হোর্নার কমন্স-সভায় বলেন: 'এটা একটা কুৎসিত ব্যাপার যে কোনো দেউলিয়া ব্যক্তির জিনিসপত্রের মতো এই শিশুদের একটি ক্রীতদাস-দলকে (কথাটা যদি বলতে অনুমতি দেন) বিক্রির জন্যে উপস্থাপিত করা হয় এবং যেন কারও সম্পত্তির অংশ এইভাবে প্রকাশ্যে তা বিজ্ঞাপিত করা হয়। দুবছর আগে 'কিংস বেঞ্চ'এর আদালতে একটা অত্যন্ত বর্বর, নৃশংস ঘটনার শুনানি ওঠে। এই ঘটনা থেকে জানা যায় যে লণ্ডনের একটি যাজকপল্লী থেকে জনৈক কারখানা-মালিকের কাছে শিক্ষানবিশ হিসেবে বেচে-দেয়া ওই ধরনের কিছু-সংখ্যক ছেলেকে অপর একজনের কাছে হস্তান্তরিত করা হয় এবং ওই সময়ে কিছু সদাশয় ব্যক্তি দেখতে পান যে ছেলেগুলি অনাহারে একেবারে দুর্ভিক্ষপীড়িত অবস্থায় রয়েছে। একটি পার্লামেন্টারি। কমিটিতে কাজ করার সময় এর চেয়েও ভয়াবহ আরেকটি ঘটনা তাঁর গোচরে আসে... তা হল এই যে অল্প কয়েক বছর আগে লণ্ডনের একটি যাজকপল্লী ও ল্যাঙ্কাশায়ারের এক কারখানা-মালিকের মধ্যে এইমর্মে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় যে চুক্তির একটি শর্ত অনুসারে প্রতি ২০ জন সুস্থ ছেলেমেয়ের সঙ্গে কারখানা-মালিককে একজন করে জড়বুদ্ধি শিশুকে নিতে হবে।'

কারবারের ওপরও সরকারি ক্রিয়াকলাপের আবরণ হিসেবে কাজ করে। এই দাস-ব্যবসায়ের ফলে ফুলেফেঁপে ওঠে ঐশ্বর্যসম্ভারে লিভারপুল। আদিম সঞ্চয়-সংগ্রহের এইটিই ছিল লিভারপুলের পদ্ধতি। এমনকি আজকের দিনেও লিভারপুলের 'কৌলীন্য'এর ভিত্তি হল এই দাস-ব্যবসায়ের জয়গাথা। এ-প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত আইকিনের ওপরে-উদ্ধৃত বইখানি (১৭৯৫ সালে প্রকাশিত) দেখুন। সে-বইয়ে বলা হয়েছে যে দাস-ব্যবসায় 'মিলে গিয়েছিল লিভারপুলের বাণিজ্যরীতির যা বৈশিষ্ট্য সেই দুঃসাহসিক অভিযানের মনোভাবের সঙ্গে এবং তা দ্রুত লিভারপুলকে উন্নীত করে তার বর্তমান ঐশ্বর্যের অবস্থায়। এর ফলেই এখানে জাহাজ-চলাচল বৃদ্ধি পেয়েছে বিপুল পরিমাণে ও নাবিকরাও নিযুক্ত হয়েছে প্রচুর সংখ্যায় এবং তা দেশের কলকারখানাগুলির চাহিদাও মিটিয়েছে বিপুল পরিমাণে' (পৃষ্ঠা ৩৩৯)। দাস-ব্যবসায়ে লিভারপুল ১৭৩০ সালে নিযুক্ত করে ১৫খানা জাহাজ, ১৭৫১ সালে—৫৩, ১৭৬০ সালে—৭৪, ১৭৭০ সালে—৯৬ আর ১৭৯২ সালে তা নিযুক্ত করে ১৩২খানা জাহাজ।

সুতী-বস্ত্রশিল্প যেমন ইংলণ্ডে প্রবর্তন ঘটায় শিশু-দাসত্বের তেমনই তা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে আগেকার কমবেশি পিতৃতান্ত্রিক দাসত্বের এক ধরনের বাণিজ্যিক শোষণ-ব্যবস্থায় রূপান্তর ঘটানোয় প্রেরণা যোগায়। সত্যি কথা বলতে কি, ইউরোপের মজুরিনির্ভর-শ্রমিকদের আব্রু-দেয়া দাসত্বের পক্ষে শক্ত পাদপীঠ পাওয়ার জন্যে প্রয়োজন ছিল নতুন দুনিয়ায় বিশুদ্ধ ও সরল দাসত্ব-প্রতিষ্ঠার।*

পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির 'চিরস্থায়ী প্রাকৃতিক নিয়মাবলী' প্রতিষ্ঠার জন্যে, শ্রমিককুল ও শ্রমের অবস্থাদির মধ্যে বিচ্ছিন্নতার প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ করে তোলার উদ্দেশ্যে, এক মেরুতে উৎপাদনের ও জীবনধারণের সামাজিক উপায়-উপকরণাদিকে পুঁজিতে ও ভিন্ন মেরুতে জনসাধারণের

---

* ১৭৯০ সালে ব্রিটিশ ওয়েস্ট ইন্ডিজে ছিল প্রতিটি স্বাধীন মানুষের মাথাপিছু দশজন করে ক্রীতদাস, সেখানকার ফরাসি-অধিকৃত এলাকায় প্রতিটি স্বাধীন মানুষের মাথাপিছু চোদ্দজন করে দাস এবং ওলন্দাজ-অধিকৃত এলাকায় প্রতিটি স্বাধীন মানুষের মাথাপিছু তেইশজন করে ক্রীতদাস।

বিপুল জনসংখ্যাকে মজুরিনির্ভর-শ্রমিকে, আধুনিক সমাজের সেই কৃত্রিম ফসল 'স্বাধীন শ্রমজীবী দরিদ্র'এ* রূপান্তরিত করার জন্যে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে — 'tantae molis erat' (৫১)। অজিয়ে-র মতে, যদি অর্থ 'এ-দুনিয়ায় জন্ম নিয়ে থাকে তার এক গালে সহজাত রক্তের চিহ্ন নিয়ে'**, তাহলে বলতে

(Henry Brougham. 'An Inquiry into the Colonial Policy of the European Powers'. Edinburgh, 1803. v. II, p. 74.)

* যে-মুহূর্ত থেকে মজুরিনির্ভর-শ্রমিকদের শ্রেণী নজরে পড়ার মতো অবস্থায় এসেছে সেই মুহূর্ত থেকেই ব্রিটিশ আইনের ধারাগুলিতে এই 'শ্রমজীবী দরিদ্র' বাক্যাংশটি পাওয়া গেছে। এই আখ্যাটি ব্যবহৃত হয়েছে একদিকে 'নিষ্কর্মা দরিদ্র', ভিক্ষুক, ইত্যাদি ও অপরদিকে যে-সমস্ত শ্রমিক তাদের শ্রমের নিজস্ব উপায়-উপকরণাদির তখনও পর্যন্ত মালিক থেকে গেছে, অর্থাৎ যে-সমস্ত পাররার তখনও পর্যন্ত পালক ছিঁড়ে নেয়া হয় নি, তাদের সঙ্গে প্রথমোক্ত শ্রমিকদের পৃথকীকরণের উদ্দেশ্যে। সংবিধানের গ্রন্থ থেকে আখ্যাটি পরে গৃহীত হয়েছে অর্থশাস্ত্রের বইতে, এবং কালপেপের, জো. চাইল্ড, ইত্যাদি, মারফত তা হস্তগত হয়েছে অ্যাডাম স্মিথ ও ইডেনের। এর পর যে-কেউ বিচার করতে পারেন 'জঘন্য রাজনৈতিক আবোলতাবোল বুকনি-ব্যবসায়ী' এডমান্ড বার্কের সততার, যখন তিনি 'শ্রমজীবী দরিদ্র' আখ্যাটিকে বলেন 'জঘন্য রাজনৈতিক আবোলতাবোল বুকনি'। ইংরেজ উচ্চবিত্ত-শাসনের বেতনভুক এই তোষামোদ-বিশারদটি ফরাসি বিপ্লবের বিরুদ্ধে সাময়িক চাহিদা অনুযায়ী রোমান্টিক জীবনের প্রশস্তি-কীর্তনীয়ার ভূমিকায় নামেন, আবার আমেরিকান বুটঝামেলার শুরুতে উত্তর আমেরিকান উপনিবেশসমূহের কাছ-থেকে-পাওয়া বেতনমাহাত্ম্যে ইংরেজ উচ্চবিত্ত-শাসককুলের বিরুদ্ধে অভিনয় করেন উদারনীতিকের ভূমিকায়; তবে আসলে লোকটি পুরোদস্তুর স্থূলরুচি বুর্জোয়া ছাড়া কিছু নন। 'বাণিজ্য-সংক্রান্ত আইনকানুন হল প্রকৃতির নিয়ম, আর তাই তা ঈশ্বরেরই বিধান।' (E. Burke. 'Thoughts and Details on Scarcity', ed. London. 1800, pp. 31, 32.) অতএব এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে ঈশ্বর ও প্রকৃতির অমোঘ বিধান অনুযায়ী তিনি সর্বদাই সবচেয়ে চড়া দামের বাজারে নিজেকে বিক্রি করেছেন। এই এডমান্ড বার্ক ব্যক্তিটির উদারনীতিক ভেক ধারণের সময়কার ভারি চমৎকার একখানি চিত্র পাওয়া যায় রেভারেন্ড মিঃ টাকারের রচনায়। টাকার ছিলেন পাদরি ও রাজনৈতিক মতের বিচারে একজন টোরি, কিন্তু তা বাদ দিলে তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ও একজন দক্ষ অর্থশাস্ত্রীও। আজকের দিনে 'বাণিজ্য-সংক্রান্ত আইনকানুন'এ একান্ত ভক্তের মতো আস্থাশীল সর্বব্যাপী জঘন্য কাপুরুষতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমাদের পরম কর্তব্য হল এহেন বার্কদের (যারা তাদের উত্তরসূরীদের থেকে মাত্র একটি ব্যাপারেই পৃথক, তা হল উচ্চ দক্ষতা) বারে-বারে লোকচক্ষে চিহ্নিত করে দেয়া।

** Marie Augier. 'Du Crédit Public', Paris, 1842.

হয় পঁুজি জন্ম নিয়েছে তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত, প্রতিটি রোমকূপ থেকে ফোঁটায়-ফোঁটায় ঝরা রক্ত ও পূতিগন্ধ আবর্জনা নিয়ে।*

৭। পঁুজিতান্ত্রিক সঞ্চয়-সংগ্রহের ঐতিহাসিক প্রবণতা

পঁুজির আদিম সঞ্চয়, অর্থাৎ তার ঐতিহাসিক উৎপত্তির পরিণতি ঘটে কিসে? সেটা যদি ক্রীতদাস ও ভূমিদাসদের মজুরিনির্ভর-শ্রমিকে তাৎক্ষণিক রূপান্তর এবং, অতএব, নিছক আকারগত পরিবর্তন বলে না-ধরি, তাহলে বলতে হয় সেটা হল প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীদের উচ্ছেদ, অর্থাৎ মালিকের প্রত্যক্ষ শ্রমনির্ভর ব্যক্তিগত সম্পত্তির মূলোচ্ছেদ।

সামাজিক, যৌথ সম্পত্তির বিপরীতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি টিকে থাকে সেখানেই একমাত্র যেখানে শ্রমের উপায়-উপকরণ এবং শ্রমের বহিঃস্থ অবস্থাদি ব্যক্তিবিশেষদের অধিকারে থাকে। তবে এই ব্যক্তিবিশেষরা নিজেরা শ্রমিক হওয়া বা না-হওয়ার ওপর ব্যক্তিগত সম্পত্তিরও বিভিন্ন প্রকৃতি নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে প্রথম দৃষ্টিতে যে-অসংখ্য ছোটখাট রকমফের ও

---

* *Quarterly Reviewer* পত্রিকার এক আলোচক বলেছেন যে 'পঁুজি বিক্ষোভ-আলোড়ন ও বিবাদ-বিসংবাদ এড়িয়ে চলে, পঁুজি হল গিয়ে ভীরু। কথাটা খুবই সত্যি, তবে কিনা এটা নেহাতই অর্ধসত্য ছাড়া কিছু নয়। পঁুজি মুনাফার অভাব কিংবা নিতান্ত সামান্য মুনাফাকে পরিহার করে চলে, যেমন কিনা আগে বলা হোত যে প্রকৃতি শূন্যতাকে এড়িয়ে চলে ঘৃণাসহকারে। তবে যথেষ্ট পরিমাণে মুনাফা জুটলে তখন কিন্তু পঁুজি দারুণ সাহসী হয়ে ওঠে। ১০ শতাংশ মুনাফা নিশ্চিত হলে পঁুজি সর্বত্রই খাটতে রাজি; ২০ শতাংশ মুনাফা পঁুজিকে আগ্রহী করে তুলবে নিশ্চিতই; ৫০ শতাংশ মুনাফা নিশ্চিতভাবে উদ্ধত করে তুলবে পঁুজিকে; ১০০ শতাংশ মুনাফা পঁুজিকে অস্থির করে তুলবে সকল প্রকার মানবিক আইনকানুন পায়ে মাড়িয়ে যেতে; আর ৩০০ শতাংশ মুনাফার সন্ধান পেলে তো কথাই নেই, তখন এমন কোনো অপরাধ নেই যা করতে সে পিছ্‌পা হবে, এমন কোনো ঝুঁকি নেই যা সে নিতে ভয় পাবে, এমনকি এর ফলে যদি পঁুজির মালিককে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হয় তো তা-ও স্বীকার। যদি বিক্ষোভ-আলোড়ন ও বিবাদ-বিসংবাদের ফলে মুনাফা জোটে, তাহলে পঁুজি ওই উভয় ব্যাপারকেই খোলাখুলি উস্কানি দেবে। চোরাইচালান ও দাস ব্যবসায় এখানে যা-যা বলা হয়েছে তার সবকিছুকেই পরিপূর্ণভাবে প্রমাণ করেছে।' (T. J. Dunning, 'Trades' Unions and Strikes', London, 1860, pp. 35, 36.)

তারতম্য চোখে পড়ে তা হল এই দুটি চরম অবস্থার মধ্যবর্তী স্তরগুলির পরিচয়সূচক।

শ্রমিকের উৎপাদনের উপায়-উপকরণের ওপর তার ব্যক্তিগত মালিকানা ছোটখাট কুটির-শিল্পের ভিত্তি, তা সে কুটির-শিল্প কৃষিভিত্তিক, শ্রমবিভাগমূলক শিল্পোৎপাদনভিত্তিক, অথবা এই উভয় ধরনভিত্তিক, যা-ই হোক-না কেন। ছোট কুটির-শিল্প আবার সামাজিক উৎপাদন এবং শ্রমিকের নিজেরই স্বাধীন ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পক্ষে একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত। অবশ্য, বলা বাহুল্য, উৎপাদনের এই ছোটখাট ধরন দাসপ্রথা, ভূমিদাস-প্রথা ও পরনির্ভরতার অন্যান্য প্রথার আমলেও টিকে ছিল। তবে ওই উৎপাদনের প্রথাটি বিকশিত হয়ে উঠেছে, তার সমগ্র কর্মশক্তির মুক্তি ঘটেছে, যথোপযুক্ত ধ্রুপদী স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছে ওই প্রথা, একমাত্র যখন শ্রমিক তার নিজস্ব শ্রমের উপায়কে নিজেই ক্রিয়াশীল করে তুলে ওই উপায়ের ব্যক্তিগত মালিক হয়ে বসেছে। অর্থাৎ, যখন যে-জমি চাষ করছে সেই জমিরই মালিক বনে গেছে কৃষক, ওস্তাদ কারিগর হিসেবে যে-যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করছে সেই যন্ত্রপাতিরই মালিক হয়েছে কারুশিল্পী।

জমির টুকরোটুকরো ভাগ এবং উৎপাদনের অন্যান্য উপায়াদির ছড়ানো-ছিটনো বিক্ষিপ্ত অবস্থাই হল এই ধরনের উৎপাদন-পদ্ধতির আবশ্যিক পূর্বশর্ত। এই ধরনের উৎপাদন-পদ্ধতি যেমন উৎপাদনের উপরোক্ত উপায়াদির কেন্দ্রীকরণ এড়িয়ে চলে, তেমনই এ এড়িয়ে চলে সমবায়, প্রতিটি পৃথক উৎপাদন-প্রক্রিয়ার মধ্যে শ্রমবিভাগ, প্রকৃতির ওপর সমাজের সর্বাঙ্গীণ নিয়ন্ত্রণ ও সমাজের দ্বারা প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের উৎপাদনশীল প্রয়োগ এবং সমাজের উৎপাদনী শক্তিসমূহের স্বাধীন বিকাশ। এই উৎপাদন-পদ্ধতি কেবলমাত্র সেই উৎপাদন-ব্যবস্থা ও সেই বিশেষ সমাজের সঙ্গে খাপ খায়, যা নাকি নিজের সংকীর্ণ ও কমবেশি আদিম অবস্থার সীমানার মধ্যে আবর্তিত হয়। এই পদ্ধতিকে টিকিয়ে রাখা হোত তা-ই, যাকে পেকার যথাযথভাবে বলেছেন, 'সর্বজনীন মাঝারি অবস্থাকে আইন করে টিকিয়ে রাখা' (৫২)। বিকাশের একটি নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছে এই উৎপাদন-পদ্ধতি তার নিজেরই বিলোপের বস্তুগত উপাদানগুলির জন্ম দেয়, আর সেই মুহূর্তটি থেকে সমাজের বুকে অঙ্কুরিত হয় নতুন-নতুন শক্তি ও নতুন-

নতুন আবেগ. অথচ পুরনো উৎপাদন-পদ্ধতি সেগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে দমিয়ে রাখে। কাজেই সেই উৎপাদন-পদ্ধতিকে ধ্বংস করা দরকার, আর তাই তা ধ্বংস হয়েছেও। এই উৎপাদন-পদ্ধতির ধ্বংসসাধন, উৎপাদনের ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও বিক্ষিপ্ত উপায়-উপকরণের সমাজগতভাবে কেন্দ্রীভূত রূপে বিবর্তন, বহুজনের ছোট-ছোট সম্পত্তি অল্প কয়েকজনের বিশাল সম্পত্তিতে রূপান্তরকরণ এবং বিপুল-সংখ্যক মানুষকে জমি থেকে, জীবনধারণের উপায়-উপকরণ থেকে ও শ্রমের উপায়াদি থেকে উচ্ছেদসাধন — বিপুল জনসংখ্যার এই ভয়াবহ ও যন্ত্রণাদায়ক সর্বস্বচ্যুতির ব্যাপারটিই হল পুঁজির ইতিহাসের প্রস্তাবনাস্বরূপ। এই প্রক্রিয়ার অন্তর্গত বেশকিছু বলপ্রয়োগের পদ্ধতি — তার মধ্যে আমরা আলোচনা করেছি পুঁজির আদিম সঞ্চয়-সংগ্রহের মতো কেবল সেই যুগান্তকারী পদ্ধতিগুলি নিয়ে। প্রত্যক্ষ উৎপাদকদের উৎপাদনের উপায়াদি থেকে উচ্ছেদসাধনের এই প্রক্রিয়াটি কার্যকর করা হয়েছিল নির্মম বর্বরোচিত উপায়ে এবং সবচেয়ে অসৎ, সবচেয়ে ইতর, হীনতম ও জঘন্যতম স্বার্থপর মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়ে। স্বোপার্জিত ব্যক্তিগত সম্পত্তি — যার ভিত্তি ছিল, বলা যায়, শ্রমের উপায়-উপকরণের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন স্বনির্ভর শ্রমজীবী ব্যক্তিবিশেষের একীভূত অবস্থা — তাকে স্থানচ্যুত করে তার জায়গায় অধিষ্ঠিত হয়েছে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যক্তিগত সম্পত্তি, আর এ-সম্পত্তির ভিত্তি হচ্ছে অপরাপর মানুষের, অর্থাৎ মজুরিনির্ভর-শ্রমিকের, তথাকথিত মুক্ত শ্রমের শোষণ।*

এই রূপান্তরসাধনের প্রক্রিয়া পুরনো সমাজের আগাপাছতলায় যথেষ্ট পরিমাণে পচন ধরিয়ে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে, শ্রমিকরা প্রলেতারিয়ান শ্রেণীতে ও তাদের শ্রমের উপায়-উপকরণ পুঁজিতে পরিণত হওয়ামাত্রই, পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে, শ্রমের আরও অধিক সামাজিকীকরণ এবং জমি ও উৎপাদনের অন্যান্য উপায়-উপকরণাদির সামাজিকভাবে ব্যবহার ও ফলত যৌথ উপায়ে সে-সবের আরও বেশি করে

* 'আমরা একেবারেই নতুন সামাজিক ব্যবস্থায় প্রবেশ করেছি... আমরা সব ধরনের শ্রম থেকে সব ধরনের মালিকানাকে পৃথক করতে আগ্রহান্বিত হই।' (Sismondi, 'Nouveaux Principes de l'Economie Politique', t. II [Paris, 1827], p. 434.)

রূপান্তরসাধন এবং সেইসঙ্গে ব্যক্তিগত মালিকদের আরও বেশি করে উচ্ছেদসাধনের প্রক্রিয়া এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। অতঃপর এখন যাকে মালিকানা থেকে উচ্ছেদ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ল সে নিজের ভরণপোষণের জন্যে কর্মরত শ্রমিক নয়, সে হল গিয়ে বহু শ্রমিকের শোষণকারী খোদ পঁুজিপতি।

এবার এই উচ্ছেদসাধনের ব্যাপারটি নিষ্পন্ন হতে লাগল খোদ পঁুজিতান্ত্রিক উৎপাদনের অন্তর্নিহিত আইনকানুনের নিজস্ব প্রক্রিয়ায়, পঁুজির কেন্দ্রীভবনের ফলে। একেক জন পঁুজিপতি সর্বদাই এইভাবে বহু পঁুজিপতিকে হত্যা করে থাকে। পঁুজির এই কেন্দ্রীভবন, অথবা অল্প কয়েকজন পঁুজিপতির দ্বারা বহু পঁুজিপতি মালিকানার এই উচ্ছেদসাধনের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে ক্রমশ ব্যাপক হারে বিকশিত হয় শ্রম-প্রক্রিয়ার সমবায়িক ধরনটি, বিজ্ঞানের সচেতন প্রযুক্তিবিদ্যাগত প্রয়োগ, জমিতে সুশৃঙ্খলভাবে নিয়মানুগ চাষবাস, শ্রমের হাতিয়ারগুলিকে একমাত্র যৌথভাবে ব্যবহারযোগ্য শ্রমের হাতিয়ারে পরিণতকরণ, উৎপাদনের সকল উপায়-উপকরণকে যৌথ সমাজীকৃত শ্রমের সাহায্যে উৎপাদনের উপায় হিসেবে ব্যবহার করে সে-সমস্ত জিনিসের সুমিত প্রয়োগ ও সকল জাতির মানুষকে বিশ্ব-বাজারের বেড়াজালে জড়িয়ে ফেলার প্রক্রিয়াগুলি এবং এর সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত হয় পঁুজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার আন্তর্জাতিক চরিত্রও। এই রূপান্তরের প্রক্রিয়ার যাবতীয় সুযোগসুবিধা যারা গ্রাস করে ও নিজেদের একচেটিয়া অধিকারভুক্ত করে নেয় সেই পঁুজির বড়-বড় মালিকের সংখ্যা অনবরত হ্রাস পেয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে অপরদিকে বৃদ্ধি পেয়ে চলে দুঃখদুর্দশা, উৎপীড়ন, দাসত্ব, চরিত্রহানি, শোষণ, ইত্যাদির বিপুল জঞ্জাল; তবে আবার সেইসঙ্গে বৃদ্ধি পায় শ্রমিক শ্রেণীর বিক্ষোভও—এই শ্রমিক শ্রেণীর লোকসংখ্যা অনবরত বৃদ্ধি পেয়ে চলে এবং খোদ পঁুজিতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রক্রিয়ার কার্যসূত্রেই এই শ্রেণীটি হয়ে ওঠে শৃঙ্খলাপরায়ণ, ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত পঁুজির একাধিপত্য ক্রমে পঁুজির পাশাপাশি ও তার কর্তৃত্বাধীনে গজিয়ে-ওঠা ও বিকশিত-হয়ে-চলা উৎপাদন-পদ্ধতির পক্ষে শৃঙ্খলস্বরূপ হয়ে ওঠে। উৎপাদনের উপায়-উপকরণসমূহের কেন্দ্রীভবন এবং শ্রমের সামাজিকীকরণ অবশেষে এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছয় যখন সেগুলি বেমানান হয়ে

ওঠে তাদের পংজিতান্ত্রিক বহিরাবরণের পক্ষে। আর তখন ওই বহিরাবরণ যায় ফেটে চৌচির হয়ে। পংজিতান্ত্রিক ব্যক্তিগত সম্পত্তির মৃত্যুর ঘণ্টা বেজে ওঠে তখনই। অপরের উচ্ছেদকারীরা নিজেরাই তখন উৎখাত হয়ে যায়।

আত্মসাৎকরণের পংজিতান্ত্রিক পদ্ধতি, যা নাকি পংজিতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির ফল, তা-ই জন্ম দেয় পংজিতান্ত্রিক ব্যক্তিগত সম্পত্তির। এটি হল মালিকের নিজস্ব শ্রমে গড়ে-তোলা পৃথক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রথম নিরাকরণ। কিন্তু পংজিতান্ত্রিক উৎপাদন অপ্রতিরোধনীয় প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই নিজের নিরাকরণ ডেকে নিয়ে আসে। আর তখন তা হয় নিরাকরণের নিরাকরণ (বা 'নেতির নেতি')। তবে এর ফলে উৎপাদকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি-যে ফের প্রতিষ্ঠিত হয় তা নয়, কেবল উৎপাদক লাভ করে পংজিতান্ত্রিক যুগের অর্জিত সাফল্যাদির ভিত্তিতে, অর্থাৎ জমি ও উৎপাদনের উপায়-উপকরণসমূহের সমবায়িক ও যৌথ অধিকারমূলক ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা মানুষের নিজস্ব সম্পত্তি।

ব্যক্তিবিশেষদের শ্রমের ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা ছড়ানো-ছিটনো, বিক্ষিপ্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তির পংজিতান্ত্রিক ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রূপান্তর স্বভাবতই এমন একটি প্রক্রিয়া যা কার্যত সমাজীকৃত উৎপাদনের ভিত্তিতে স্থাপিত পংজিতান্ত্রিক ব্যক্তিগত সম্পত্তির সমাজীকৃত সম্পত্তিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়া থেকে তুলনাহীনরকম বেশি দীর্ঘ-বিলম্বিত, সহিংস ও কঠিন। ওই প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি অল্প কয়েকজন আত্মসাৎকারীর হাতে বিপুল-সংখ্যক জনসাধারণ মালিকানা থেকে উৎখাত হয়ে গেছে, আর এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে আমরা দেখছি বিপুল জনসমষ্টির হাতে মালিকানা থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে অল্প কয়েকজন আত্মসাৎকারী।*

---

*বুর্জোয়া শ্রেণী যার অনিচ্ছুক কারকস্বরূপ যন্ত্রশিল্পের সেই অগ্রগতি প্রতিযোগিতার ফলে শ্রমিকদের পূর্ববর্তী বিচ্ছিন্নতার জায়গায় আমদানি করেছে পরস্পর-সংযোগের ফলে শ্রমিকদের বর্তমান বৈপ্লবিক মিলনের। অতএব আধুনিক শিল্পের বিকাশ বুর্জোয়া শ্রেণী যে-ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড়িয়ে পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন ও তা আত্মসাতের কাজটি নিষ্পন্ন করে ঠিক সেই ভিত্তিটিই সরিয়ে নিচ্ছে। বুর্জোয়া শ্রেণী সবচেয়ে বেশি করে যা

প্রথম প্রকাশিত হয় বইয়ে:
K. Marx. 'Das Kapital.
Kritik der politischen
Oekonomie'. Erster Band.
Hamburg, 1867

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস
সম্পাদিত ১৮৮৭
সালের ইংরেজি
সংস্করণ অনুযায়ী
প্রবন্ধগুলি ছাপা হয়েছে

উৎপাদন করছে তা হল তার নিজেরই কবর-খনকদের। বুর্জোয়ার পতন ও প্রলেতারিয়েতের বিজয় একই রকম অবশ্যম্ভাবী।... আজকের দিনে বুর্জোয়া শ্রেণীর মুখোমুখি যে-কয়েকটি শ্রেণী এসে দাঁড়িয়েছে তাদের মধ্যে একমাত্র প্রলেতারিয়েতই হল যথার্থ বিপ্লবী শ্রেণী। অপর শ্রেণীগুলি আধুনিক শিল্পের অগ্রগতির পেষণে বিনষ্ট ও অবলুপ্ত হয়ে যায়, একমাত্র প্রলেতারিয়েতই তার বিশিষ্ট ও অপরিহার্য উৎপাদ হিসেবে টিকে থাকে। নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলি, ছোট-ছোট কারখানার মালিক, দোকানদার, কারুশিল্পী, কৃষক — এরা সবাই বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই করে — মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর বিভিন্ন ভগ্নাংশ হিসেবে বিলুপ্তির বিরুদ্ধে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার উদ্দেশে। সুতরাং এরা বিপ্লবপন্থী নয় রক্ষণশীল। তদুপরি এরা হল প্রতিক্রিয়াশীল, কারণ এরা ইতিহাসের চাকা পেছনদিকে ঘুরিয়ে দিতে সচেষ্ট হয়।' Karl Marx und Friedrich Engels, 'Manifest der Kommunistischen Partei'. London, 1848, pp. 9, 11. (কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস, 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার', লন্ডন, ১৮৪৮ সাল, পৃষ্ঠা ৯, ১১।)

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

Demokratisches Wochenblatt পত্রিকার জন্যে লিখিত কার্ল মার্কসের 'পুঁজি' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের সমালোচনা (৫৩)

মার্কসের 'পুঁজি' গ্রন্থ*

১

পৃথিবীতে যতদিন ধরে পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের অস্তিত্ব রয়েছে তার মধ্যে আমাদের সামনে এই-যে বইখানি রয়েছে শ্রমিকদের পক্ষে এর চেয়ে বা এতখানি গুরুত্বপূর্ণ বই আর লেখা হয় নি। আমাদের সমগ্র বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা যে-অক্ষদণ্ডের ভিত্তিতে আবর্তিত হচ্ছে, পুঁজি ও শ্রমের মধ্যেকার সেই সম্পর্কটি এই প্রথম এ-বইয়ে বিজ্ঞানসম্মতভাবে আলোচিত হয়েছে, এবং তা হয়েছে একমাত্র কোনো জার্মানের পক্ষেই যা সম্ভব ততখানি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশদ ও তীক্ষ্ণভাবে। এ ব্যাপারে ওয়েন, সাঁ-সিমোঁ অথবা ফুরিয়ে-এর রচনাবলী যেমন এখন তেমনই তা ভবিষ্যতেও মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে সন্দেহ নেই, তবে সেই তুঙ্গশৃঙ্গে আরোহণ করার ব্যাপারটি বিশেষ করে একজন জার্মানের জন্যেই নির্দিষ্ট ছিল—যেখান থেকে আধুনিক সমাজ-সম্পর্কের সমগ্র ক্ষেত্রটিই স্পষ্ট ও পরিপূর্ণভাবে দৃষ্টিগোচর হতে পারে, যেমন করে পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু চুড়োয় দাঁড়িয়ে একজন পর্যবেক্ষক দেখতে পারে অপেক্ষাকৃত নিচু পাহাড়ি এলাকার দৃশ্য।

এখনও পর্যন্ত অর্থশাস্ত্র আমাদের শিখিয়ে আসছে যে শ্রমই হল সকল সম্পদের উৎস ও সকল মূল্য-নিরূপণের মাপকাঠি, অতএব উৎপাদনকালে একই পরিমাণ শ্রম-সময় ব্যয় হয়েছে এমন দুটি বস্তুর মূল্য

---

* Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie, von Karl Marx. Erster Band. Der Produktionsprozeß des Kapitals. Hamburg, O. Meissner, 1867.

একই এবং ওই দুটি বস্তুর মধ্যে পরস্পর-বিনিময় চলতে পারে, কেননা গড়পড়তা হিসাবে সমমূল্যের দুটি বস্তুই মাত্র বিনিময়যোগ্য। আবার সেইসঙ্গে অর্থশাস্ত্র আমাদের এ-ও শিক্ষা দেয় যে এক ধরনের জমা-করা শ্রমেরও অস্তিত্ব আছে, যাকে তা আখ্যা দিয়েছে পুঁজি বলে। এই পুঁজির মধ্যে আবার নানা সহায়ক উৎসের অস্তিত্ব থাকায় তা জীবন্ত (কোনো শ্রমিকের) শ্রমের উৎপাদনশীলতাকে এক শো গুণ কি হাজার গুণ বৃদ্ধি করে থাকে, এবং তার বিনিময়ে দাবি করে একটি নির্দিষ্ট মাত্রার ক্ষতিপূরণ—যাকে আখ্যা দেয়া হয়েছে মুনাফা বা লাভ। আর আমরা সবাই জানি যে বাস্তবে এই ব্যাপারটি এমন ধরনে ঘটে যাতে জমা-করা মৃত শ্রমের মুনাফা ক্রমশ হয়ে ওঠে পর্বতপ্রমাণ, পুঁজিপতিদের পুঁজির পরিমাণ ক্রমশ বেশি-বেশি ও বিশালাকার হয়ে ওঠে, অথচ অপরদিকে জীবন্ত শ্রমের মজুরি অনবরত কমতে থাকে এবং শুধুমাত্র মজুরির ওপর নির্ভর করে জীবনধারণ করে যে-বিপুল-সংখ্যক শ্রমিক তাদের সংখ্যা ও তাদের দারিদ্র্য চলে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে। এখন, এই আপাত-বৈপরীত্যের সমাধান কী? পুঁজিপতির পক্ষে মুনাফা জোটে কেমন করে, যদি উৎপন্ন দ্রব্যে যে-পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করছে শ্রমিক ক্ষতিপূরণ হিসেবে সে তার পূর্ণ মূল্য পায়? অথচ ব্যাপারটা তো এই রকমই হওয়া উচিত, কেননা একমাত্র সম-পরিমাণ মূল্যের মধ্যেই বিনিময় সম্ভব। অপরদিকে আবার সম-পরিমাণ মূল্যের মধ্যে বিনিময় সম্ভব হয় কেমন করে, কেমন করে শ্রমিক তার উৎপন্ন দ্রব্যের পূর্ণ মূল্য পেতে পারে, যখন বহু অর্থশাস্ত্রীর স্বীকৃতি অনুসারে ওই উৎপন্ন দ্রব্যটি শ্রমিক ও পুঁজিপতির মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে যায়? এ-পর্যন্ত অর্থশাস্ত্র এই বৈপরীত্যের সম্মুখীন হয়ে অসহায় বোধ করে এসেছে এবং লিখে বা তো-তো করে আউড়ে এসেছে এমন সব বিহ্বল বাক্যাংশ, যা কিছুই প্রকাশ করে না। এমনকি অর্থশাস্ত্রের এর পূর্ববর্তী সমাজতন্ত্রী সমালোচকরাও উপরোক্ত ওই বৈপরীত্যের ব্যাপারটির ওপর জোর দেয়া ছাড়া আর বেশিকিছু করে উঠতে পারেন নি; কেউই এ-সমস্যার কোনো কিনারা করে উঠতে পারেন নি, যতক্ষণ-না শেষপর্যন্ত দেখা দিয়েছেন মার্কস। মার্কসই এখন যে-প্রক্রিয়ার ফলে মুনাফার জন্ম হয় একেবারে তার জন্মস্থান পর্যন্ত প্রক্রিয়াটির অনুধাবন করেছেন এবং এর ফলে জলের মতো স্বচ্ছ করে তুলেছেন সবকিছু।

পুঁজির বিকাশের পথচিহ্ন অনুধাবন করতে গিয়ে মার্কস শুরু করেছেন এই সহজ-সরল ও কুখ্যাতরকমের সুস্পষ্ট ব্যাপারটি দিয়ে যে পুঁজিপতিরা তাদের পুঁজির মূল্য বাড়িয়ে তোলে বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে: অর্থাৎ, তারা নিজেদের অর্থ দিয়ে পণ্যদ্রব্য কেনে ও তারপর সেগুলি বিক্রি করে সেগুলির কেনা-দরের চেয়ে বেশি অর্থে। যেমন ধরুন, একজন পুঁজিপতি তুলো কিনল ১,০০০ টালার* দরে আর তারপর তা বিক্রি করল ১,১০০ টালারে, এইভাবে সে 'উপার্জন' করল ১০০ টালার। মূল পুঁজির ওপর এই-যে অতিরিক্ত ১০০ টালার, একেই মার্কস আখ্যা দিয়েছেন **উদ্বৃত্ত মূল্য**। তাহলে, এই উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎস কোথায়? অর্থশাস্ত্রীদের মেনে-নেয়া ধরতাই অনুসারে একমাত্র সম-মূল্যের মধ্যেই বিনিময় চলে, এবং বিমূর্ত তত্ত্বের ক্ষেত্রে এ-ব্যাপারটি অবশ্যই সঠিক। নিছক তত্ত্ব-অনুযায়ী বাজার থেকে তুলো কেনা ও ফের তা বিক্রি করার ফলে ততটুকুই মাত্র উদ্বৃত্ত মূল্য পাওয়া যেতে পারে, একটি রুপোর টালার ভাঙিয়ে ৩০টি রুপোর গ্রোশান করে ও ফের সেই খুচরো মুদ্রাগুলির বিনিময়ে একটি রুপোর টালার করে নিলে যতটুকু উদ্বৃত্ত মূল্য পাওয়া যায়। আসলে এ-প্রক্রিয়ায় কারো পক্ষেই বেশি বা কম অর্থবান হওয়ার কথা নয়। কিন্তু বিক্রেতারা আসল মূল্যের চেয়ে বেশি দরে পণ্যদ্রব্য বিক্রি করলে, অথবা ক্রেতারা আসল মূল্যের চেয়ে কম দরে তা কিনলে উদ্বৃত্ত মূল্য পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ, কেননা ওই ক্রয়-বিক্রয়কারীরা পালাক্রমে ক্রেতা ও বিক্রেতা হয় বলে সবকিছুই ফের ভারসাম্য ফিরে পায়, জমা-খরচ সমান হয়ে দাঁড়ায়। তেমনই ক্রেতা ও বিক্রেতারা পরস্পর পরস্পরকে দরদস্তুরে ঠকালেও উদ্বৃত্ত মূল্য পাওয়া যায় না, কেননা এর ফলে কোনো নতুন অথবা উদ্বৃত্ত মূল্যের সৃষ্টি হয় না, কেবল নিয়োজিত পুঁজিই পুঁজিপতিদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনে ভাগ হয়ে যায় এইমাত্র। পুঁজিপতি পণ্যদ্রব্যসমূহ সেগুলির নির্দিষ্ট মূল্যে কিনে নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রি করা সত্ত্বেও যে-মূল্য সে বিনিয়োগ করে তার চেয়ে বেশি মূল্য সে ফিরে পায়। এটা কেমন করে সম্ভব হয়?

বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে পণ্যের বাজারে পুঁজিপতি এমন **একটি পণ্যের** সন্ধান পেয়েছে যার অদ্ভুত এক বৈশিষ্ট্য হল এই যে তার

* ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত জার্মানির বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রচলিত রৌপ্যমুদ্রা। — সম্পাঃ

ব্যবহার থেকেই নতুন মূল্যের উৎপত্তি ঘটে, নতুন মূল্য সৃষ্টি হয়, আর এই পণ্যদ্রব্যটি হল **শ্রমশক্তি।**

শ্রমশক্তির মূল্য কী? প্রতিটি পণ্যদ্রব্যের মূল্যের পরিমাপ করা হয় তার উৎপাদনে কতখানি শ্রম-বিনিয়োগের প্রয়োজন পড়ে তা-ই দিয়ে। শ্রমশক্তির অস্তিত্ব থাকে জীবন্ত শ্রমিকের আকারে, আর এই শ্রমিকের নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার ও সেইসঙ্গে তার পরিবার-প্রতিপালনের জন্যে দরকার হয় জীবনধারণের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উপায়-উপকরণাদির। এটাই আবার তার মৃত্যুর পর শ্রমশক্তির ধারা অব্যাহত রাখার ব্যাপারটিকে নিশ্চিত করে। অতএব উপরোক্ত এই জীবনধারণের উপায়াদি উৎপাদনের পক্ষে প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ই শ্রমিকের শ্রমশক্তির মূল্য নিরূপণ করছে। পুঁজিপতি প্রতি সপ্তাহে মজুরির আকারে এই মূল্য দিচ্ছে শ্রমিককে, আর এর বিনিময়ে সে কিনে নিচ্ছে শ্রমিকের এক সপ্তাহের শ্রমের কার্যকরতা। এই পর্যন্ত শ্রমশক্তির মূল্যের ব্যাপারে অর্থশাস্ত্রী মহোদয়গণ আমাদের সঙ্গে অনেকখানিই একমত হবেন।

ধরা যাক, জনেক পুঁজিপতি তার শ্রমিককে কাজে নিযুক্ত করল। সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে শ্রমিকটি ততখানিই শ্রম-বিনিয়োগ করল তার সাপ্তাহিক মজুরি যতখানি শ্রমের তুল্যমূল্য। যদি ধরা যায় যে একজন শ্রমিকের সাপ্তাহিক মজুরি তার তিনটি কাজের দিনের তুল্যমূল্য, তাহলে শ্রমিকটি সোমবার থেকে কাজ শুরু করলে বলতে হয় বুধবার সন্ধ্যা নাগাদ সে পুঁজিপতিকে **তার প্রাপ্য মজুরির পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করে দিয়েছে।** কিন্তু এরপর কি সে কাজ বন্ধ করে দিচ্ছে? মোটেই নয়। পুঁজিপতি তার **সারা সপ্তাহের** শ্রম কিনে নিয়েছে, তাই শ্রমিককে ওই সপ্তাহের বাকি তিনটি কাজের দিনও কাজ করে যেতে হবে। শ্রমিকটির প্রাপ্য মজুরি পরিশোধের জন্যে যে-সময়টুকু কাজ করা দরকার তার ওপরে তার এই **উদ্বৃত্ত শ্রমই** হল গিয়ে **উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎস,** মুনাফার উৎস, পুঁজির নিয়মিত ক্রমবৃদ্ধির উৎস।

শ্রমিক-যে সপ্তাহের তিনদিন মাত্র কাজ করে তার প্রাপ্ত মজুরি পরিশোধ করে দেয় এবং বাকি তিনদিন পুঁজিপতির স্বার্থে বেগার খাটে—এটা একটা খামখেয়াল-মাফিক অনুমানমাত্র এ-কথা বলবেন না। শ্রমিক তার প্রাপ্য মজুরি

পরিশোধ করতে ঠিক-ঠিক তিনদিন সময় নেয়, নাকি দু'দিন অথবা চারদিন সময় নেয়, এ-ব্যাপারটা সত্যি বলতে কী একেবারেই এখানে গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং অবস্থা হিসেবে এই দিন-গুনতির হেরফেরও হয়ে থাকে। এখানে প্রধান ব্যাপার হল এই যে পুঁজিপতি যে-পরিমাণ শ্রমের জন্যে মজুরি দিয়ে থাকে তা ছাড়াও যে-শ্রমের জন্যে সে **মজুরি দেয় নি** তা-ও আদায় করে নেয়। আর এটা কোনো খামখেয়াল-মাফিক অনুমান নয়, কেননা শেষপর্যন্ত যেদিন পুঁজিপতি শ্রমিককে যে-পরিমাণ মজুরি দিয়েছে কেবলমাত্র সেই পরিমাণে শ্রম শ্রমিকের কাছ থেকে আদায় করতে শুরু করবে, সেইদিনই তাকে কারখানা বন্ধ করে দিতে হবে, কারণ তার সমগ্র মুনাফা শূন্যের অঙ্কে পরিণত হবে সেইদিন।

এইখানেই পূর্বোক্ত সকল বৈপরীত্যের সমস্যার সমাধান পেয়ে যাচ্ছি আমরা। উদ্বৃত্ত মূল্যের (পুঁজিপতিদের মুনাফা যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ) উৎস এখন একেবারে স্পষ্ট ও স্বাভাবিক বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। শ্রমশক্তির মূল্য মজুরিতে দেয়া হচ্ছে বটে, কিন্তু পুঁজিপতি শ্রমিকের শ্রমশক্তির কাছ থেকে যে-মূল্য আদায় করে নিতে সক্ষম হচ্ছে উপরোক্ত ওই শ্রমশক্তির মজুরিভিত্তিক মূল্য তার তুলনায় বহুগুণে কম, আর এই পার্থক্যটুকুই — এই **মজুরি-ফাঁকি-দেয়া শ্রমই** — পুঁজিপতির, অথবা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে সমগ্র পুঁজিপতি শ্রেণীর, বখরার অংশ। কেননা, এর আগের উদাহরণে তুলো-ব্যবসায়ীর তুলো বেচে যে-মুনাফা করার কথা বলা হয়েছে, যদি বাজারে তুলোর দর না-চড়ে থাকে তাহলে এমনকি সেই মুনাফাও মজুরি-ফাঁকি-দেয়া শ্রমের মূল্য হতে বাধ্য। ব্যবসায়ীটি যখন কোনো সুতীবস্ত্রের কারখানা-মালিকের কাছে তুলো বিক্রি করছে (ওই কারখানা-মালিক অবশ্য পূর্বোক্ত ১০০ টালার মুনাফা ছাড়াও তার কারখানায় উৎপন্ন বস্ত্রের দৌলতে নিজে আরও বহুগুণ মুনাফা লুটবে) তখন বলতে হয় ব্যবসায়ীটি ওই কারখানা-মালিকের সঙ্গে তার কুক্ষিগত মজুরি-ফাঁকি-দেয়া শ্রমের মূল্য ভাগ করে নিচ্ছে। সাধারণভাবে এই মজুরি-ফাঁকি-দেয়া শ্রমই সমাজের সকল অ-শ্রমজীবী মানুষের ভরণপোষণের জন্যে দায়ী। পুঁজিপতি শ্রেণী যে-রাষ্ট্রীয় ও মিউনিসিপ্যাল কর দিয়ে থাকে এবং ভূস্বামী ইত্যাদি যে-জমির খাজনা দেয় তা দেয়া হয় এই মজুরি-ফাঁকি-দেয়া শ্রম থেকেই। গোটা

বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থাই এই ভিত্তির ওপর নির্ভর করে দাঁড়িয়ে আছে।

অবশ্য এটা মনে করা ভুল হবে যে এই মজুরি-ফাঁকি-দেয়া শ্রম আত্মসাতের উদ্ভব ঘটেছে একমাত্র বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার আওতায়, যেখানে উৎপাদনের কাজ চলে একদিকে পুঁজিপতি ও অপরদিকে মজুরিনির্ভর শ্রমিকদের সাহায্যে। ব্যাপারটা মোটেই তা নয়, সর্বকালেই উৎপীড়িত শ্রেণীকে মজুরি-ফাঁকি-দেয়া শ্রম স্বীকার করতে হয়েছে। ক্রীতদাসত্ব যখন শ্রম-সংগঠনের প্রচলিত রীতি ছিল সেই গোটা সুদীর্ঘ কাল জুড়ে ক্রীতদাসদের জীবনধারণের উপায়-উপকরণ হিসেবে তাদের যা পরিশোধ করা হোত তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি শ্রমদান করতে হোত তাদের। ভূমিদাস-প্রথার আমলেও অবস্থা ছিল একই রকম এবং এ-অবস্থা বজায় ছিল একেবারে কৃষকদের বাধ্যতামূলক বেগার খাটার প্রথা বিলোপের সময় পর্যন্ত। তখন কৃষকের নিজস্ব জীবিকা-অর্জনের জন্যে কাজ ও সামন্ত-প্রভুর জন্যে অতিরিক্ত বা উদ্বৃত্ত শ্রমদানের সময়ের মধ্যে কার্যত একটি পার্থক্য রীতিমতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কারণ এই দ্বিতীয় ধরনের কাজটি তখন করা হোত প্রথম ধরনের কাজ থেকে পৃথকভাবে। এই ধরনটির এখন বদল ঘটেছে বটে, কিন্তু এই ব্যাপারটির অন্তঃসার থেকে গেছে এখনও এবং তা থেকেও যাবে ততদিন যতদিন 'সমাজের একটি অংশ উৎপাদনের উপায়-উপকরণের ওপর একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখছে, স্বাধীন হোক বা না-হোক শ্রমিক যতক্ষণ তার নিজের জীবনধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় কাজের সময়ের সঙ্গে অতিরিক্ত কাজের সময় জুড়ে নিতে বাধ্য হচ্ছে যাতে সে উৎপাদনের উপায়-উপকরণের মালিকদের জন্যেও ভরণপোষণের উপায়াদি উৎপাদনে সমর্থ হয়' (মার্কস, পৃষ্ঠা ২০২)।*

২

উপরোক্ত প্রবন্ধে আমরা দেখেছি যে পুঁজিপতির কাজে নিযুক্ত প্রতিটি শ্রমিক দু'ধরনের শ্রম-বিনিয়োগ করে থাকে: তার শ্রম-সময়ের একটি অংশে পুঁজিপতির দেয়া মজুরি পরিশোধের জন্যে কাজ করে থাকে সে, আর

* কার্ল মার্কস, 'পুঁজি', প্রথম খণ্ড, মস্কো, ১৯৫৪ সাল, পৃষ্ঠা ২৩৫। — সম্পাঃ

তার শ্রমের এই অংশটিকে মার্কস আখ্যা দিয়েছেন **আবশ্যিক শ্রম** বলে। কিন্তু এরপরও তাকে কাজ করে যেতে হয় এবং এই অতিরিক্ত কাজের সময়ে পুঁজিপতির স্বার্থে সে উৎপাদন করে **উদ্বৃত্ত মূল্য,** যার একটি প্রধান অংশ হল পুঁজিপতির মুনাফা। শ্রমের এই শেষোক্ত অংশটিকে বলে হয় **উদ্বৃত্ত শ্রম।**

ধরা যাক, একজন শ্রমিক সপ্তাহের তিনদিন কাজ করছে তার মজুরি পরিশোধের জন্যে আর বাকি তিনদিন পুঁজিপতির স্বার্থে উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎপাদনে। এটাকে অন্যভাবে বিচার করলে বলা যায় যে এর অর্থ হল, কাজের দিন যদি বারো ঘণ্টাব্যাপী হয় তাহলে শ্রমিকটি প্রতিদিন ছয় ঘণ্টা কাজ করে মজুরি-পরিশোধের জন্যে আর বাকি ছয় ঘণ্টা উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎপাদনে। এখন, সপ্তাহে কাজের জন্যে মাত্র ছয়টি দিনই পাওয়া যেতে পারে, কিংবা রবিবারকেও কাজের দিন হিসেবে গণ্য করলে বড় জোর পাওয়া যেতে পারে সাতটি দিন, কিন্তু প্রতিটি কাজের দিন থেকে বের করে নেয়া চলে ছয়, আট, দশ, বারো, পনেরো বা তারও বেশি কাজের ঘণ্টা। শ্রমিক পুঁজিপতির কাছে তার প্রতিদিনের মজুরির বিনিময়ে একেকটি কাজের দিন বিক্রি করে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, **শ্রমদিন বলতে কী বোঝায়?** আট ঘণ্টার কাজ, না আঠারো ঘণ্টার?

পুঁজিপতির স্বার্থ হচ্ছে একেকটি শ্রমদিনকে টেনে যথাসম্ভব লম্বা করা। কারণ, শ্রমদিন যত লম্বা হবে তত বেশি তা উৎপাদন করবে উদ্বৃত্ত মূল্য। আবার শ্রমিকও সঠিকভাবে অনুভব করে যে তার মজুরি-পরিশোধের জন্যে প্রয়োজনীয় কাজের ঘণ্টার অতিরিক্ত প্রতিটি কাজের ঘণ্টার ফল অন্যায়ভাবে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে; অতিরিক্ত এই ঘণ্টাগুলিতে কাজ করার অর্থ যে কী তা সে নিজস্ব তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই টের পায়। ফলে পুঁজিপতি যেমন লড়াই করে তার মুনাফার জন্যে, তেমনই শ্রমিকও লড়াই করে চলে তার স্বাস্থ্যের জন্যে, প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা বিশ্রামের অবকাশের জন্যে, যাতে কাজ, খাওয়াদাওয়া আর ঘুমনো ছাড়া অন্যান্য মানবিক ক্রিয়াকলাপে সে রত হতে পারে তার জন্যেও। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের সঙ্গে লড়াইয়ে নামতে চায় কি চায় না এটা মোটেই ব্যক্তিগতভাবে অমুক বা তমুক পুঁজিপতির সদিচ্ছার

ওপর নির্ভর করে না, কারণ পুঁজিপতিদের মধ্যে পরস্পর-প্রতিযোগিতা তাদের মধ্যে এমনকি সবচেয়ে হিতৈষী সদাশয় ব্যক্তিদেরও বাধ্য করে সমধর্মীদের সঙ্গে হাত মেলাতে এবং কাজের সময়কে টেনে অপরাপর কারখানার সমান করে তোলাটাকেই নিয়ম হিসেবে গ্রহণ করতে।

শ্রমদিনের দৈর্ঘ্য বেঁধে দেয়ার সংগ্রাম ইতিহাসের মঞ্চে স্বাধীন শ্রমিকদের প্রথম আবির্ভাবের ক্ষণটি থেকে আজকের দিন পর্যন্ত সমানে চলছে। নানা ধরনের পেশার ক্ষেত্রে নানা ধরনের ঐতিহ্যসিদ্ধ শ্রমদিনের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু বাস্তবে খুব কম ক্ষেত্রেই সেই ঐতিহ্য মেনে চলা হয়। একমাত্র যেখানে দেশের আইন শ্রমদিনের দৈর্ঘ্য বেঁধে দিয়েছে এবং তা পালিত হচ্ছে কিনা সেটা পরিদর্শনের ব্যবস্থা আছে সেখানেই সত্যি-সত্যি বলতে পারা যায় যে স্বাভাবিক শ্রমদিনের অস্তিত্ব আছে। এবং এখনও পর্যন্ত এই ব্যবস্থা একমাত্র চালু আছে ইংলণ্ডের ফ্যাক্টরি-এলাকাগুলিতেই। এই এলাকায় সকল স্ত্রীলোক এবং তেরো থেকে আঠারো বছর বয়সের মধ্যে সকল কিশোর শ্রমিকের জন্যে দশ ঘণ্টার শ্রমদিন (পাঁচদিন সাড়ে-দশ ঘণ্টার ও শনিবার সাড়ে-সাত ঘণ্টার শ্রমদিন) নির্দিষ্ট আছে, এবং যেহেতু পুরুষ-শ্রমিকরা পূর্বোক্তদের সাহায্য ছাড়া কাজ করতে পারে না তাই তাদের জন্যেও নির্দিষ্ট হয়েছে ওই দশ ঘণ্টার শ্রমদিন। ইংরেজ ফ্যাক্টরি-শ্রমিকদের পক্ষে এই আইন পাশ করানো সম্ভব হয়েছে বছরের-পর-বছর অসীম সহ্যশক্তি প্রদর্শনের ফলে, ফ্যাক্টরি-মালিকদের বিরুদ্ধে একটানা, নাছোড়বান্দা, অনমনীয় লড়াই চালানোর দৌলতে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার এবং সঙ্ঘ ও সভা-সমিতি সংগঠনের অধিকারের সুযোগ গ্রহণ করে, এবং সেইসঙ্গে শাসক-শ্রেণীর মধ্যেকার বিভেদগুলিকে কৌশলে কাজে লাগিয়ে। এই আইন হয়ে দাঁড়িয়েছে ইংরেজ শ্রমিকদের রক্ষাকবচস্বরূপ, ক্রমশ এর কার্যকরতা বিস্তৃত হয়েছে শিল্পের সকল গুরুত্বপূর্ণ শাখাগুলিতে এবং গত বছর তো এটি **সকল পেশার শিল্পের ক্ষেত্রেই** বিস্তৃত হয়েছে — অন্তত্যপক্ষে যে-সমস্ত পেশায় স্ত্রীলোক ও শিশুদের কাজে নিযুক্ত করা হয় সেগুলির ক্ষেত্রে তো বটেই। আমাদের আলোচ্য বইটিতে ইংলণ্ডে শ্রমদিনের এই আইনগত নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার ইতিহাস সম্পর্কে একেবারে পূর্ণাঙ্গ তথ্যাদির সমাবেশ ঘটেছে। উত্তর জার্মান রাইখস্টাগেরও পরবর্তী অধিবেশনে ফ্যাক্টরি-সংক্রান্ত আইনকানুন

নিয়ে আলোচনা হতে চলেছে। বলা বাহুল্য, সেই সময়ে ফ্যাক্টরির শ্রম-নিয়ন্ত্রণ নিয়েও আলোচনা হবে। আমরা আশা করি যে জার্মান শ্রমিকদের ভোটে নির্বাচিত জন-প্রতিনিধিদের কেউই আগে **মার্কসের** লেখা আলোচ্য বইখানি সম্বন্ধে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল না-হয়ে উপরোক্ত প্রস্তাবিত এই আইনের খসড়াটির আলোচনায় নামবেন না। মনে রাখবেন, **এক্ষেত্রে অনেক-কিছু অর্জন করার আছে।** জার্মানিকে শাসক-শ্রেণীগুলির মধ্যেকার ভেদ-বিভেদগুলি ইংলন্ডের শাসক-শ্রেণীগুলির ওই ভেদ-বিভেদের চেয়ে শ্রমিকদের পক্ষে বেশি অনুকূল, ইংলন্ডের ক্ষেত্রে এত অনুকূল অবস্থা কখনও ছিল না এবং এখনও নেই। এর কারণ আর কিছুই নয়, **সর্বজনীন ভোটাধিকার শাসক-শ্রেণীগুলিকে বাধ্য করছে শ্রমিকদের কাছ থেকে আনুকূল্যের প্রত্যাশী হতে।** এই পরিস্থিতিতে প্রলেতারিয়েতের চার-পাঁচজন প্রতিনিধিই রীতিমতো **একটি শক্তি** হয়ে দাঁড়াতে পারে, যদি অবশ্য তাঁরা জানেন তাঁদের এই বিশেষ অবস্থানকে কীভাবে কাজে লাগাতে হবে, সবচেয়ে বেশি করে যদি তাঁরা জানেন যে আলোচ্য আইনে বিতর্কের বিষয়টি কী,—কেননা এই বিষয়টি বুর্জোয়াদের জানা নেই। আর এ-কাজে মার্কসের এই বই তাঁদের হাতে-হাতে সবকিছু তথ্যের যোগান দিতে সমর্থ।

অতঃপর আমরা অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ তত্ত্বগত বিষয় নিয়ে আরও বেশ কয়েকটি ভারি চমৎকার পর্যালোচনার আলোচনায় না-থেমে সেগুলির পাশ কাটিয়ে এসে থামছি একেবারে বইখানির শেষ পরিচ্ছেদে। এই পরিচ্ছেদে পুঁজির সঞ্চয়-সংগ্রহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানেই প্রথম দেখানো হয়েছে যে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি, অর্থাৎ যে-পদ্ধতি কার্যকর করে তোলে একদিকে পুঁজিপতিরা ও অপরদিকে মজুরিনির্ভর-শ্রমিকরা, তা কেবল-যে অনবরত পুঁজিপতির স্বার্থে তার পুঁজি নতুন করে উৎপন্ন করে চলে তা-ই নয়, একই সঙ্গে তা অনবরত নতুন করে উৎপাদন করে শ্রমিকদের দারিদ্র্যও। এবং এর ফলে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয় যাতে সব সময়েই একদিকে অস্তিত্ব থাকে সকল জীবিকা, শিল্পোৎপাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় সকল কাঁচামাল ও শ্রমের সকল হাতিয়ারের একচেটিয়া মালিক নতুন-নতুন যতসব পুঁজিপতির এবং অপরদিকে অস্তিত্ব থাকে বিপুল-সংখ্যক শ্রমিকের, যারা বাধ্য হয় পূর্বোক্ত ওই পুঁজিপতিদের কাছে এমন

একটা অর্থের বিনিময়ে তাদের শ্রমশক্তি বিক্রি করতে যে-অর্থে সংগৃহীত জীবনধারণের উপায়াদি বড়জোর তাদের কর্মক্ষম অবস্থায় টিকিয়ে রাখার ও কর্মক্ষম প্রলেতারিয়েতের একটি নতুন প্রজন্মের লালনের পক্ষে উপযোগী। কিন্তু এই পদ্ধতির ফলে পুঁজি কেবল নিছক পুনরুৎপাদিতই হয় না, তা অনবরত বৃদ্ধি পেয়ে বিপুল থেকে বিপুলতর পরিমাণ হয়ে চলে এবং এর ফলে সম্পত্তিহীন শ্রমিক শ্রেণীর ওপর তা ক্ষমতাবিস্তার করে। এবং একদিকে পুঁজি যেমন ক্রমশ বেশি-বেশি মাত্রায়, ব্যাপকভাবে নিজের পুনরুৎপাদন করে চলে, তেমনই অপরদিকে আধুনিক পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা ক্রমশ ব্যাপকহারে ও বেশি-বেশি সংখ্যায় পুনরুৎপাদন করে চলে সম্পত্তিহীন শ্রমিক শ্রেণীরও। '...পুঁজির সঞ্চয় ক্রমবর্ধমান হারে পুঁজি-সম্পর্কের পুনরুৎপাদন ঘটায়, এক মেরুতে জমে ওঠে বেশি-বেশি সংখ্যায় বা ক্রমশ বড় থেকে বড় পুঁজিপতি এবং অপর মেরুতে জমে ওঠে ক্রমশ বেশি-বেশি মজুরিনির্ভর-শ্রমিক।... **পুঁজির সঞ্চয়-সংগ্রহের অর্থ তাই প্রলেতারিয়েতের সংখ্যাবৃদ্ধি'** (পৃষ্ঠা ৬০০)।* অবশ্য যন্ত্রপাতির উন্নতি, উন্নত কৃষি-ব্যবস্থা, ইত্যাদির কারণে যেহেতু একই পরিমাণ পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের জন্যে ক্রমশ কম থেকে কম শ্রমিকের প্রয়োজন হয়, যেহেতু ক্রমশ নিখুঁত হয়ে-ওঠা এই ব্যবস্থা, অর্থাৎ শ্রমিকদের ক্রমশ বাড়তি ও অপ্রয়োজনীয় করে তোলার এই ব্যবস্থা, ক্রমবর্ধমান পুঁজির পরিমাণের চেয়েও দ্রুত বেড়ে ওঠে, সেইহেতু ক্রমবর্ধমান সংখ্যক শ্রমিকের কী অবস্থা দাঁড়ায় তাহলে?—এই শ্রমিকরা হয়ে দাঁড়ায় শিল্পের অতিরিক্ত সংরক্ষিত বাহিনী, ব্যবসায়ের অবস্থা খারাপ কিংবা মাঝামাঝি হলে এই বাহিনীর শ্রমিকদের মজুরি দেয়া হয় তাদের শ্রমের মূল্যের চেয়ে **কম হারে** এবং কাজে নিয়োগ করা হয় অনিয়মিতভাবে, কিংবা জনসাধারণের দয়ার দানের ওপর ছেড়ে রাখা হয় তাদের, কিন্তু যখন ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষরকম চাঙ্গা হয়ে ওঠে—যেমন, এখন ইংলণ্ডে যে-অবস্থাটা স্পষ্ট প্রতীয়মান—তখন এরাই পুঁজিপতিদের কাছে অপরিহার্য হয়ে ওঠে। তবে **সকল অবস্থাতেই** নিয়মিতভাবে নিযুক্ত শ্রমিকদের প্রতিরোধ

---

* কার্ল মার্কস, 'পুঁজি', প্রথম খণ্ড, মস্কো, ১৯৫৪ সাল, পৃষ্ঠা ৬১৩-৬১৪।—সম্পাঃ

চূর্ণ করতে ও তাদের মজুরির হার নিচু করে রাখতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এই অতিরিক্ত শ্রমিকদের বাহিনী। 'সামাজিক সম্পদ যত বৃদ্ধি পায়... তত বেড়ে চলে আপেক্ষিক এই অতিরিক্ত জনসংখ্যা, অথবা শিল্পের এই অতিরিক্ত সংরক্ষিত বাহিনী। কিন্তু সক্রিয় (বা নিয়মিতভাবে নিযুক্ত) শ্রমিক-বাহিনীর অনুপাতে এই সংরক্ষিত বাহিনীর জনসংখ্যা যত বৃদ্ধি পায়, তত বৃদ্ধি পায় সংহত (বা স্থায়ী) অতিরিক্ত জনসংখ্যা, অথবা শ্রমিকদের বিভিন্ন স্তরের মানুষ, আর এদের শ্রমের যন্ত্রণার বিপরীত অনুপাতে বেড়ে চলে এদের দুঃখদুর্দশা। পরিশেষে, শ্রমিক শ্রেণীর ভিক্ষাজীবী স্তরগুলি ও শিল্পের অতিরিক্ত সংরক্ষিত বাহিনী যত বহুব্যাপক হয়ে ওঠে, সরকারি নিঃস্বতাও তত বেড়ে ওঠে। **পুঁজিতান্ত্রিক সঞ্চয়ের এই-ই হল একান্ত সাধারণ নিয়ম'** (পৃষ্ঠা ৬৩১)।*

কড়াকড়ি বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণিত এই সমস্ত সিদ্ধান্ত (প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত অর্থশাস্ত্রীরা বিশেষরকম সতর্ক থাকেন এই সমস্ত সিদ্ধান্ত খণ্ডনের এমনকি চেষ্টামাত্রও না করার ব্যাপারে) হল আধুনিক, পুঁজিতান্ত্রিক, সমাজ-ব্যবস্থার প্রধান-প্রধান নিয়মের কয়েকটি। কিন্তু এতেই কি পুরো কাহিনী বলা হয়ে গেল? মোটেই না। পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার মন্দ দিকগুলি তীব্রভাবে প্রকট করে তুলেছেন মার্কস, আবার একই রকম জোরালো ও স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছেন যে এই সমাজ-ব্যবস্থাটির প্রয়োজন ছিল সমাজের উৎপাদনী শক্তিগুলিকে বিকশিত করে তুলে এমন একটা স্তরে উন্নীত করার জন্যে যার ফলে সমাজের **সকল** সদস্যের পক্ষে মানুষের যোগ্য সমান বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠবে। সমাজের এর পূর্ববর্তী সকল ধরনই উপরোক্ত এই বিকাশের পক্ষে অনুপযুক্ত বা অতিরিক্ত দরিদ্র অবস্থায় ছিল। পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনই প্রথম এই বিকাশের পক্ষে প্রয়োজনীয় সম্পদ ও উৎপাদনী শক্তিসমূহ সৃষ্টি করে, আবার ওই একই সঙ্গে বিপুল-সংখ্যক ও নিপীড়িত শ্রমিকদের তা সৃষ্টি করে সেই সামাজিক শ্রেণী হিসেবে—যে-শ্রেণী ক্রমশ বেশি-বেশি বাধ্য হয় ওই সামাজিক সম্পদ

---

* কার্ল মার্কস, 'পুঁজি', প্রথম খণ্ড, মস্কো, ১৯৫৪ সাল, পৃষ্ঠা ৬৪৪। — সম্পাঃ

ও উৎপাদনী শক্তিসমূহের মালিকানা ছিনিয়ে নিতে যাতে সেগুলি বর্তমানে একচেটিয়া শ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় যেভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তা না হয়ে ব্যবহৃত হতে পারে সমগ্র সমাজের উপকারার্থে।

১৮৬৮ সালের ২ থেকে
১৩ মার্চের মধ্যে
এঙ্গেলসের লেখা

Demokratisches Wochenblatt
পত্রিকার ১২ ও ১৩ সংখ্যায়,
১৮৬৮ সালের ২১ ও ২৮ মার্চ
তারিখে প্রকাশিত

পত্রিকার পাঠ
অনুযায়ী মুদ্রিত

পাণ্ডুলিপি জার্মান
ভাষায় লিখিত

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

'পুঁজি' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা থেকে

উদ্বৃত্ত মূল্য সম্বন্ধে মার্কস তাহলে এমন কী বলেছেন যা নতুন কথা? এটা কেমন করে সম্ভব হল যে উদ্বৃত্ত মূল্য সম্বন্ধে মার্কসের তত্ত্ব বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো আসল জায়গায় গিয়ে ঘা দিল এবং তা আবার সকল সভ্য দেশেই, আর তাঁর সকল সমাজতন্ত্রী পূর্বসূরীর — এমনকি রড্‌বের্টুস-এরও — তত্ত্বগুলি কোনো চিহ্ন না-রেখে একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গেল?

এই ঘটনাটি ব্যাখ্যা করা চলে রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস থেকে একটি উদাহরণ দিয়ে।

গত শতাব্দীর প্রায় শেষপর্যন্ত ফ্লজিস্টন (প্রদাহ)-সম্পর্কিত তত্ত্বটি-যে সর্বস্বীকৃত ছিল একথা আমরা জানি। এই তত্ত্ব-অনুযায়ী, সকল অগ্নিসংযোগ বা দহনের মূল কথা হল যে-কোনো জ্বলন্ত বস্তু থেকে অপর একটি কল্পিত পদার্থ, একটি পুরোপুরি দাহ্য পদার্থ ফ্লজিস্টনের পৃথকীভবন-প্রক্রিয়া। সেকালে পরিচিত প্রায় সব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা হিসেবে এই তত্ত্বটিকে তখন যথেষ্ট বলে মনে করা হোত, যদিও বহুক্ষেত্রেই এটিকে কাজে লাগাতে হোত জোর করেই। অতঃপর ১৭৭৪ সালে প্রিস্টলে এমন এক ধরনের বায়ু উৎপাদন করলেন 'যা এত বিশুদ্ধ, ফ্লজিস্টন থেকে এত মুক্ত অবস্থায় পেলেন তিনি যে সাধারণ হাওয়াকে তার তুলনায় ভেজাল-মেশানো বলে বোধ হল'। তিনি এর নাম দিলেন ফ্লজিস্টন-মুক্ত বায়ু। তাঁর এই আবিষ্কারের অল্প কিছু পরে সুইডেনে শেলেও একই ধরনের বায়ু আবিষ্কার করলেন এবং আবহাওয়ায় তার উপস্থিতিও লোকসমক্ষে পরীক্ষা করে দেখালেন। তিনি আরও দেখতে পেলেন যে এই বায়ুর মধ্যে কিংবা

এমনিতে সাধারণ হাওয়ার মধ্যে যখনই কোনো বস্তু পোড়ানো হয় তখনই এই বায়ু অন্তর্ধান করে। শেলে তাই এর নাম দিলেন অগ্নিবায়ু।

'এই তথ্যগুলি থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে বাতাসের একটি উপাদানের সঙ্গে ফ্লজিস্টনের সংমিশ্রণের ফলে (অর্থাৎ, দহনক্রিয়ার ফলে) যে-যৌগিক পদার্থ বা যোগের উদ্ভব ঘটে তা আগুন অথবা উত্তাপ ব্যতীত অন্য কিছু নয় এবং তা কাচের মধ্যে দিয়ে বহির্গত হয়।'*

প্রিস্টলে ও শেলে আসলে যা উৎপাদন করেছিলেন তা হল অক্সিজেন গ্যাস, কিন্তু এটি-যে কী পদার্থ তা তাঁরা জানতেন না। তাঁরা 'গ্যাসটি আবিষ্কার করা সত্ত্বেও আটকে রইলেন' ফ্লজিস্টন-সংক্রান্ত 'তত্ত্বের ধ্যানধারণার বেড়াজালে।' যা নাকি পরে ফ্লজিস্টন-সংক্রান্ত গোটা ধারণাটিকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল এবং রসায়নশাস্ত্রে বিপ্লব এনেছিল সেই মৌল উপাদানটি তাঁদের হাতে ভবিষ্যৎহীন ও বন্ধ্যা হয়ে রইল। কিন্তু গ্যাসটি আবিষ্কারের পরই প্রিস্টলে তাঁর এই আবিষ্কারের খবর জানিয়েছিলেন প্যারিসে লাভোয়াজিয়ে-কে, আর লাভোয়াজিয়ে এই নতুন তথ্যের ভিত্তিতে তখন পরীক্ষা শুরু করলেন ফ্লজিস্টন-সংক্রান্ত গোটা রসায়নশাস্ত্র নিয়েই। তিনিই প্রথম আবিষ্কার করলেন যে এই নতুন ধরনের বায়ু আসলে একটি নতুন রাসায়নিক মৌল উপাদান এবং দহনক্রিয়ার সময়ে যা ঘটে তা হল জ্বলন্ত বস্তুটি থেকে রহস্যময় ফ্লজিস্টনের অন্তর্ধান **নয়**, জ্বলন্ত বস্তুটির সঙ্গে এই নতুন মৌল উপাদানের **সংযোগ**। এইভাবে লাভোয়াজিয়েই প্রথম গোটা রসায়নশাস্ত্রকে তার পায়ের ওপর দাঁড় করালেন, যা নাকি তার আগে দাঁড়িয়ে ছিল উলটোমুখে মাথায় ভর দিয়ে তার ফ্লজিস্টন-সংক্রান্ত তত্ত্বের ভিত্তিতে। এবং যদিও তিনি প্রথমোক্ত দুই বিজ্ঞানীর সমসময়ে ও তাঁদের থেকে পৃথক ও স্বাধীনভাবে অক্সিজেন উৎপাদনে সমর্থ হন নি (যদিও পরে তিনি তাই-ই দাবি করেছেন), তবু তৎসত্ত্বেও তাঁরা দু'জন নন, লাভোয়াজিয়েই ছিলেন অক্সিজেনের সত্যিকার **আবিষ্কর্তা**। বাকি দু'জন অক্সিজেন নিছক **উৎপাদনই করেছিলেন**, কিন্তু কী-যে তাঁরা উৎপাদন করেছিলেন সে-সম্বন্ধে কোনো ধারণাই তাঁদের ছিল না।

---

* Roscoe und Schorlemmer, 'Ausführliches Lehrbuch der Chemie'. Braunschweig, 1877, I, S. 13, 18.

প্রিস্টলে ও শেলের তুলনায় লাভোয়াজিয়ে-র অবস্থান যা ছিল, উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্বের ব্যাপারে পূর্বসূরীদের তুলনায় মার্কসের অবস্থানও ছিল তা-ই। কোনো শিল্পোৎপাদের মূল্যের যে-অংশকে আমরা এখন উদ্বৃত্ত মূল্য বলে থাকি তার **অস্তিত্ব** মার্কসের বহু পূর্বেই নিরূপিত হয়েছিল। এই শেষোক্ত মূল্যের উপাদান-যে কী, তা-ও কম-বেশি স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল ইতিপূর্বেই। অর্থাৎ, বলা হয়েছিল যে ওই উপাদান হচ্ছে শ্রমের সেই উৎপাদ, যার জন্যে উৎপাদের আত্মসাৎকারী তার সমান মূল্যের কোনো অর্থ মজুরি হিসেবে দেয় নি। কিন্তু তখন এর বেশি আর কেউ এগোতে পারেন নি। তাঁদের মধ্যে একটি গোষ্ঠী — ধ্রুপদী বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রীরা — বড় জোর অনুসন্ধান করেছিলেন শ্রমের উৎপাদ শ্রমিক ও উৎপাদনের উপায়-উপকরণের মালিকের মধ্যে কী অনুপাতে ভাগ-বাঁটোয়ারা হয় শুধুমাত্র সেই ব্যাপারটা নিয়ে। এছাড়া অপর গোষ্ঠীটি — অর্থাৎ, সমাজতন্ত্রীরা — এই বাঁটোয়ারাকে অন্যায্য বিবেচনা করে এই অন্যায় দূরীকরণের মনগড়া কাল্পনিক উপায়াদি উদ্ভাবনের চেষ্টায় মেতেছিলেন। আর এই উভয় গোষ্ঠীই বন্দী হয়ে রয়ে গেলেন তাঁদের পূর্বসূরীদের কাছ-থেকে-পাওয়া অর্থনৈতিক ধ্যানধারণায় বেড়াজালে।

এই পটভূমিতে এগিয়ে এলেন মার্কস। আর তিনি অগ্রসর হলেন তাঁর সকল পূর্বসূরির প্রত্যক্ষ বিরোধী মত পোষণ করে। ওই পূর্বসূরীরা যেখানে **সমাধানের** সন্ধান পেয়েছিলেন সেখানে তিনি সন্ধান পেলেন কেবলমাত্র **সমস্যার**। তিনি দেখলেন যে ফ্লজিস্টন-মুক্ত বায়ুর অস্তিত্ব নেই, অস্তিত্ব নেই অগ্নিবায়ুরও, আছে শুধু অক্সিজেন; তিনি বুঝলেন যে ব্যাপারটা এক্ষেত্রে নিছক একটি অর্থনৈতিক ঘটনাকে লক্ষ্য করা ও লিপিবদ্ধ করায় সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না, কিংবা তা সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না ওই ঘটনার সঙ্গে চিরন্তন ন্যায়বিচার ও সত্যিকার নৈতিকতার সংঘর্ষের পর্যালোচনায়, আসলে ব্যাপারটা হল এমন একটি তথ্যের আবিষ্কার যা গোটা অর্থশাস্ত্রের ক্ষেত্রেই বিপ্লব এনে দিতে বাধ্য এবং যা সকল পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের মর্মকথার চাবিকাঠি; অবশ্য এটা তাঁর পক্ষেই সত্য, যিনি এই চাবিকাঠি ব্যবহার করতে শিখবেন। এই তথ্যটিকে সূচনা-বিন্দু হিসেবে ধরে মার্কস তাঁর হাতের কাছে লভ্য অর্থশাস্ত্রের গোটা বিন্যাসকেই পরীক্ষা করে দেখলেন, ঠিক

যেমন ভাবে লাভোয়াজিয়ে অক্সিজেনকে সূচনা-বিন্দু হিসেবে ধরে হাতের কাছে লভ্য ফ্লজিস্টন-সংক্রান্ত রসায়নশাস্ত্রের সকল সিদ্ধান্তকে দেখেছিলেন পরীক্ষা করে। উদ্বৃত্ত মূল্য পদার্থটি কী তা জানার জন্যে মার্কসকে প্রথমে জানতে হয়েছে মূল্য পদার্থটি কী। মূল্য-সংক্রান্ত খোদ রিকার্ডো-র তত্ত্বটিকেই এর জন্যে তাঁকে সমালোচনার অধীনে আনতে হয়েছে। এইভাবে মার্কস শ্রম বস্তুটির পর্যালোচনা করেছেন তার মূল্য উৎপাদনকারী বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে, এবং তিনিই প্রথম দৃঢ়ভাবে এই মতের প্রতিষ্ঠা করলেন যে **কোন ধরনের** শ্রম মূল্য উৎপাদন করে ও কেন ও কীভাবে তা উৎপাদন করে এবং এই সিদ্ধান্তে এলেন যে মূল্য বস্তুটি আসলে **এই ধরনের** ঘনীভূত শ্রম ছাড়া অন্য কিছুই নয়। উল্লেখ্য যে মার্কসের আগে রডবের্টুস তাঁর জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত এই শেষোক্ত ব্যাপারটি ধরতেই পারেন নি। মার্কস অতঃপর পরীক্ষা করে দেখলেন পণ্যসম্ভারের সঙ্গে অর্থের সম্পর্কটি, এবং দেখালেন কীভাবে ও কেমন করে মূল্য-সম্পর্কিত তাদের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যের দৌলতে পণ্যসম্ভার ও পণ্য-বিনিময় পণ্য ও অর্থের বৈপরীত্যের জন্ম দিতে বাধ্য। এই ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মার্কসের অর্থ-সংক্রান্ত তত্ত্বটি এ-বিষয়ে প্রথম পূর্ণাঙ্গ, ও বর্তমানে খোলাখুলি স্বীকার না-করা সত্ত্বেও, সাধারণভাবে সর্বজনগৃহীত তত্ত্ব। অর্থের পুঁজিতে রূপান্তরসাধন নিয়ে পর্যালোচনা করতে গিয়ে মার্কস প্রমাণ করলেন যে এই রূপান্তরের ভিত্তি হল শ্রমশক্তির ক্রয় ও বিক্রয়। সাধারণভাবে শ্রমের জায়গায় শ্রমশক্তি, বা তার মূল্য-উৎপাদনকারী বৈশিষ্ট্যটিকে বদলে নেয়ার ফলে এক কলমের আঁচড়ে তিনি এমন একটি সমস্যার সমাধান করলেন যে-সমস্যার ডুবোপাহাড়ের ধাক্কায় রিকার্ডীয় মতবাদের জাহাজের ভরাডুবি হয়ে গিয়েছিল। সে-সমস্যা হল, শ্রমের দ্বারা রিকার্ডীয় মূল্য-নিরূপণ সংক্রান্ত তত্ত্বের সাহায্যে পুঁজি ও শ্রমের পারস্পরিক বিনিময়ের সামঞ্জস্যবিধানের অসম্ভাব্যতা। 'বদ্ধ' ও 'চল' পুঁজির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করার ফলে মার্কসই প্রথম একেবারে খুঁটিনাটির বিশদীকরণ সহ উদ্বৃত্ত মূল্য তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়ার সত্যিকার পথের রূপরেখা নিরূপণে সমর্থ হলেন এবং ফলত সমর্থ হলেন তার ব্যাখ্যা যোগানোতেও। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে তাঁর পূর্বসূরীদের কেউই এ-কাজে সমর্থ হন নি। এইভাবে মার্কস খোদ পুঁজির মধ্যেই এমন এক তারতম্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করলেন যে-

ব্যাপারে তাঁর আগে না-রডবের্টুস না-বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রীরা কেউই কোনো কূলকিনারা করে উঠতে পারেন নি। অথচ আলোচ্য এই ব্যাপারটিই সবচেয়ে জটিল অর্থনৈতিক সমস্যাবলী সমাধানের চাবিকাঠিটি যুগিয়ে দিচ্ছে—ফের একবার যার অত্যন্ত লক্ষণীয় প্রমাণ মিলেছে 'পুঁজি' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে এবং আমরা দেখাব যে এর আরও বেশি উল্লেখ্য প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে ওই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে। মার্কস উদ্বৃত্ত মূল্যের আরও বিশ্লেষণ করে তার দুটি ধরন আবিষ্কার করেছেন, যথা অনপেক্ষ ও আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্য; এবং পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের ঐতিহাসিক বিকাশের ক্ষেত্রে ওই দুই ধরনের উদ্বৃত্ত মূল্য-যে বিভিন্ন, অথচ প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্ধারক ভূমিকা পালন করেছে তা দেখিয়েছেন। উদ্বৃত্ত মূল্য নিরূপণের ভিত্তিতে মার্কস বিকশিত করে তুলেছেন মজুরি সম্পর্কে এ-পর্যন্ত আমরা যা পেয়েছি তার মধ্যে এই প্রথম যুক্তিসম্মত একটি তত্ত্ব এবং এই প্রথম তিনি নির্ধারণ করলেন পুঁজিতান্ত্রিক সঞ্চয়ের ইতিহাসের মৌল বৈশিষ্ট্যগুলি ও তার ঐতিহাসিক প্রবণতার একটি রূপরেখা।

১৮৮৫ সালের ৫ মে তারিখে
এঙ্গেলস-লিখিত প্রবন্ধ
প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়
গ্রন্থাকারে: K. Marx.
'Das Kapital. Kritik
der politischen Oeconomie'.
Zweiter Band, Herausgegeben
von Friedrich Engels,
Hamburg, 1885.

গ্রন্থের পাঠ
অনুযায়ী মুদ্রিত

পাণ্ডুলিপি জার্মান
ভাষায় লিখিত

কার্ল মার্কস

জেনেভায় অবস্থিত রুশ শাখার কমিটি-সদস্যদের কাছে আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতির সাধারণ পরিষদের পত্র (৫৪)

নাগরিকগণ,

গত ২২ মার্চের সভায় সর্বসম্মত ভোটে সাধারণ পরিষদ ঘোষণা করেছে যে আপনাদের গৃহীত কর্মসূচি ও নিয়মাবলী আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতির সাধারণ নিয়মাবলীর সঙ্গে সুসমঞ্জস। ফলে সাধারণ পরিষদ সঙ্গে সঙ্গেই আপনাদের শাখাকে আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। সাধারণ পরিষদে আপনাদের প্রতিনিধি হিসেবে সম্মানজনক কর্মভার আপনাদের প্রস্তাব অনুযায়ী আমি গ্রহণ করছি।

কর্মসূচিটিতে আপনারা বলেছেন:

> '...পোল্যান্ডের নিপীড়ক সাম্রাজ্যিক জোয়াল এমন একটি গতিরোধক যন্ত্রবিশেষ যা উভয় জাতির — যেমন রুশ তেমনই পোলিশ জাতির — রাজনৈতিক ও সামাজিক বন্ধনমুক্তির ক্ষেত্রে একই রকম বাধার সৃষ্টি করছে।'

সেইসঙ্গে আপনারা একথা বললেও ভুল হোত না যে রাশিয়ার তরফে পোল্যান্ড ধর্ষণের ব্যাপারটা জার্মানিতে, এবং ফলত সমগ্র ইউরোপ মহাদেশেই, সামরিক শাসনের অস্তিত্বের সত্যিকার হেতু এবং ওই শাসনকে তা অতীব ক্ষতিকর সমর্থন যোগাচ্ছে। অতএব পোল্যান্ডের বন্ধনশৃঙ্খল চূর্ণ করার জন্যে কাজ করতে গিয়ে রুশ সমাজতন্ত্রীরা উপরোক্ত ওই সামরিক শাসন ধ্বংস করারও মহৎ ব্রত গ্রহণ করেছেন। ইউরোপীয় প্রলেতারিয়েতের সামগ্রিক মুক্তি অর্জনের পূর্বশর্ত হিসেবে এই কাজটি একান্ত অপরিহার্য।

কয়েক মাস আগে সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে পাঠানো ফ্লেরোভস্কির 'রুশদেশে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা' শীর্ষক বইখানি আমি পাই। বইখানি সত্যিই

ইউরোপের চোখ খুলে দিয়েছে। সারা ইউরোপ মহাদেশে এমনকি তথাকথিত বিপ্লবীরা পর্যন্ত **রুশ আশাবাদের** যে-কাল্পনিক ধারণা প্রচার করেছে, নির্মমভাবে তার বিপরীতে যথার্থ স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছে বইটি। যদি আমি বলি যে বইখানিতে একটি বা দুটি জায়গায় এমন কিছু-কিছু কথা লেখা হয়েছে যা বিশুদ্ধ তত্ত্বগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমালোচককে পুরোপুরি খুশি করতে পারে নি, তাহলেও বইটির মূল্য কিছুমাত্র হ্রাস পায় না। এটি হল এক দায়িত্বশীল পর্যবেক্ষক, এক অক্লান্ত কর্মী, এক নিরপেক্ষ সমালোচক, এক মস্ত বড় শিল্পী এবং সবচেয়ে বেশি করে সকল প্রকার উৎপীড়ন-নিপীড়ন সম্পর্কে অসহিষ্ণু ও সকল জাতীয় প্রশংসা অসহ্য করা এবং উৎপাদক শ্রেণীর সকল দুঃখকষ্ট ও সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার ব্যাকুল অংশভাক এক ব্যক্তির রচিত একখানি গ্রন্থ।

ফ্লেরোভস্কির এই ধরনের বই এবং আপনাদের শিক্ষক চের্নিশেভ্স্কির বইগুলি রাশিয়াকে যথার্থ মর্যাদার অধিকারী করেছে এবং প্রমাণ করেছে যে আপনাদের দেশও আমাদের যুগের আন্দোলনে অংশ নিতে শুরু করেছে।

ভ্রাতৃপ্রতিম অভিনন্দন সহ
কার্ল মার্কস

লণ্ডন, ২৪ মার্চ, ১৮৭০ সাল

জেনেভা থেকে প্রকাশিত
'নারোদনয়ে দিয়েলো'
পত্রিকার প্রথম সংখ্যায়,
১৫ এপ্রিল, ১৮৭০ সালে মুদ্রিত

পত্রিকার পাঠ
অনুযায়ী মুদ্রিত

পাণ্ডুলিপি রুশ
ভাষায় লিখিত

কার্ল মার্ক্স

গোপনীয় চিঠি (৫৫)

(অংশ)

৪) **ইংলণ্ডের জন্যে গঠিত ফেডেরাল পরিষদ থেকে সাধারণ পরিষদকে বিচ্ছিন্ন করার প্রশ্নটি সম্বন্ধে।**

L'Egalité পত্রিকা(৫৬) প্রতিষ্ঠার বহু আগে থেকেই এই প্রস্তাবটি সাধারণ পরিষদের সভায় থেকে-থেকে উত্থাপন করেছেন পরিষদের দু'একজন ইংরেজ সদস্য। কিন্তু সর্বদাই এ-প্রস্তাব প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

যদিও বৈপ্লবিক **উদ্যোগ** সম্ভবত আসবে ফ্রান্স থেকে, তবু একমাত্র ইংলণ্ডই পারে গুরুতর **অর্থনৈতিক** বিপ্লবের **চালক-দণ্ড** হিসেবে কাজ করতে। এটি হল সেই একমাত্র দেশ যেখানে আর কৃষক বলে কেউ নেই এবং যেখানে ভূ-সম্পত্তি কেন্দ্রীভূত অল্প কয়েকজনের হাতে। সেই একমাত্র দেশ এটি যেখানে **পুঁজিতান্ত্রিক গঠন,** অর্থাৎ পুঁজিপতি-প্রভুদের অধীনে ব্যাপক হারে সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক, কার্যত উৎপাদনের গোটা এলাকাটাই জুড়ে আছে। এটি সেই একমাত্র দেশ **যেখানে জনসাধারণের এক বিপুল সংখ্যাধিক অংশ মজুরিনির্ভর-শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত। সেই** একমাত্র দেশ এটি যেখানে শ্রেণী-সংগ্রাম ও **ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে** শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠন একটা নির্দিষ্ট মাত্রার পরিপক্কতা ও সর্বজনীনতা **অর্জন করেছে।** এটি হল সেই একমাত্র দেশ বিশ্ব বাজারের ওপর যার কর্তৃত্বের দরুন এখানকার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে-কোনো বিপ্লব সংঘটিত হলে সঙ্গে সঙ্গে তা গোটা দুনিয়াকে প্রভাবিত করতে বাধ্য। জমিদারি-ব্যবস্থা ও পুঁজিতন্ত্র যদি ইংলণ্ডে ওই দুটি ব্যবস্থার ধ্রুপদী উদাহরণ হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে, তাহলে বলতে হয় অপরদিকে তাদের **ধ্বংসের বৈষয়িক পরিবেশ** ও সবচেয়ে পরিপক্ক হয়ে উঠেছে এখানে। এখন, **প্রলেতারীয় বিপ্লবের এই প্রধান চালক-দণ্ডটির হাতলে যখন সরাসরি হাত রাখার মতো চমৎকার অবস্থানে আছে** সাধারণ পরিষদ, তখন সেই চালক-

দন্ডটি নিছক ইংরেজদের হাতে ছেড়ে দেয়ার মতো বোকামি, এমনকি বলতে পারি অপরাধ, আর কী হতে পারে!

সমাজ-বিপ্লব সাধনের পক্ষে সকল প্রয়োজনীয় **বৈষয়িক উপাদান** ইংরেজ-জাতির আছে। কিন্তু ইংরেজদের মধ্যে যার অভাব তা হল, **সামান্যীকরণের মানসিক প্রবণতা ও বৈপ্লবিক উদ্দীপনা**। একমাত্র সাধারণ পরিষদ তাঁদের এটা যুগিয়ে দিতে পারে, এবং এইভাবে দ্রুতগামী করে তুলতে পারে সত্যিকার বৈপ্লবিক আন্দোলনকে—এখানে এবং ফলত **সর্বত্রই**। এ-ব্যাপারে ইতিমধ্যে যে-বিপুল ফল পেয়েছি আমরা তার সাক্ষ্য দিচ্ছে শাসক-শ্রেণীগুলির সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও প্রভাবশালী সংবাদপত্রসমূহ, যেমন, *Pall Mall Gazette, Saturday Review, Spectator, Fortnightly Review* (৫৭)। এছাড়া এই কিছুকাল আগেও যাঁরা ইংরেজ শ্রমিকদের নেতৃবৃন্দের ওপর বড়রকমের প্রভাববিস্তার করে ছিলেন সেই **কমন্স-সভা ও লর্ডস-সভার** তথাকথিত র‍্যাডিকাল সদস্যদের কথা তো বাদই দিলাম। এ'রা সবাই মিলে প্রকাশ্যে আমাদের ওপর দোষারোপ করছেন এই বলে যে আমরা নাকি শ্রমিক শ্রেণীর মন বিষিয়ে দিয়েছি ও তাঁদের মধ্যে **ইংরেজসুলভ মেজাজ** দিয়েছি নষ্ট করে এবং শ্রমিক শ্রেণীকে আমরা ঠেলে নিয়ে চলেছি বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্রের পথে।

সত্যিসত্যিই এই পরিবর্তন সংঘটনের একমাত্র পন্থা হল **আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ পরিষদ** যেভাবে প্রচারকার্য চালাচ্ছে তা-ই। সাধারণ পরিষদ হিসেবে আমরা এমন সব ক্রিয়াকলাপের সূত্রপাত (যেমন, উদাহরণস্বরূপ, **ভূমি ও শ্রম-লীগ** (৫৮) প্রতিষ্ঠার মতো) ঘটাতে পারি, যেগুলিকে কার্যকর করে তোলার বিশেষ কায়দার ফলে পরে জনসাধারণের চোখে তা ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন বলে প্রতীয়মান হবে।

কিন্তু যদি **সাধারণ পরিষদের** বাইরে একটি **ফেডেরাল পরিষদ** গঠন করা হয়, তাহলে তার তাৎক্ষণিক ফলাফল কী দাঁড়াবে?

সাধারণ পরিষদ ও **সাধারণ ট্রেড ইউনিয়ন কাউন্সিলের** মাঝামাঝি অবস্থানে থেকে **ফেডেরাল পরিষদ** সর্বপ্রকার কর্তৃত্বের অধিকার হারাবে। অপরপক্ষে আন্তর্জাতিকের **সাধারণ পরিষদ** হারাবে উপরোক্ত ওই **বিপুল**

চালক-দণ্ড চালনার অধিকার। যদি আমরা লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ চালানোর পরিবর্তে লোক-দেখানো বকবকানির ভক্ত হতাম, তাহলে হয়তো *L'Egalité*-র প্রশ্নের প্রকাশ্যে জবাব দেয়ার মতো ভুল করেই বসতাম: হয়তো বোঝাতে চেষ্টা করতাম কেন **সাধারণ পরিষদ** 'এমন একগাদা কাজের ঝুটঝামেলা' যেচে ঘাড়ে নিয়েছে!

ইংলণ্ডকে অন্যান্য দেশের মধ্যে নিছক যে-কোনো একটি দেশ হিসেবে মোটেই গণ্য করা চলে না। এ-দেশটিকে অবশ্যই গণ্য করতে হবে **পুঁজির রাজধানী** হিসেবে।

৫) **আয়র্ল্যাণ্ডের মুক্তির দাবি-বিষয়ে (৫৯) সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব-সম্পর্কিত প্রশ্ন সম্বন্ধে।**

ইংলণ্ড যদি জমিদারি-প্রথা ও ইউরোপীয় পুঁজিতন্ত্রের দুর্গ-প্রাকার হয়, তাহলে একটিমাত্র জায়গা যেখানে সরকারি ইংলণ্ডকে সত্যিকার সজোর আঘাত দেয়া যেতে পারে তা **হল আয়র্ল্যাণ্ড।**

প্রথম কথা, আয়র্ল্যাণ্ড হল ব্রিটিশ জমিদারি-প্রথার **দুর্গ-প্রাকার।** আয়র্ল্যাণ্ডে যদি এই দুর্গের পতন ঘটে তাহলে ইংলণ্ডেও তার পতন ঘটবে; তবে আয়র্ল্যাণ্ডে এটা ঘটানো এক শো গুণ সহজ কাজ, কেননা সেদেশে **অর্থনৈতিক সংগ্রাম একমাত্র ভূ-সম্পত্তির বিরুদ্ধে কেন্দ্রীভূত,** কেননা এই সংগ্রাম সেখানে একই সঙ্গে জাতীয় সংগ্রামও বটে, এবং যেহেতু ইংলণ্ডের চেয়ে সেখানকার জনসাধারণ আরও বেশি বৈপ্লবিক মনোভাবাপন্ন ও বিক্ষুব্ধ। আয়র্ল্যাণ্ডে জমিদারি-প্রথা একমাত্র টিকিয়ে রাখা হয়েছে **ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর** সাহায্যে। যে-মুহূর্তে **দুই** দেশের **মধ্যে** বর্তমান **জবরদস্তিমূলক সংযুক্তির** (৬০) অবসান ঘটবে, আয়র্ল্যাণ্ডে সেই মুহূর্তেই ফেটে পড়বে সমাজ-বিপ্লব, তবে তা ঘটবে সেকেলে অচলিত ধাঁচে। আর এর ফলে ব্রিটিশ জমিদারি-প্রথা কেবল-যে সম্পদ আহরণের বিপুল এক উৎসই হারাবে তা নয়, হারাবে তার **সবচেয়ে বড় নৈতিক শক্তিও,** অর্থাৎ **আয়র্ল্যাণ্ডের ওপর ইংলণ্ডের আধিপত্যের পরিচায়ক শক্তিও।** এর বিপরীতে, আয়র্ল্যাণ্ডে ইংরেজ জমিদারদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রেখে দেয়ার ফলে ব্রিটিশ প্রলেতারিয়েত খোদ ইংলণ্ডেই তাদের ক্ষমতাকে দুর্ভেদ্য করে রাখছে।

দ্বিতীয় কথা, ইংলন্ডের শ্রমিক শ্রেণীকে দাবিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে ইংরেজ বুর্জোয়া শ্রেণী আয়র্ল্যান্ডের দারিদ্র্যের সুযোগ গ্রহণ করে কেবল-যে দরিদ্র আয়র্ল্যান্ডবাসীদের ইংলন্ডে **দেশান্তরী হতে বাধ্য করেছে** তা-ই নয়, এর ফলে তারা প্রলেতারিয়েতকেও দুটি বিরোধী শিবিরে ভাগ করে রেখেছে। কেল্‌টিক শ্রমিকের অগ্নিময় বিপ্লবী প্রকৃতি মিশ খায় না অ্যাংলো-স্যাক্সন শ্রমিকের দৃঢ় অথচ মন্থরগতি চরিত্রের সঙ্গে। ঠিক উল্টো, **ইংলন্ডের সবকটি বড়-বড় শিল্পকেন্দ্রে আইরিশ** প্রলেতারিয়েত ও ব্রিটিশ প্রলেতারিয়েতের মধ্যে বিষম শত্রুতার প্রকাশ ঘটতে দেখা যাচ্ছে। আইরিশ শ্রমিক ব্রিটিশ শ্রমিকের প্রতিযোগী হিসেবে শেষোক্ত শ্রমিকের মজুরি ও **জীবনধারণের মান** নিচু করে রাখছে বলে সাধারণ ইংরেজ শ্রমিক আইরিশ শ্রমিককে ঘৃণার চক্ষে দেখছে। ইংরেজ শ্রমিক জাতিগত ও ধর্মগত বিদ্বেষ পোষণ করছে আইরিশ শ্রমিকের প্রতি। উত্তর আমেরিকার দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলিতে **গরিব শাদা-চামড়ার লোকেরা** কালো-চামড়ার ক্রীতদাসদের যে-চোখে দেখে থাকে ইংরেজ শ্রমিকও অনেকটা সেই চোখে দেখে থাকে আইরিশ শ্রমিককে। ইংলন্ডের প্রলেতারিয়ানদের মধ্যেকার এই পরস্পর-বিরোধ বুর্জোয়া শ্রেণী কৃত্রিমভাবে জীইয়ে রেখেছে ও তাতে ইন্ধন যোগাচ্ছে। বুর্জোয়া শ্রেণী জানে যে এই বিভেদই হল তাদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার সত্যিকার গোপন রহস্য।

এই শত্রুতা আটলান্টিক মহাসাগরের ওপারেও পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। ষাঁড় ও ভেড়ার পালের তাড়নায় জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে আয়র্ল্যান্ডবাসীরা সুদূর উত্তর আমেরিকাতেও গিয়ে জড় হয়েছে এবং সেখানকার জনসংখ্যার এক বিপুল, ক্রমবর্ধমান অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে তারা। তাদের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান, একমাত্র বদ্ধমূল আবেগ হল ইংলন্ডের প্রতি ঘৃণাপ্রকাশ। ব্রিটিশ ও আমেরিকান গভর্নমেন্ট-দুটিও (অথবা যে-সমস্ত শ্রেণীর তারা প্রতিনিধি সেই শ্রেণীগুলি) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলন্ডের মধ্যেকার চাপা লড়াইকে জীইয়ে রাখার উদ্দেশ্যে উপরোক্ত ওই ঘৃণা-বিদ্বেষে ইন্ধন যুগিয়ে চলেছে। আর এইভাবে তারা আটলান্টিকের দুই পারের শ্রমিকদের মধ্যে আন্তরিক ও স্থায়ী মৈত্রীজোট স্থাপনে এবং ফলত তাদের মুক্তি অর্জনেও বাধা দিয়ে চলেছে।

তদুপরি, **প্রকাণ্ড এক স্থায়ী সেনাবাহিনী** পোষণের পক্ষে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের একমাত্র অজুহাত হল আয়র্ল্যান্ড দখলে রাখা। আর এই সেনাবাহিনীকে, দরকার পড়লে ও আগেও যেমনটি করা হয়েছে সেইভাবে, আয়র্ল্যান্ডে তার সামরিক হাতেখড়ি শেষ হবার পর অক্লেশে ব্যবহার করা চলতে পারবে ব্রিটিশ শ্রমিকদের বিরুদ্ধে। পরিশেষে, প্রাচীন রোমে একদা বিপুল ও বিকটভাবে যে-ব্যাপারটা ঘটেছিল আজকের ইংলণ্ড ঠিক সেই ব্যাপারেরই পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখছে। আর তা হল, যে-জাতিই অপর জাতির ওপর উৎপীড়ন-নিপীড়ন চালায় সে নিজ বন্ধনশৃঙ্খল রচনা করে নিজেই।

অতএব আইরিশ সমস্যার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সমিতির দৃষ্টিভঙ্গি অতি পরিষ্কার। সমিতির প্রথম কর্তব্য হল ইংলণ্ডে সমাজ-বিপ্লবকে উৎসাহ যোগানো। আর এই উদ্দেশ্যসাধনে আয়র্ল্যান্ডে প্রচণ্ড এক আঘাত হানা প্রয়োজন।

আয়র্ল্যান্ডের মুক্তির দাবি-বিষয়ে সাধারণ পরিষদের প্রস্তাবাদি ভবিষ্যতের অপরাপর প্রস্তাবের ভূমিকামাত্র। এই ভবিষ্যৎ প্রস্তাবগুলিতে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করা হবে যে আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচারের প্রশ্নটি বাদ দিলেও বর্তমান **জবরদস্তিমূলক সংযুক্তি** (অর্থাৎ, আয়র্ল্যান্ডের দাসত্ব)-কে সম্ভব হলে **সমকক্ষ ও স্বাধীন রাষ্ট্রদ্বয়ের মৈত্রীজোটে** এবং প্রয়োজন হলে উভয়ের **সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নকরণে** রূপান্তরিত করা **ব্রিটিশ শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির এক পূর্বশর্তবিশেষ।**

১৮৭০ সালের ২৮ মার্চ
তারিখ নাগাদ রচনা
১৯০২ সালের *Die Neue Zeit*, Bd. 2, পঞ্চদশ
সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত

মস্কো থেকে প্রকাশিত
'প্রথম আন্তর্জাতিকের
সাধারণ পরিষদের
১৮৬৮-১৮৭০ সালের
কার্যবিবরণীতে' বিধৃত
'রোমান সুইজারল্যান্ডের
ফেডেরাল পরিষদের কাছে
সাধারণ পরিষদের বক্তব্য'
শীর্ষক দলিলের পাঠ
অনুযায়ী মুদ্রিত

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক আন্দোলন-প্রসঙ্গে

আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতির লণ্ডন সম্মেলনে ১৮৭১ সালের ২১ সেপ্টেম্বর তারিখে প্রদত্ত বক্তৃতার সাংবাদিক-লিখিত প্রতিলিপি অনুসারে (৬১)

রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বা আন্দোলন থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা অসম্ভব। রাজনীতি-নিরপেক্ষ সংবাদপত্রও প্রতিদিন রাজনৈতিক ব্যাপারে যোগ দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে একমাত্র প্রশ্ন হল, কীভাবে এবং কী ধরনের এই রাজনীতিতে যোগ দেয়া হচ্ছে। এছাড়া আমাদের পক্ষে রাজনীতি থেকে বিরত থাকা অসম্ভব। বর্তমানে বিপুল-সংখ্যক অধিকাংশ দেশে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি রাজনৈতিক পার্টি হিসেবে কাজ করে চলেছে, আর রাজনীতি থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়ে আমরা সেইসব পার্টির সর্বনাশসাধনে প্রস্তুত নই। জীবন্ত অভিজ্ঞতা, বর্তমান গভর্নমেণ্টগুলির রাজনৈতিক উৎপীড়ন শ্রমিকদের বাধ্য করে রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাতে, তা তারা সেটা চাক বা না-চাক এবং তা রাজনৈতিক অথবা সামাজিক যে-কোনো উদ্দেশ্যসাধনে হোক-না কেন। এই শ্রমিকদের কাছে রাজনীতি থেকে বিরত থাকার কথা প্রচার করার অর্থই হল তাদের বুর্জোয়া রাজনীতির খপ্পরে ফেলে দেয়া। প্যারিস কমিউন অনুষ্ঠিত হওয়ার পরদিন সকাল থেকেই প্রলেতারিয়েতের রাজনৈতিক আন্দোলন সাধারণ নিয়মে পর্যবসিত হয়েছে, ফলত রাজনীতি থেকে বিরত থাকা হয়ে দাঁড়িয়েছে একেবারেই অবান্তর।

আমরা শ্রেণীসমূহের বিলোপ ঘটাতে চাই। কিন্তু তা করার উপায় কী? এর একমাত্র উপায় প্রলেতারিয়েতের পক্ষে রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। এখন প্রত্যেকটি লোক এই সবকিছু মেনে নেয়া সত্ত্বেও আমাদের তবু বলা হচ্ছে রাজনীতি নিয়ে মাথা না-ঘামাতে। রাজনীতি-নিরপেক্ষেরা বলছে তারা নাকি বিপ্লবী, এমনকি বিশেষ উৎকর্ষের জোরেই বিপ্লবী তারা।

অথচ বিপ্লব হল গিয়ে এক সর্বোচ্চ স্তরের রাজনৈতিক কর্ম এবং যারা বিপ্লব চায় তারা ওই বিপ্লবকে সফল করে তোলার উপায়াদিও অবলম্বন না-করতে চেয়ে পারে না, অর্থাৎ রাজনৈতিক আন্দোলন না-চেয়ে পারে না তারা। কেননা এই রাজনৈতিক আন্দোলনই বিপ্লবের জমি তৈরি করে এবং শ্রমিকদের সেই বৈপ্লবিক প্রশিক্ষণ দেয়, যে-প্রশিক্ষণ না-থাকলে যুদ্ধের পরদিন সকালেই শ্রমিকরা ফাভ্র ও পিয়াদের হাতে প্রতারিত হতে বাধ্য। আমাদের রাজনীতি হওয়া উচিত শ্রমিক শ্রেণীর রাজনীতি। শ্রমিক পার্টিকে কোনো বুর্জোয়া পার্টির লেজুড় হলে চলবে না কখনও। তাকে হতে হবে স্বাধীন ও স্বনির্ভর এবং তার নিজস্ব লক্ষ্য ও নিজস্ব রাজনীতি থাকা দরকার।

রাজনৈতিক স্বাধীনতাসমূহ, সভা-সমিতির অনুষ্ঠান ও সঙ্ঘ গঠনের অধিকার এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা — এগুলি হল আমাদের হাতিয়ার। আমরা কি হাত গুটিয়ে বসে থাকব ও রাজনীতি থেকে বিরত থাকব, যখন অন্য কেউ আমাদের হাত থেকে ওই হাতিয়ারগুলি কেড়ে নিতে চেষ্টা করছে? বলা হচ্ছে যে আমাদের তরফে রাজনীতির ক্রিয়াকলাপে রত থাকার অর্থ হচ্ছে বর্তমান ব্যবস্থাকে আমাদের মেনে নেয়ার সামিল। আমি বলি, ব্যাপারটা ঠিক উলটো। যতক্ষণ এই বর্তমান ব্যবস্থা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের হাতিয়ার যুগিয়ে দিচ্ছে আমাদের হাতে, ততক্ষণ আমাদের পক্ষ থেকে সেগুলিকে ব্যবহার করলে মোটেই এটা বোঝায় না যে আমরা বর্তমান সমাজব্যবস্থাকে মেনে নিচ্ছি।

The Communist International
পত্রিকার ১৯৩৪ সালের ২৯
নং সংখ্যায় প্রথম সম্পূর্ণভাবে
প্রকাশিত

ফরাসি ভাষার
পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী
মুদ্রিত

কার্ল মার্কস

প্যারিস কমিউনের বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত প্রস্তাবাদি (৬২)

১

'...গত বছরের ১৮ মার্চের বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষে সমবেত এই সভা ঘোষণা করছে ১৮৭১ সালের ১৮ মার্চ তারিখে যে-গৌরবময় আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল তাকে এই সভা গণ্য করছে সেই মহান সমাজ-বিপ্লবের প্রত্যুষা হিসেবে যা মানবজাতিকে চিরকালের মতো শ্রেণীর শাসনের হাত থেকে মুক্তি দেবে।'

২

'...শ্রমজীবী শ্রেণীগুলির প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা থেকে জাত গোটা ইউরোপ-জুড়ে-ছড়ানো মধ্য-শ্রেণীগুলির অক্ষমতা ও অপরাধ-অনুষ্ঠান পুরনো সমাজের ধ্বংস অনিবার্য করে তুলেছে, তা সে-সমাজের শাসনভার রাজতন্ত্রী অথবা প্রজাতন্ত্রী যে-কোনো ধরনের গভর্নমেণ্টের হাতেই থাকুক-না কেন।'

৩

'...আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে সকল গভর্নমেণ্টের জেহাদ ঘোষণা এবং ভার্সাইয়ের খুনীদের (৬৩) ও সেইসঙ্গে তাদের প্রাশিয়ান বিজেতাদের সন্ত্রাসসৃষ্টি প্রমাণ করছে তাদের সাফল্যসমূহের শূন্যগর্ভতা এবং তিয়ের ও

প্রাশিয়ার ভিলহেল্মের সম্মিলিত সেনাবাহিনীর সাহায্যে চূর্ণ-করা বীর অগ্রগামীদের পেছনে সমবেত গোটা দুনিয়ার প্রলেতারিয়েতের আক্রমণোদ্যত বাহিনীর উপস্থিতি।'

১৮৭২ সালের ১৩ থেকে ১৮ মার্চের মধ্যে মার্কসের লেখা

১৮৭২ সালের ২৪ মার্চ *La Liberté*-র দ্বাদশ সংখ্যায় এবং ১৮৭২ সালের ৩০ মার্চ *The International Herald*-এর তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত

The International Herald-এর পাঠ অনুযায়ী মুদ্রিত

কার্ল মার্কস

জমির জাতীয়করণ (৬৪)

ভূ-সম্পত্তিই হল সকল সম্পদের আদি উৎস এবং এটি এমন এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে যার সমাধানের ওপর নির্ভর করে আছে শ্রমিক শ্রেণীর ভবিষ্যৎ।

আমি এখানে জমির ব্যক্তিগত মালিকানার সমর্থক যতসব আইনজ্ঞ, দর্শনশাস্ত্রী ও অর্থশাস্ত্রীর উপস্থাপিত সকল যুক্তিতর্ক নিয়ে পর্যালোচনা করতে চাই না, কেবল প্রথমত নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই এই বক্তব্যটিতে যে ওই সমর্থকরা **'স্বাভাবিক অধিকার'**-এর মুখোশের নিচে প্রাণপণে গোপন রাখার চেষ্টা করেছেন জমি ছিনিয়ে নেয়ার আদিম ঘটনাটিকে। যদি সমাজের মুষ্টিমেয় কয়েকজনের পক্ষে জমি ছিনিয়ে নেয়ার ব্যাপারটা তাদের স্বাভাবিক অধিকারের সামিল হয়ে থাকে, তাহলে সমাজের অধিকাংশের পক্ষে যা প্রয়োজন তা হল কেবলমাত্র যথেষ্ট পরিমাণে শক্তি সংগ্রহ করা যাতে তাদের কাছ থেকে যা ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে তা ফিরেফিরতি ছিনিয়ে নেয়ার মতো স্বাভাবিক অধিকার তারা অর্জন করতে পারে।

ইতিহাসের গতিপথে বিজেতারা পশুশক্তির বলে সংগৃহীত তাদের আদি খেতাব, উপাধি ইত্যাদিকে তাদের নিজেদেরই জারি-করা আইনের সাহায্যে এক ধরনের সামাজিক মর্যাদা দেয়াটা বেশ সুবিধাজনক বলে দেখেছে।

অতঃপর এসেছেন দর্শনশাস্ত্রী এবং তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে ওই সমস্ত আইনকানুনের মধ্যে নিহিত রয়েছে ও প্রকাশিত হয়েছে মানবজাতির সর্বজনীন সমর্থন। কাজেই যদি জমির ব্যক্তিগত মালিকানার ব্যাপারটি এমন কোনো সর্বজনীন সমর্থনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে

তাহলে স্পষ্টতই তা লোপ পাবে যে-মুহূর্তে সমাজের অধিকাংশ মানুষ তার ন্যায্যতা মেনে নিতে অস্বীকৃত হবে।

অবশ্য, ভূ-সম্পত্তিতে তথাকথিত এই 'অধিকার'-এর প্রশ্নটি বাদ দিয়েও আমি জোর করে বলতে চাই যে সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশ, জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও কেন্দ্রীভবন, অর্থাৎ সেই সমস্ত ঘটনা যা পুঁজিতন্ত্রী খামারীকে বাধ্য করে কৃষিতে যৌথভাবে সংগঠিত শ্রমকে নিয়োগ করতে এবং ক্রমশ বেশি-বেশি যন্ত্রপাতি ও যান্ত্রিক উপায়াদি প্রয়োগ করতে—এই সবই ক্রমশ বেশি করে জমির জাতীয়করণকে **'সামাজিক দিক থেকে প্রয়োজনীয়'** করে তুলবে এবং এর বিরুদ্ধে ভূ-সম্পত্তির অধিকার-সম্পর্কিত হাজার কথাবার্তাও কোনো কাজে লাগবে না। সমাজের অবশ্য-পূরণীয় চাহিদা মিটবেই ও তা মেটাতে হবেই, সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে পরিবর্তনাদিও ঘটবে নিজ-নিজ পথ অনুসরণ করে এবং কোথাও দ্রুত কোথাও-বা অপেক্ষাকৃত পরে তাদের স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রয়োজনীয় আইনকানুনও তৈরি করে নেবে।

আমাদের যা প্রয়োজন তা হল দিনে-দিনে উৎপাদনের মাত্রা বাড়িয়ে চলা, আর উৎপাদন-বৃদ্ধির এই জরুরি প্রয়োজন কখনোই মিটতে পারে না যদি আমরা অল্প কয়েকজন ব্যক্তিকে তাদের খেয়ালখুশি-মাফিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থপূরণে কৃষি-উৎপাদনের ব্যাপারটি নিয়ন্ত্রিত করতে দিই, অথবা তাদের অজ্ঞতাবশত জমির উৎপাদিকা শক্তিকে নিঃশেষ হতে দিই। সকল প্রকার আধুনিক পদ্ধতি, যেমন জমির সেচ ও জলনিকাশী-ব্যবস্থা, বাষ্পীয় লাঙলচালনা, জমিতে রাসায়নিক সার প্রয়োগের ব্যবস্থা, ইত্যাদি ব্যাপকভাবে কৃষিতে ব্যবহৃত হওয়া দরকার। কিন্তু যে-বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আমরা অধিকারী এবং যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জামের মতো কৃষিতে ব্যবহার্য যে-কৃৎকৌশল আমাদের আয়ত্তে, তা কখনোই সফলভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব নয় একমাত্র ব্যাপক হারে জমিচাষের বন্দোবস্ত করা ছাড়া।

ব্যাপক হারে জমির চাষ-আবাদ যদি ছোট-ছোট ও টুকরো-টুকরো জমি পৃথকভাবে চাষের চেয়ে অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এত উৎকৃষ্টতর ও লাভজনক বলে প্রমাণিত হয়ে থাকে (এমনকি খোদ কৃষককে যা নিছক ভারবাহী পশুতে পরিণত করে সেই বর্তমান পুঁজিতান্ত্রিক কৃষি-ব্যবস্থাতেও

যদি এটি সম্ভব হয়ে থাকে), তাহলে ব্যাপক জাতীয় ভিত্তিতে এই জমিচাষের প্রবর্তন করতে পারলে কি উৎপাদনের ক্ষেত্রে আগ্রহ-উদ্দীপনা আরও বৃদ্ধি পাবে না?

একদিকে জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং অপরদিকে কৃষিজাত পণ্যদ্রব্যের ক্রমবর্ধমান দরদাম তর্কাতীতভাবে প্রমাণ করছে যে জমির জাতীয়করণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সামাজিক দিক থেকে প্রয়োজনীয় একটি ব্যাপার।

ব্যক্তিগত অপব্যবহারের ফলে কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন-হ্রাসের মতো ব্যাপার অবশ্যই তখন অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে, যখন কৃষিকাজ পরিচালিত হবে জাতির নিয়ন্ত্রণাধীনে ও সমগ্র জাতির উপকারার্থে।

আজ এখানে এই বিশেষ প্রশ্নটি নিয়ে বিতর্ক চলার সময়ে যে-সমস্ত নাগরিকের বক্তব্য আমি শুনলাম, তাঁরা সবাই জমির জাতীয়করণ সমর্থন করেছেন বটে তবে এ-সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্ন-ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন তাঁরা।

ফ্রান্সের কথা প্রায়ই উল্লেখ করতে শুনলাম, কিন্তু **কৃষক-মালিকানার** দেশ ফ্রান্স জমিদারি-প্রথার দেশ ইংলণ্ডের চেয়ে জমির জাতীয়করণ থেকে আরও দূরে অবস্থান করছে। এটা সত্যি যে ফ্রান্সে যার কেনার ক্ষমতা আছে সে-ই জমি পেতে পারে, কিন্তু ঠিক এই সুযোগটি থাকার ফলেই সেখানে জমি টুকরোটুকরো ভূমিখণ্ডে ভাগ হয়ে গেছে এবং তা চাষ করছে নিজেদের ও নিজ-নিজ পরিবারের মেহনত দিয়ে স্বল্পবিত্ত ও জমির ওপর প্রধানত নির্ভরশীল যতসব কৃষক। এই ধরনের ভূ-সম্পত্তি এবং এ থেকে উদ্ভূত ছোট হারে পৃথক-পৃথক চাষ-ব্যবস্থা যেমন আধুনিক উন্নত কৃষির পক্ষে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জামের ব্যবহার এড়িয়ে চলে তেমনই তা খোদ কৃষককে সামাজিক অগ্রগতির, ও সবচেয়ে বেশি করে জমির জাতীয়করণের, সবচেয়ে পাকাপোক্ত শত্রু করে তোলে। যে-জমিতে আনুপাতিকভাবে স্বল্প আয়ের জন্যে সমগ্র প্রাণশক্তি তাকে নিয়োগ করতে হচ্ছে সেই জমির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, উৎপাদনের বেশির ভাগ অংশ করের আকারে রাষ্ট্রকে, মামলা-মোকদ্দমার খরচ হিসেবে আইনজীবীদের ও ঋণবাবদ সুদ হিসেবে কুসীদজীবীকে দিতে বাধ্য এবং তার কর্মস্থল সেই

ছোট্ট জমিটুকুর বাইরেকার সকল সামাজিক আন্দোলন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ফরাসিদেশের কৃষক তার জমির টুকরোটি ও সেই জমিতে তার নিছক নামেমাত্র মালিকানাটুকু তবু অসম্ভব অন্ধ অনুরাগভরে আঁকড়ে থাকে। আর এইভাবে ফরাসি কৃষকের মধ্যে গড়ে ওঠে শিল্পের শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে এক মারাত্মক শত্রুতার মনোভাব।

জমির জাতীয়করণের পক্ষে কৃষকের মালিকানার ব্যাপারটি তাই সবচেয়ে বড় বাধা বলে ফ্রান্সের বর্তমান অবস্থায় আমরা এই বিরাট সমস্যাটির সমাধান অবশ্যই সেদেশে খুঁজতে যাব না।

মধ্য-শ্রেণীর কোনো গভর্নমেন্টের অধীনে জমি ছোট-ছোট টুকরোয় ব্যক্তিবিশেষদের কিংবা শ্রমজীবীদের সমিতিগুলির মধ্যে চাষের জন্যে খাজনার ভিত্তিতে বণ্টন করার উদ্দেশ্যে জমির জাতীয়করণ নিষ্পন্ন করলে তা কেবলমাত্র ওই ব্যক্তিবিশেষদের মধ্যেই বেপরোয়া প্রতিযোগিতার জন্ম দেবে এবং তার ফলে ঘটবে ক্রমবর্ধমান হারে **'খাজনা'** বৃদ্ধি ও তা আবার জমি-আত্মসাৎকারীদের নতুন-নতুন সুযোগ জুটিয়ে দেবে কৃষির উৎপাদকদের শোষণ করার।

১৮৬৮ সালে (৬৫) ব্রাসেল্‌সে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে আমাদের জনেক বন্ধু* বলেছিলেন:

> 'জমিতে ছোট-ছোট ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানের রায় অনুসারে অন্ধকার, আর বড়-বড় ভূ-সম্পত্তির ভবিষ্যৎ অন্ধকার ন্যায়বিচারের রায়ে। তাহলে এর একমাত্র একটিই বিকল্প থাকছে। তা হল, জমিকে হতেই হবে গ্রামীণ সমিতিসমূহের সম্পত্তি, অথবা সমগ্র জাতির সম্পত্তি। এই সমস্যার সমাধান করবে ভবিষ্যৎ।'

আমি বলব, ব্যাপারটা ঘটবে উলটো। সামাজিক আন্দোলনের পরিণতি ঘটবে এই সিদ্ধান্তে যে একমাত্র স্বয়ং জাতিই সমগ্র জমির মালিক হতে পারে। কেননা জমি সঙ্ঘবদ্ধ খেত-মজুরদের হাতে তুলে দেবার অর্থ দাঁড়াবে সমাজকে বিশেষ একটিমাত্র উৎপাদক-শ্রেণীর হাতে সমর্পণ করা।

জমির জাতীয়করণ শ্রম ও পুঁজির মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ এক পরিবর্তন ঘটাবে, এবং পরিশেষে কি শিল্পের ক্ষেত্রে ও কি গ্রামীণ ক্ষেত্রে

---

* সীজার দ্য পাপ। — সম্পাঃ

উৎপাদনের পুঁজিতান্ত্রিক রূপটিকে দেবে বাতিল করে। অতঃপর শ্রেণী-বৈষম্য ও শ্রেণীগত বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ও এ-সমস্ত যার ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে সেই অর্থনৈতিক বনিয়াদটিও যাবে লুপ্ত হয়ে। তখন অন্যের শ্রমের খরচে বেঁচে থাকা অতীতের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। তখন আর খোদ সমাজ থেকে পৃথক কোনো গভর্নমেণ্ট বা রাষ্ট্রক্ষমতার অস্তিত্ব থাকবে না! কৃষি, খনিশিল্প, পণ্যোৎপাদন—এক কথায়, উৎপাদনের সকল শাখাই তখন ক্রমশ সংগঠিত হবে একেবারে যথাযথ পদ্ধতিতে। **উৎপাদনের উপায়-উপকরণসমূহের জাতীয় কেন্দ্রীভবন** তখন হয়ে দাঁড়াবে এমন একটি সমাজের জাতীয় ভিত্তি, যে-সমাজ গঠিত হবে যৌথ ও যুক্তিসম্মত পরিকল্পনার ভিত্তিতে সামাজিক ক্রিয়াকলাপে ব্যাপৃত স্বাধীন ও সমকক্ষ উৎপাদকদের সম্মিলন নিয়ে। ঊনবিংশ শতকের বিপুল অর্থনৈতিক অগ্রগতি যে-পথে চলেছে তার জনহিতকর লক্ষ্য হল এই-ই।

১৮৭২ সালের মার্চ-এপ্রিল
মাসে মার্কসের লেখা

১৮৭২ সালের ১৫ জুন
The International Herald
পত্রিকার ১১ নং সংখ্যায়
প্রকাশিত

মূল পাণ্ডুলিপির
সঙ্গে মিলিয়ে
সংবাদপত্রের পাঠ
অনুযায়ী মুদ্রিত

কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

হেগ-এ অনুষ্ঠিত সাধারণ কংগ্রেসের প্রস্তাবাবলী থেকে

১৮৭২ সালের ২ থেকে ৭ সেপ্টেম্বর (৬৬)

১

নিয়মাবলী সম্পর্কে প্রস্তাব

(১৮৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত) লণ্ডন সম্মেলনের নবম-সংখ্যক প্রস্তাবের বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার-সংবলিত নিম্নোক্ত ধারাটি নিয়মাবলীর অন্তর্ভুক্ত সপ্তম-সংখ্যক ধারার নিচে স্থান পাবে।

ধারা ৭-এর ক। বিত্তবান শ্রেণীগুলির যৌথ ক্ষমতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রলেতারিয়েত শ্রেণী হিসেবে সক্রিয় হতে পারে একমাত্র তখনই যখন তা বিত্তবান শ্রেণীগুলির গঠিত সকল পুরনো পার্টির প্রতিপক্ষে স্বতন্ত্র একটি রাজনৈতিক পার্টিতে নিজেকে সংগঠিত করে।

একটি রাজনৈতিক পার্টি হিসেবে প্রলেতারিয়েতের এই সংগঠিত রূপ সমাজ-বিপ্লবের বিজয় ও তার চরম লক্ষ্য শ্রেণীসমূহের বিলুপ্তিসাধন নিশ্চিত করার পক্ষে অপরিহার্য।

অর্থনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ইতিমধ্যেই অর্জিত শ্রমিক শ্রেণীর শক্তিসমূহের মৈত্রীজোটও এই শ্রেণীর হাতে অবশ্যই কাজ করবে তার শোষকদের রাজনৈতিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে এই শ্রেণীটির সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে।

জমি ও পুঁজির মালিক-প্রভুরা যেহেতু সর্বদাই তাদের অর্থনৈতিক একচেটিয়া-ব্যবস্থাগুলির রক্ষায় ও স্থায়িত্বসাধনে এবং শ্রমের দাসত্ববিধানে তাদের রাজনৈতিক বিশেষ সুযোগ-সুবিধাগুলিকে কাজে লাগিয়ে থাকে, তাই রাজনৈতিক ক্ষমতাদখলই প্রলেতারিয়েতের মহান কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।

এই ধারাটি ৫ জনের ভোটের বিরুদ্ধে ২৯ জনের ভোটে গৃহীত হয়; ৮ জন এ-ব্যাপারে ভোটদানে বিরত থাকেন।...

মার্কস ও এঙ্গেলস কর্তৃক লিখিত

পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় এই নামে: 'Résolutions du congrès général tenu a la Haye du 2 au 7 septembre 1872', Londres, 1872 এবং দুটি সংবাদপত্রে — *La Emancipacion*, ৭২ নং সংখ্যা, ২ নভেম্বর, ১৮৭২ সাল ও *The International Herald*, ৩৭ নং সংখ্যা, ১৪ ডিসেম্বর, ১৮৭২ সাল

এঙ্গেলসের পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মিলিয়ে পুস্তিকার পাঠ অনুযায়ী মুদ্রিত

পাণ্ডুলিপি ফরাসি ভাষায় লিখিত

কার্ল মার্কস

হেগ কংগ্রেস

১৮৭২ সালের ৮ সেপ্টেম্বর তারিখে (৬৭) আম্‌স্টার্ডামে অনুষ্ঠিত সভায় প্রদত্ত বক্তৃতার সাংবাদিক-লিখিত প্রতিবেদন অনুসারে

বলা হয়েছে যে অষ্টাদশ শতকে রাজারা ও ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা হেগ-এ মিলিত হতেন তাঁদের রাজবংশগুলির স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে।

আমরাও চেয়েছিলাম ওইখানেই শ্রমিকের বিচার-সভা বসাতে, এ-ব্যাপারে নানা লোকে নানাভাবে আমাদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করা সত্ত্বেও। সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল জনবসতির মাঝখানে আমরা চেয়েছিলাম আমাদের এই মহান সমিতির অস্তিত্বের কথা সজোরে ঘোষণা করতে, ঘোষণা করতে তার প্রসারণ ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তার আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা।

আমাদের এই সিদ্ধান্তের কথা আগে থেকে শুনে লোকে বলেছে যে আমরা নাকি জমি তৈরি করার জন্যে গোপনে দূত পাঠিয়েছি। একথা অবশ্য অস্বীকার করি না যে আমাদের দূতেরা আছে সর্বত্র। তবে তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই আমাদের অচেনা। হেগ শহরে আমাদের দূতেরা হল সেই সমস্ত শ্রমিক যাদের খাটতে হয় হাড়ভাঙা খাটুনি, ঠিক যেমন আম্‌স্টার্ডামে দৈনিক ষোল ঘণ্টা করে যাদের কাজ করতে হয় আমাদের দূতেরা হল তাদেরই দলের লোকজন। এরাই হল আমাদের গোপন দূত, এছাড়া আমাদের আর কোনো দূত নেই। আর সকল দেশেই, যেখানেই আমরা গিয়ে দেখা দিই সেখানেই দেখি আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাতে তারা আগ্রহী হয়ে আছে, কেননা অতি দ্রুত তারা বুঝতে পারে যে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের অবস্থার উন্নতির পথসন্ধান।

হেগ কংগ্রেস তিনটি প্রধান কর্তব্য সম্পাদন করেছে:

এই কংগ্রেস ঘোষণা করেছে শ্রমজীবী শ্রেণীগুলির পক্ষে যে-সমাজ ধসে

পড়ছে সেই পুরনো সমাজের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও সেইসঙ্গে সামাজিক ক্ষেত্রে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা। আর আমরা এটা দেখে সুখী যে লন্ডন সম্মেলনের প্রস্তাবটি এখন থেকে আমাদের নিয়মাবলীর* অন্তর্ভুক্ত হল। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে আমাদের মধ্যে এমন একটি গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল যে-গোষ্ঠীটি রাজনীতি থেকে শ্রমিকদের বিরত থাকার কথা প্রচার করছিল।

এ-কারণে আমরা এটা উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করেছি যে উপরোক্ত ওই নীতিগুলি আমাদের উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে কতখানি বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর বলে আমাদের ধারণা।

শ্রমকে নতুন ধারায় সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে শ্রমিককে একদিন রাজনৈতিক আধিপত্য জয় করে নিতে হবে; তাকে পরাস্ত করতে হবে পুরনো রীতিপ্রথাগুলির সমর্থক পুরনো পলিসিকে, আর এই নীতি কার্যকর না-করার শাস্তি হল পৃথিবীতে তাদের রাজত্বের মুখ কখনও দেখতে-না পাওয়া — নিজেদের কর্তব্যে অবহেলা ও কর্তব্যকর্মকে অবজ্ঞা করার ফলে ঠিক যেমন শাস্তি পেয়েছিলেন একদা প্রাচীন খ্রীস্টিয়ানরা।

তবে আমরা কিন্তু কখনও এমন কথা বলি নি যে উপরোক্ত ওই লক্ষ্য সর্বদা ও সর্বত্র অর্জন করা যাবে হুবহু একই পদ্ধতিতে।

আমরা জানি যে বিভিন্ন দেশের প্রতিষ্ঠানাদি, রীতিনীতি ও ঐতিহ্য আমাদের বিবেচনার মধ্যে ধরতেই হবে। একথাও আমরা অস্বীকার করি না যে আমেরিকা, ইংলন্ড ও সেইসঙ্গে আপনাদের প্রতিষ্ঠানাদির কথা আরও ভালো ক'রে জানলে বলতে পারতাম হয়তো হল্যান্ডের মতো দেশেও শ্রমজীবী মানুষেরা তাদের চরম লক্ষ্য অর্জন করতে পারে শান্তিপূর্ণ উপায়ে। এটা যদি সত্যি হয় তাহলে আমাদের এ-ও স্বীকার করতে হবে যে ইউরোপ মহাদেশের প্রায় সব দেশেই বলপ্রয়োগ হবে আমাদের বিপ্লবের চালক-দন্ড: স্বীকার করতেই হবে যে সে-সব দেশে শ্রমের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গেলে একদিন-না-একদিন আমাদের আশ্রয় নিতে হবে বলপ্রয়োগের।

হেগ কংগ্রেস আমাদের সাধারণ পরিষদের হাতে নতুন-নতুন ও অধিকতর

---

* এই গ্রন্থের ১৪৩ পৃষ্ঠা দেখুন। — সম্পাঃ

ক্ষমতা অর্পণ করেছে। বস্তুত, এমন একটা সময়ে যখন বিভিন্ন দেশের রাজা বার্লিনে সমবেত হয়েছেন (৬৮) এবং সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ও অতীত যুগের শক্তিশালী প্রতিনিধিবর্গের ওই সভা অনুষ্ঠানের ফলস্বরূপ যখন আমাদের বিরুদ্ধে নতুন-নতুন ও কঠিনতর দমনপীড়নের ব্যবস্থাদি গৃহীত হতে চলেছে ও নির্যাতনের রীতি চালু করার ব্যবস্থা হচ্ছে, তখনই হেগ কংগ্রেস তার সাধারণ পরিষদের ক্ষমতাদি বৃদ্ধি করা ও যে-সংগ্রাম অদূর-ভবিষ্যতে শুরু হতে চলেছে ও বিচ্ছিন্নতার ফলে এই সংগ্রাম-সম্পর্কিত যে-সমস্ত বৈপ্লবিক কার্যকলাপ শক্তিহীন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা সেগুলিকে কেন্দ্রীভূত করা বিজ্ঞজনোচিত ও প্রয়োজনীয় বলে জ্ঞান করেছে। তাছাড়া সাধারণ পরিষদের এই কর্তৃত্ববৃদ্ধিতে একমাত্র আমাদের শত্রুরা ছাড়া আর কে সন্দেহ পোষণ করতে পারে? কিন্তু পরিষদের কি কোনো আমলাতন্ত্র ও সশস্ত্র পুলিশবাহিনী আছে যারা পরিষদের ইচ্ছা অন্যের ওপর চাপিয়ে দেবে? আর সাধারণ পরিষদের এই কর্তৃত্ব কি বিশুদ্ধ নৈতিক কর্তৃত্বই নয় এবং পরিষদ কি তার সকল সিদ্ধান্তই পেশ করে থাকে না সেইসব ফেডারেশনের কাছে, যে-ফেডারেশনগুলির ওপর ওইসব সিদ্ধান্ত কার্যকর করার দায়িত্ব ন্যস্ত? এই পরিস্থিতিতে রাজারা যদি কখনও পড়েন, যদি তাঁদের সেনাবাহিনী, পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটতন্ত্রের সাহায্যবঞ্চিত হয়ে কখনও এমন অবস্থায় পড়তে হয় যে নিছক নৈতিক প্রভাব ও কর্তৃত্বের বলে তাঁদের ক্ষমতা বজায় রাখতে হচ্ছে তাহলে কী হবে? তাহলে তাঁরা বিপ্লবের দুর্জয় অগ্রগতির সামনে পরিণত হবেন দুর্বল তালপাতার সেপাইয়ে।

পরিশেষে বলি, হেগ কংগ্রেস সাধারণ পরিষদের দপ্তর স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দিয়েছে নিউ ইয়র্কে। বহু লোক, এমনকি আমাদের কিছু-কিছু বন্ধুজনও, এই সিদ্ধান্তে আশ্চর্য হয়েছেন বলে মনে হয়। কিন্তু তাঁরা কি ভুলে যাচ্ছেন যে আমেরিকা ক্রমশ প্রধানত শ্রমজীবী মানুষের দেশ হয়ে উঠছে, ভুলে যাচ্ছেন যে প্রতি বছর ওই মহাদেশে বাস উঠিয়ে চলে যাচ্ছে পাঁচ লক্ষ করে মানুষ এবং তারা শ্রমজীবী মানুষ, ভুলে যাচ্ছেন কি যে শ্রমজীবী মানুষের প্রাধান্যের ওই ভূমিতে আমাদের আন্তর্জাতিককে শক্ত শিকড় নামাতেই হবে? এছাড়া কংগ্রেসের অপর একটি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাধারণ পরিষদকে অধিকার দেয়া হয়েছে আমাদের সাধারণ স্বার্থসাধনের পক্ষে

প্রয়োজনীয় ও যোগ্য বিবেচনা করলে কিছু-কিছু নতুন লোককে পরিষদের সদস্যদের ভোটে সদস্য নির্বাচন করে নিতে। আশা করা যাক যে পরিষদ যথেষ্ট বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে এমন সমস্ত লোক বেছে নেবে যাঁরা তাঁদের কাজের যোগ্য হবেন এবং ইউরোপে আমাদের সমিতির পতাকা দৃঢ় হাতে বহন করে নিতে সমর্থ হবেন।

নাগরিক বন্ধুগণ, আন্তর্জাতিকের মূল নীতিটির কথা একবার চিন্তা করা যাক। সে নীতি হল সংহতি! এই জীবনদায়িনী নীতিকে দৃঢ় এক ভিত্তিভূমির ওপর, সকল দেশের সকল শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে পারলে তবেই যে-মহান লক্ষ্য আমরা নিজেদের সামনে নির্দিষ্ট করেছি তা অর্জন করতে পারব। বিপ্লব সফল করার জন্যে প্রয়োজন সংহতির, আর এই সংহতির এক মহান উদাহরণ আমাদের জানা আছে—তা হল প্যারিস কমিউনের অভিজ্ঞতা। প্যারিস কমিউনের যে পতন ঘটেছে তার কারণ, প্যারিসের প্রলেতারিয়েতের এই পরম অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমতালে ওই সময়ে এক ব্যাপক বৈপ্লবিক আন্দোলন মাথা তোলে নি অন্যান্য দেশকেন্দ্রেও — বার্লিনে, মাদ্রিদে ও অন্যান্য জায়গায়।

আমার নিজের কথা বলতে পারি। সকল শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে ভবিষ্যতে এই ফলপ্রসূ সংহতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রাণপণ প্রয়াস চালিয়ে যাব, অবিচলভাবে কাজ করে যাব। আমি মোটেই আন্তর্জাতিক থেকে সরে যাচ্ছি না, যেমন অতীতে আমার সকল প্রচেষ্টা নিয়োজিত হয়েছে তেমনই আমার বাকি জীবনও নিয়োজিত হবে সামাজিক মতাদর্শগুলির বিজয় অর্জনে। আর আপনারা এ-ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারেন যে একদিন এই মতাদর্শগুলি প্রলেতারিয়েতের বিশ্ব-বিজয় সম্ভব করে তুলবে।

রচনাটি প্রকাশিত হয়
La Liberté পত্রিকার
৩৭ নং সংখ্যায়, ১৮৭২
সালের ১৫ সেপ্টেম্বর
তারিখে এবং *Der*
Volksstaat পত্রিকার
৭৯ নং সংখ্যায়, ১৮৭২
সালের ২ অক্টোবর তারিখে

Der Volksstaat
পত্রিকার পাঠের সঙ্গে
মিলিয়ে *La Liberté*-র
পাঠ অনুযায়ী মুদ্রিত

পাণ্ডুলিপি ফরাসি
ভাষায় লিখিত

কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

পত্রাবলী

হ্যানোভারস্থিত ল. কুগেলমান সমীপে মার্কস

লণ্ডন, ১১ জুলাই, ১৮৬৮

...*Centralblatt* (৬৯) প্রসঙ্গে বলতে হয়, মূল্য কথাটিতে যদি আদৌ কিছু বোঝা যায় তাহলে আমার সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করতেই হবে, একথা স্বীকার করে লেখকটি কিন্তু সর্বাধিক সম্ভব নতিস্বীকারই করেছে। বেচারা দেখতে পায় নি যে, আমার বই-এ 'মূল্য' (৭০) সম্পর্কে কোনো অধ্যায় যদি নাও থাকত, তাহলেও প্রকৃত সম্পর্কগুলির যে বিশ্লেষণ আমি দিয়েছি তার ভিতরই সত্যকার মূল্য-সম্পর্কের প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত পাওয়া যেত। আলোচিত বিষয়টি এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা থেকেই আসছে মূল্যের ধারণাটিকে প্রমাণ করার প্রয়োজন নিয়ে এত সব কথার কচ্‌কচি। এমনকি প্রতিটি শিশুও জানে যে, কোনো জাতি যদি, এক বছরের জন্যে নয়, কয়েক সপ্তাহের জন্যেও কাজ করা বন্ধ রাখে, তাহলে সে জাতি অনাহারে মারা পড়ে। সকলেই একথাও জানে যে, বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাবার মতো এক-একটা উৎপন্নরাশির জন্যে লাগে সমাজের মোট শ্রমের বিভিন্ন এবং পরিমাণগতভাবে নির্ধারিত এক একটা রাশি। এ তো স্বতঃসিদ্ধ যে, নির্দিষ্ট অনুপাতে সামাজিক শ্রম **বণ্টনের** এই প্রয়োজনকে সামাজিক উৎপাদনের একটি **বিশেষ রূপের** দ্বারা দূর করা যায় না; বদল হতে পারে কেবল **তার প্রকাশের** রূপটা। কোনো প্রাকৃতিক নিয়মকে বাতিল করা যায় না। এই নিয়মগুলি যে রূপের মধ্যে কাজ করে, সেই **রূপটিই** শুধু ঐতিহাসিকভাবে বিভিন্ন অবস্থায় পরিবর্তিত হতে পারে। অথচ যে সমাজে ব্যক্তিগত শ্রমোৎপন্নের **ব্যক্তিগত বিনিময়ের** মধ্যে দিয়ে সামাজিক শ্রমের অন্তঃসম্পর্ক অভিব্যক্ত হয়, সেই সামাজিক স্তরে শ্রমের আনুপাতিক বণ্টন কার্যকরী থাকে যে রূপের মধ্যে, সেটা হল ঠিক এই উৎপন্নগুলিরই **বিনিময়-মূল্য।**

মূল্যের নিয়ম **কীভাবে** কাজ করে তাই বোঝানোই হল বিজ্ঞানের কাজ। অতএব, আপাতদৃষ্টিতে এই নিয়মের বিরোধী এমন সমস্ত ঘটনাকেই কেউ যদি একেবারে গোড়াতেই 'ব্যাখ্যা করতে' চায়, তাহলে তাকে বিজ্ঞানের **আগে** বিজ্ঞানকে উপস্থিত করতে হবে। রিকার্ডো ঠিক এই ভুলই করেছিলেন -- মূল্য সম্পর্কিত (৭১) তাঁর প্রথম অধ্যায়ে তিনি আমাদের কাছে তখনও সিদ্ধ নয় এমন সমস্ত সম্ভাব্য বর্গগুলিকে **আগেই ধরে নিয়ে** মূল্যের নিয়মের সঙ্গে তাদের সঙ্গতি প্রমাণের চেষ্টা করেছেন।

অপরদিকে ব্যাপারটি আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন, **তত্ত্বের ইতিহাস** থেকে সুনিশ্চিতভাবেই দেখা যায় যে, মূল্য-সম্পর্কের ধারণা **বরাবরই একই রয়েছে** যদিও কমবেশী স্পষ্ট, কমবেশী মোহবিজড়িত অথবা কমবেশী বৈজ্ঞানিকভাবে যথাযথ। যেহেতু চিন্তাপ্রক্রিয়া নিজেই কতকগুলি বিশেষ অবস্থা থেকে উদ্ভূত এবং নিজেই একটি **প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া**, সেইহেতু সত্যকারের সার্থক চিন্তা সর্বদাই একই থাকবে এবং পরিবর্তিত হবে শুধু ক্রমে ক্রমে বিকাশের পরিপক্কতা অনুসারে, চিন্তা করার দেহাঙ্গটির বিকাশ সমেত। বাকী সবকিছুই অর্থহীন প্রলাপ।

স্থূল অর্থনীতিবিদদের এ সম্পর্কে ক্ষীণতম ধারণাও নেই যে, বাস্তব প্রাত্যহিক বিনিময়-সম্পর্কগুলি সরাসরি মূল্যের পরিমাণের সঙ্গে **সোজাসুজি এক** হতে পারে **না**। বুর্জোয়া সমাজের আসল ব্যাপারই হচ্ছে ঠিক এই যে, সেখানে আগে থেকে (a priori) উৎপাদনের কোনো সচেতন সামাজিক নিয়ন্ত্রণ নেই। যা যুক্তিসিদ্ধ এবং স্বাভাবিকভাবে আবশ্যক তা শুধু অন্ধভাবে কার্যকর একটা গড় হিসেবেই নিজেকে জাহির করে। আর, স্থূল অর্থনীতিবিদ মনে করেন, তিনি মস্ত বড় আবিষ্কার করছেন, যখন অভ্যন্তরীণ অন্তঃসম্পর্ক উদ্‌ঘাটনের বিপরীতে গর্বভরে দাবি করেন যে দৃশ্যত ব্যাপার অন্যরূপ। আসলে তাঁর গর্বটা এই যে, তিনি দৃশ্য রূপকে আঁকড়ে থাকেন এবং তাকেই তিনি চরম বলে মনে করেন। তাহলে আদৌ বিজ্ঞানের দরকার কী?

কিন্তু বিষয়টির আর একটি পটভূমিকাও আছে। একবার যদি অন্তঃসম্পর্কটি বুঝতে পারা যায়, তাহলে বিদ্যমান অবস্থার চিরস্থায়ী প্রয়োজন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ধসে পড়ার আগেই, তার সমস্ত তত্ত্বগত বিশ্বাস ধসে পড়ে। তাই, এই চিন্তাহীন বিভ্রান্তিকে জীইয়ে রাখা হচ্ছে একান্তভাবেই শাসক-শ্রেণীর

স্বার্থ। অর্থনীতিবিজ্ঞানে একেবারেই চিন্তার কোনো স্থান নেই, এই কথা বলা ছাড়া আর যাদের হাতে কোনো বৈজ্ঞানিক তুরুপের তাস নেই, সেই সব চাটুকার বাচালদের পয়সা দিয়ে পোষার আর কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

কিন্তু আর না, satis superque (যথেষ্ট হয়েছে)। অন্তত এটুকু দেখা যাচ্ছে, বুর্জোয়াদের এই পুরোহিতরা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছেন: শ্রমিকেরা, এমনকি শিল্পপতিরা ও ব্যবসায়ীরাও যখন আমার বই* পড়ে বুঝতে পারেন এবং অসুবিধা হয় না, তখন এই **'পণ্ডিত** কেরানীরা' (!) অভিযোগ করছেন যে, আমি তাঁদের বোধশক্তির কাছে অত্যধিক দাবি করছি।...

১৯০১-১৯০২ সালের *Die Neue Zeit* পত্রিকার Bd. 2, ৭ নং সংখ্যায় সংক্ষেপে প্রথম প্রকাশিত হয়; 'ল. কুগেলমান সমীপে মার্কসের চিঠিপত্র' বইয়ে পূর্ণাকারে রুশ ভাষায় প্রকাশিত হয়

জার্মান ভাষার পাণ্ডুলিপি অনুসারে মুদ্রিত

* ক. মার্কস, 'পুঁজি'। — সম্পাঃ

নিউ ইয়র্কস্থিত ফ. বল্‌তে সমীপে মার্ক্স

[লন্ডন,] ২৩ নভেম্বর, ১৮৭১

...সোশ্যালিস্ট বা আধা-সোশ্যালিস্ট গোষ্ঠীগুলির স্থলে সংগ্রামের জন্যে শ্রমিক শ্রেণীর একটি সত্যকার সংগঠন গড়াই ছিল **আন্তর্জাতিক** প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য। আদি নিয়মাবলী ও উদ্বোধনী ভাষণের দিকে একবার তাকালেই একথা বোঝা যায়। ওদিকে আবার, ইতিহাসের গতিপথ যদি ইতিমধ্যেই সংকীর্ণ গোষ্ঠীবাদকে চূর্ণ করে না দিত, তাহলে আন্তর্জাতিক নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পারত না। সোশ্যালিস্ট গোষ্ঠীবাদ আর সত্যকার শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশ চলে সর্বদাই পরস্পরের বিপরীত অনুপাতে। যতদিন শ্রমিক শ্রেণী স্বাধীন ঐতিহাসিক আন্দোলনের উপযোগী পরিপক্বতা লাভ না করে, ততদিন পর্যন্ত সংকীর্ণতাবাদী গোষ্ঠীগুলির অস্তিত্বের (ঐতিহাসিকভাবে) সার্থকতা থাকে। এই পরিপক্বতা এলেই, সমস্ত গোষ্ঠীই মূলত প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়ে। কিন্তু ইতিহাসে সর্বত্র যা ঘটেছে, আন্তর্জাতিকের ইতিহাসের বেলাতেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটল। অচলিত হয়ে পড়েছে যা তা চায় নবার্জিত রূপের মধ্যে নিজের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্ব।

শ্রমিক শ্রেণীর সত্যকার আন্দোলন সত্ত্বেও আন্তর্জাতিকেরই মধ্যে যেসব গোষ্ঠী ও অপেশাদার পরীক্ষা-নিরীক্ষাকারীর দল নিজেদের প্রতিষ্ঠা বজায় রাখার চেষ্টা করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে **সাধারণ পরিষদের অবিরাম সংগ্রামের** ইতিহাসই হচ্ছে আন্তর্জাতিকের ইতিহাস। এই সংগ্রাম চলেছিল **কংগ্রেসগুলিতে**, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী সংগ্রাম চলেছিল বিভিন্ন শাখার সঙ্গে সাধারণ পরিষদের পৃথক পৃথক বৈঠকের মাধ্যমে।

প্যারিসে প্রুধোঁপন্থীরা (মিউচুয়ালিস্ট) (৭২) সমিতির সহ-প্রতিষ্ঠাতা ছিল বলে স্বভাবতই সেখানে প্রথম কয়েক বছর লাগামটা তাদের হাতেই ছিল।

পরে অবশ্য সেখানে তাদের বিপরীতে যৌথবাদী, পজিটিভিস্ট ইত্যাদি গোষ্ঠী গঠিত হয়।

জার্মানিতে ছিল লাসালপন্থীদের চক্র। কুখ্যাত শ্‌ভাইট্‌সারের সঙ্গে আমি নিজে দু'বছর পত্রালাপ চালিয়েছিলাম এবং তাঁর কাছে তর্কাতীতভাবে প্রমাণ করেছিলাম যে, লাসালীয় সংগঠন গোষ্ঠীগত সংগঠন ছাড়া কিছুই নয়, এবং সেইজন্যেই আন্তর্জাতিক যে **প্রকৃত** শ্রমিক-আন্দোলনের সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করছে, তা এই সংগঠনের প্রতিকূল। আমার এই যুক্তি না বোঝার মতো বিশেষ 'কারণ' অবশ্য তাঁর ছিল।

আন্তর্জাতিকের অভ্যন্তরে **নিজেকে নেতা বানিয়ে 'সোশ্যালিস্ট গণতন্ত্রের সংঘ'** নামে একটি **দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক** গঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে ১৮৬৮ সালের শেষভাগে রুশদেশবাসী বাকুনিন **আন্তর্জাতিকে** যোগ দেন। সর্বপ্রকারের তাত্ত্বিক জ্ঞান বিবর্জিত এই ব্যক্তিটি দাবি করেন যে, এই পৃথক সংস্থাটিই নাকি আন্তর্জাতিকের **বৈজ্ঞানিক** মতবাদ প্রচারের প্রতিনিধি এবং এইটেই হচ্ছে নাকি **আন্তর্জাতিকের অভ্যন্তরে** এই দ্বিতীয় **আন্তর্জাতিকের** বৈশিষ্ট্য।

তাঁর কর্মসূচিটি হচ্ছে যথেচ্ছ যোগাড় করা ভাসা-ভাসা এক খিচুড়ি **শ্রেণীসমূহের সাম্য** (!), সামাজিক আন্দোলনের **সূচনাবিন্দু** হিসেবে **উত্তরাধিকার লাভের অধিকারের বিলোপসাধন** (স্যাঁ-সিমোঁ মার্কা গাঁজাখোরি), **আপ্তবাক্য** হিসেবে আন্তর্জাতিকের **সভ্যদের** অবশ্য-গ্রহণীয় **নিরীশ্বরবাদ** ইত্যাদি, এবং প্রধান আপ্তবাক্য হিসেবে (**প্রুধোঁপন্থীদের মতো**) — **রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে বিরত থাকা।**

এই ছেলেভোলানো আষাঢ়ে গল্পটা **সহানুভূতিমূলক সমর্থন** পেয়েছিল (এবং এখনও কিছুটা **সমর্থন** পাচ্ছে) ইতালিতে এবং স্পেনে, যেখানে শ্রমিক-আন্দোলনের বাস্তব পূর্বশর্ত খুব অল্পই বিকশিত, এবং লাতিন সুইজারল্যান্ড ও বেলজিয়মের মুষ্টিমেয় দাম্ভিক, উচ্চাভিলাষী ও অন্তঃসারশূন্য মতবাগীশদের মধ্যে।

বাকুনিনের কাছে অবশ্য তাঁর মতবাদটা (প্রুধোঁ, স্যাঁ-সিমোঁ প্রমুখের কাছ থেকে সংগ্রহ করা আবর্জনা) আগেও এবং এখনও একটি গৌণ ব্যাপার, তাঁর ব্যক্তিগত আত্মপ্রতিষ্ঠার একটা উপায় মাত্র। তাত্ত্বিক হিসেবে কিছু-না হলেও কুচক্রী হিসেবে কিন্তু তিনি ওস্তাদ।

সাধারণ পরিষদকে কয়েক বছর ধরে লড়াই চালাতে হয়েছে এই ষড়্‌যন্ত্রের বিরুদ্ধে (এই ষড়্‌যন্ত্রকে ফরাসি প্রুধোঁপন্থীরা, বিশেষ করে **ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চলে**, কিছুটা পর্যন্ত সমর্থন করেছিল)। অবশেষে, সম্মেলনের ১.২ এবং ৩, নবম, ষোড়শ ও সপ্তদশ প্রস্তাবের সাহায্যে পরিষদ তার দীর্ঘ-প্রস্তুত আঘাত হানল (৭৩)।

স্পষ্টতই সাধারণ পরিষদ ইউরোপে যার বিরুদ্ধে লড়েছে আমেরিকায় তাকে সমর্থন করবে না। ১, ২, ৩ এবং নবম প্রস্তাব এখন নিউ ইয়র্ক কমিটির হাতে এমন একটা বৈধ হাতিয়ার তুলে দিল যার সাহায্যে তা সমস্ত গোষ্ঠীবাদ ও অপেশাদার উপদলের অবসান ঘটাতে পারবে এবং প্রয়োজন হলে তাদের বহিষ্কৃত করতে পারবে।...

শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক আন্দোলনের চরম লক্ষ্য অবশ্যই শ্রমিক শ্রেণীর জন্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা জয় এবং তার জন্যে স্বভাবতই প্রয়োজন শ্রমিক শ্রেণীর এমন একটি প্রাথমিক সংগঠন যা তার অর্থনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উদ্ভূত হয়ে কিছুটা পর্যন্ত বিকশিত হয়ে উঠেছে।

অন্যদিকে অবশ্য, যে আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণী শাসক-শ্রেণীসমূহের বিরুদ্ধে **শ্রেণী** হিসেবে এগিয়ে আসে এবং বাইরে থেকে চাপ সৃষ্টির দ্বারা তাদের পরাজিত করতে চেষ্টা করে এমন প্রত্যেকটি আন্দোলনই রাজনৈতিক আন্দোলন। যেমন, কোনো একটি বিশেষ কারখানায়, এমনকি কোনো একটি বিশেষ শিল্পে ধর্মঘট ইত্যাদির দ্বারা পৃথক-পৃথক ভাবে পুঁজিপতিদের কাজের ঘণ্টা কমাতে বাধ্য করার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণভাবে অর্থনৈতিক আন্দোলন। কিন্তু, দিনে আট ঘণ্টা কাজ ইত্যাদির **আইন** প্রণয়নে বাধ্য করার আন্দোলন **রাজনৈতিক** আন্দোলন। এইভাবে, শ্রমিকদের পৃথক-পৃথক অর্থনৈতিক আন্দোলনের মধ্য থেকে সর্বত্র গড়ে ওঠে **রাজনৈতিক** আন্দোলন, অর্থাৎ **শ্রেণীর** আন্দোলন — যার উদ্দেশ্য হল সাধারণরূপে অর্থাৎ সমগ্রভাবে সমাজের পক্ষে বাধ্যতামূলক আকারে সে শ্রেণীর স্বার্থসাধন। এই আন্দোলনগুলির জন্যে যদি আগে থেকেই কিছুটা পরিমাণ সংগঠন থাকার প্রয়োজন থাকে, তাহলে এই আন্দোলনগুলিও আবার একইভাবে এই সংগঠনকে বিকশিত করে তোলার উপায়ও বটে।

যৌথশক্তির, অর্থাৎ শাসক-শ্রেণীর রাজনৈতিক শক্তির বিরুদ্ধে কোনো

চূড়ান্ত অভিযানে নামার মতো যথেষ্ট অগ্রসর সংগঠন যদি শ্রমিক শ্রেণীর না থাকে তাহলে শাসক-শ্রেণীগুলির শক্তির বিরুদ্ধে অবিরাম আন্দোলন চালিয়ে এবং এই শ্রেণীগুলির নীতির প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব অবলম্বন করে শ্রমিক শ্রেণীকে অন্তত সেজন্যে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। নতুবা, শ্রমিক শ্রেণী তাদের হাতের পুতুল হয়ে থাকবে, যেমনটি দেখা গিয়েছিল ফ্রান্সের সেপ্টেম্বর বিপ্লবে (৭৪) এবং যেমনটি কিছুটা পরিমাণে প্রমাণিত হয়েছে ইংলণ্ডে শ্রীযুক্ত গ্ল্যাডস্টোন ও তাঁর দলবল আজও পর্যন্ত সফলভাবে যে খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন তা থেকে।

'Briefe und Auszüge aus Briefen von Joh. Phil. Becker, Jos. Dietzgen, Friedrich Engels, Karl Marx u. A. an F. A. Sorge und Andere'. Stuttgart, 1906 বইয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রথম প্রকাশিত এবং ক. মার্কস ও ফ. এঙ্গেলস, 'রচনাবলি', ১৯৩৫ সাল, ২৬ খণ্ডে রুশ ভাষায় সম্পূর্ণ আকারে প্রকাশিত

জার্মান ভাষার পাণ্ডুলিপি ও বইয়ের পাঠ অনুসারে মুদ্রিত

মিলানস্থিত ত. কুনো সমীপে এঙ্গেলস

লণ্ডন, ২৪ জানুয়ারি, ১৮৭২

...১৮৬৮ সাল পর্যন্ত বাকুনিন আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে এসেছেন এবং বার্ন শান্তি কংগ্রেসে (৭৫) ফেঁসে যাবার পর আন্তর্জাতিকে যোগদান করেছেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আবার **তার অভ্যন্তরে** সাধারণ পরিষদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাতে আরম্ভ করেন। প্রুধোঁবাদ ও কমিউনিজমের খিচুড়ি পাকিয়ে বাকুনিনের নিজস্ব এক অদ্ভুত তত্ত্ব আছে, যার মোদ্দা কথা হচ্ছে এই যে, তিনি মনে করেন যে-প্রধান অভিশাপটাকে উচ্ছেদ করতে হবে তা পুঁজি নয়, অর্থাৎ সমাজ-বিকাশের ফলে উদ্ভূত পুঁজিপতিদের ও মজুরিনির্ভর-শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণী-বিরোধ নয়, তা হচ্ছে গিয়ে **রাষ্ট্র**। ব্যাপক সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিকরা যেক্ষেত্রে আমাদের মতো এই মতই পোষণ করে যে নিজেদের সামাজিক বিশেষ সুবিধাগুলি রক্ষার উদ্দেশ্যে শাসক-শ্রেণীসমূহের, জমিদারদের ও পুঁজিপতিদের হাতের সংগঠন ছাড়া রাষ্ট্রশক্তি আর কিছুই নয়, সেক্ষেত্রে বাকুনিনের মত হচ্ছে এই যে **রাষ্ট্রই** পুঁজি সৃষ্টি করেছে এবং পুঁজিপতিরা পুঁজি পেয়েছে **শুধু রাষ্ট্রেরই কৃপায়**। অতএব রাষ্ট্রই হচ্ছে প্রধান অভিশাপ, তাই সর্বোপরি রাষ্ট্রকেই উচ্ছেদ করতে হবে, তাহলে পুঁজি আপনা থেকেই ধ্বংস হয়ে যাবে। ওদিকে আমরা বলি: পুঁজিকে খতম করো, মুষ্টিমেয়ের হাতে উৎপাদনের সমস্ত উপায়-উপকরণের কেন্দ্রীকরণের অবসান ঘটাও, তাহলে রাষ্ট্রের পতন হবে আপনা থেকেই। পার্থক্যটি মৌলিক: আগে একটা সামাজিক ওলটপালট ছাড়া রাষ্ট্রের উচ্ছেদ অর্থহীন প্রলাপ; পুঁজির উচ্ছেদই **হচ্ছে** সামাজিক ওলটপালট এবং এর ফলে সমস্ত উৎপাদন-পদ্ধতিরই পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু বাকুনিনের কাছে যেহেতু রাষ্ট্রই হচ্ছে প্রধান অভিশাপ

তাই রাষ্ট্রের, — সে প্রজাতন্ত্রই হোক, রাজতন্ত্রই হোক বা অন্য যাকিছু হোক, — যে-কোনো ধরনের রাষ্ট্রেরই অস্তিত্ব বজায় রাখে যা এমন কিছুই করা চলবে না। অতএব, **সমস্ত রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ বিরতি।** কোনো রাজনৈতিক কাজ করা, বিশেষত নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা হবে নীতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। কর্তব্য হল প্রচার চালানো, রাষ্ট্রকে এলোপাতাড়ি গালাগালি দিয়ে যাওয়া, শ্রমিকদের সংগঠিত করা এবং যখন **সমস্ত** শ্রমিক সপক্ষে এসে গেছে অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠকে দলে টানা হয়ে গেছে, তখন ভেঙে দাও সমস্ত সরকারী প্রতিষ্ঠানকে, উচ্ছেদ করো রাষ্ট্রকে এবং তার জায়গায় বসাও আন্তর্জাতিকের সংগঠনকে। স্বর্ণযুগের সূচনাকারী এই মহাকীর্তিটিকে বলা হয়েছে **সামাজিক বিলোপ।**

এই সবকিছুই অত্যন্ত র‍্যাডিকাল শোনায় এবং সবকিছু এতই সহজ যে, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মুখস্থ হয়ে যায়। এইজন্যেই বাকুনিনের তত্ত্ব এত দ্রুত ইতালি ও স্পেনের তরুণ আইনজীবী, ডাক্তার ও অন্যান্য মতবাগীশদের মধ্যে সাড়া পেয়েছে। কিন্তু শ্রমিকেরা কখনও নিজেদের এ কথায় ভোলাতে দেবে না যে, তাদের দেশের সামাজিক ব্যাপারটা তাদেরও ব্যাপার নয়। শ্রমিকেরা প্রকৃতিগতভাবেই **রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সক্রিয়** এবং যে তাদের বোঝানোর চেষ্টা করবে যে, রাজনীতি তাদের পরিত্যাগ করা উচিত, তাকেই তারা শেষে পরিত্যাগ করবে। শ্রমিকদের সর্ব অবস্থাতেই রাজনীতি থেকে বিরত থাকা উচিত, শ্রমিকদের কাছে এই কথা প্রচার করার অর্থ পুরোহিত-পান্ডাদের বা বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের কবলে তাদের ঠেলে দেওয়া।

বাকুনিনের মত অনুসারে যেহেতু রাজনৈতিক সংগ্রামের জন্যে আন্তর্জাতিক গঠিত হয় নি, তা গঠিত হয়েছে যাতে সামাজিক বিলোপের সঙ্গে সঙ্গেই তা পুরাতন রাষ্ট্র-সংগঠনের স্থান নিতে পারে, তাই তাকে ভবিষ্যৎ সমাজের বাকুনিনবাদী আদর্শের যথাসম্ভব কাছাকাছি আসতে হবে। এই সমাজে সর্বোপরি কোনো **কর্তৃত্ব** থাকবে না, কারণ কর্তৃত্ব — রাষ্ট্র — পরম অভিশাপ। (একটি নির্ধারক ইচ্ছা ছাড়া, একটি একক ব্যবস্থাপনা ছাড়া একটা কারখানা কি ট্রেন কিম্বা একটি জাহাজ কীভাবে চালানো যাবে তা অবশ্য এঁরা জানান নি।) সংখ্যালঘিষ্ঠের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠের কর্তৃত্বও আর থাকবে না।

প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক গোষ্ঠী হবে স্বায়ত্তশাসিত, কিন্তু প্রত্যেকে যদি নিজের স্বায়ত্তশাসনাধিকার কিছুটা ছেড়ে না দেয়, তাহলে সমাজ, এমনকি মাত্র দু'জন মানুষেরও সমাজ কী করে সম্ভব, সে সম্পর্কেও বাকুনিন পুনরপি নীরব।

অতএব, এই আন্তর্জাতিককেও এই আদর্শ অনুসারে গঠিত করে নিতে হবে। তার প্রত্যেক শাখা এবং প্রত্যেক শাখায় প্রত্যেক ব্যক্তি হবে স্বায়ত্তশাসিত। দূর হোক **বাসেল-প্রস্তাবাবলী** (৭৬), সাধারণ পরিষদকে তা এমন এক অনিষ্টকর কর্তৃত্ব অর্পণ করেছে, যেটা তার নিজের পক্ষেই হীনতাসূচক! যদি এই কর্তৃত্ব **স্বেচ্ছামূলকভাবেও** অর্পিত হয়ে থাকে, তথাপি এর অবসান ঘটাতেই হবে এই **কারণে** যে, সেটা কর্তৃত্ব!

সংক্ষেপে এই হল বুজরুকিটার আসল কথা। কিন্তু, বাসেল-প্রস্তাবাবলীর উদ্ভাবক কারা? **স্বয়ং শ্রী বাকুনিন** এবং তাঁর দলবল!

বাসেল-কংগ্রেসে যখন এই ভদ্রলোকেরা দেখতে পেলেন যে, সাধারণ পরিষদকে জেনেভায় সরিয়ে নিয়ে যাবার অর্থাৎ পরিষদকে নিজেদের হাতে আনবার পরিকল্পনাটিকে কংগ্রেসকে দিয়ে গ্রহণ করাতে তাঁরা পারবেন না, তখন তাঁরা এক ভিন্ন পথ ধরলেন। মহান আন্তর্জাতিকের **অভ্যন্তরেই** তাঁরা 'সোশ্যালিস্ট গণতন্ত্রের সংঘ' নামে এক আন্তর্জাতিক সমিতি স্থাপন করলেন যে অজুহাতে, সেটা বাকুনিনপন্থী ইতালীয় পত্রপত্রিকায়, যেমন *Proletario* ও *Gazzettino Rosa* (৭৭) পত্রিকায় আজকাল ফের দেখা যাচ্ছে: বলা হচ্ছে শীতল ও মন্থরগতি উত্তরের অধিবাসীদের চেয়ে নাকি মাথাগরম লাতিন জাতিদের জন্যে আরও উজ্জ্বল কর্মসূচির প্রয়োজন। সাধারণ পরিষদের বাধার ফলে এই খাসা পরিকল্পনাটি নস্যাৎ হয়ে যায়। আন্তর্জাতিকের **ভিতরে** একটি স্বতন্ত্র **আন্তর্জাতিক** সংগঠনের অস্তিত্ব সাধারণ পরিষদ অবশ্যই বরদাস্ত করতে পারে না। তারপর থেকে বাকুনিন ও তাঁর অনুগামীদের আন্তর্জাতিকের কর্মসূচির পরিবর্তে বাকুনিনের নিজস্ব কর্মসূচিকে প্রতিষ্ঠা করার গোপন চেষ্টার জন্যে নানাভাবে ও নানারূপে এই পরিকল্পনা পুনরাবির্ভূত হয়েছে। ওদিকে আবার আন্তর্জাতিককে আক্রমণ করার প্রয়োজন হলে জুল ফাভ্র ও বিসমার্ক থেকে শুরু করে মাত্সিনি পর্যন্ত সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলই বরাবর

বাকুনিনপন্থীদের ঠিক এই শূন্যগর্ভ বাগাড়ম্বরের বিরুদ্ধেই কামান তাগ করেছেন। তাই মাত্সিনি ও বাকুনিনের বিরুদ্ধে ৫ ডিসেম্বরের আমার বিবৃতিটির প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। বিবৃতিটি *Gazzettino Rosa*-ও প্রকাশ করেছিল।

বাকুনিন-দঙ্গলের কেন্দ্র হচ্ছে কয়েক ডজন জুরাবাসী* যাদের মোট অনুগামীর সংখ্যা বড় জোর দু'শো শ্রমিক হতে পারে। ইতালির তরুণ আইনজীবী, ডাক্তার ও সাংবাদিকদের নিয়েই এদের অগ্রগামী অংশ গঠিত। এরা সর্বত্রই নিজেদের ইতালীয় শ্রমিকদের মুখপাত্র বলে চালায়। এদের কিছু আছে বার্সিলোনায় ও মাদ্রিদে এবং লিয়ঁ ও ব্রাসেল্সে এদের দু-একজনের সাক্ষাৎ মিলবে, কিন্তু তারা প্রায় কেউ শ্রমিক নয়। আমাদের এখানেও এদের একটিমাত্র নমুনা আছে, সে হল রবিন।

কংগ্রেস ডাকা অসম্ভব হয়ে পড়াতে তার পরিবর্তে পরিস্থিতির চাপে সম্মেলন** আহ্বান করতে হয়েছিল বলে এদের একটা অছিলা জুটে যায়। সুইজারল্যাণ্ডের ফরাসি দেশান্তরীদের অধিকাংশই এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, কেননা তাদের মধ্যে এরা (প্রুধোঁপন্থীরা) আত্মীয়ের সন্ধান পায় এবং এর ব্যক্তিগত কারণও ছিল। তাই তারা আক্রমণ শুরু করেছিল। অবশ্য আন্তর্জাতিকের মধ্যে সর্বত্রই অসন্তুষ্ট সংখ্যালঘুদের ও অস্বীকৃত প্রতিভাধরদের সাক্ষাৎ মেলে। তাই পূর্বোক্তেরা ভরসা রেখেছিল এদেরই ওপর এবং সেটা অকারণে নয়। বর্তমানে তাদের সংগ্রামী শক্তি হচ্ছে এরূপ:

১। বাকুনিন নিজে -- এই অভিযানের নেপোলিয়ন।

২। ২০০ জন জুরাবাসী এবং ফরাসি শাখার (জেনেভায় দেশান্তরী) ৪০-৫০ জন।

৩। ব্রাসেল্সে *Liberté* -র (৭৮) সম্পাদক হিন্স. ইনি অবশ্য **প্রকাশ্যে** ওদের সমর্থন করেন না।

---

* সুইজারল্যাণ্ডের জুরা পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা। — সম্পাঃ

** ১৮৭১ সালে প্রথম আন্তর্জাতিকের লণ্ডন সম্মেলনের কথা বলা হচ্ছে। — সম্পাঃ

৪। এখানকার ১৮৭১ সালের ফরাসি শাখার (৭৯) অবশিষ্ট অংশ, এঁদের আমরা কখনও স্বীকার করে নিই নি এবং এরা ইতিমধ্যেই পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। তারপর আছে হের ফন শ্‌ভাইট্‌সরের ধরনের প্রায় ২০ জন লাসালপন্থী, যাদের সকলকেই জার্মান শাখা থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছে (**আন্তর্জাতিক থেকে** একযোগে **বেরিয়ে আসার** প্রস্তাব করেছিল বলে) এবং যারা চরম কেন্দ্রীকরণ ও কঠোর সংগঠনের প্রবক্তা হিসেবে নৈরাজ্যবাদী ও স্বায়ত্তশাসনবাদীদের লীগের সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খেয়ে যায়।

৫। স্পেনে বাকুনিনের কিছু ব্যক্তিগত বন্ধু ও অনুগামী — শ্রমিকদের উপর, বিশেষত বার্সিলোনার শ্রমিকদের উপর যাদের প্রবল প্রভাব আছে অন্তত তত্ত্বগতভাবে। স্পেনীয়রা অবশ্য সংগঠন সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহী এবং অন্যদের ভিতর সংগঠনের অভাবটা চট করে তাদের চোখে পড়ে। এখানে বাকুনিন কতখানি সাফল্যের আশা করতে পারেন তা এপ্রিল মাসের স্প্যানিশ কংগ্রেস না হওয়া পর্যন্ত বোঝা যাবে না এবং যেহেতু শ্রমিকরাই সেখানে প্রাধান্য লাভ করবে, সেইহেতু আমি কোনো দুশ্চিন্তার কারণ দেখি না।

৬। সর্বশেষে, যতদূর জানি ইতালিতে তুরিন, বলোনা ও জিরজেন্তি শাখা **নির্দিষ্ট সময়ের আগেই** কংগ্রেস আহ্বান করার পক্ষে অভিমত ঘোষণা করেছে। বাকুনিনপন্থী পত্রপত্রিকায় দাবি করা হয়েছে যে, ২০টি ইতালীয় শাখা তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, আমি তাদের জানি না। অন্তত প্রায় সর্বত্রই নেতৃত্ব বাকুনিনের বন্ধুদের ও অনুগামীদের হাতে এবং তারা খুব হৈচৈ শুরু করেছে। কিন্তু একটু ভালোভাবে খুঁটিয়ে দেখলে খুব সম্ভব দেখা যাবে, এদের অনুগামীদের সংখ্যা খুব বেশী নয়, কারণ শেষ পর্যন্ত ইতালীয় শ্রমিকদের অধিকাংশ এখনও মাত্‌সিনির পক্ষপাতী এবং যতদিন রাজনীতি থেকে বিরত থাকার সঙ্গে সেখানে আন্তর্জাতিককে এক করে দেখা হবে ততদিন তাই থাকবে।

যেভাবেই হোক, ইতালিতে আপাতত বাকুনিনপন্থীরাই আন্তর্জাতিকের কর্তা। এ নিয়ে অভিযোগ করার বাসনা সাধারণ পরিষদের নেই; নিজেদের খেয়াল অনুসারে যতখুশি আজগবি কাণ্ড করার অধিকার ইতালীয়দের

আছে, সাধারণ পরিষদ তার প্রতিবন্ধকতা করবে শুধু শান্তিপূর্ণ বিতর্ক মারফত। জুরাবাসীরা যে অর্থে কংগ্রেসের কথা বলছে, সেই অর্থে কংগ্রেস দাবি করার অধিকার এদের আছে বটে, কিন্তু আন্তর্জাতিকের যেসব শাখা সবেমাত্র সংগঠনে যোগ দিয়েছে এবং কোনো বিষয়ে কোনো খবর পায় নি, তারাও এই ধরনের একটি ব্যাপারে সঙ্গে সঙ্গেই, বিশেষ করে বিবদমান দুই পক্ষের বক্তব্য না শুনেই, পক্ষ অবলম্বন করে বসছে, এটা অন্তত খুবই তাজ্জব ব্যাপার। এ ব্যাপারে আমার সাদামাঠা অভিমত আমি তুরিনের লোকেদের জানিয়ে দিয়েছি এবং আর যেসব শাখা অনুরূপ মত প্রকাশ করেছে তাদেরও জানাব। কারণ, সার্কুলারে (৮০) সাধারণ পরিষদের বিরুদ্ধে যে মিথ্যা ও দুরভিসন্ধিপ্রসূত অভিযোগ করা হয়েছে, এই ধরনের প্রতিটি ঘোষণা পরোক্ষে তারই অনুমোদন। প্রসঙ্গত, সাধারণ পরিষদ এ বিষয় সম্পর্কে শীঘ্রই তাদের নিজস্ব সার্কুলার প্রচার করবে। এই সার্কুলার প্রচারিত না হওয়া পর্যন্ত মিলানের লোকদের যদি আপনি অনুরূপ ঘোষণা থেকে নিরস্ত করতে পারেন, তাহলে আমাদের বাঞ্ছাই পূর্ণ হয়।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার, যে-তুরিনের লোকেরা জুরাবাসীদের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছে, কাজেকাজেই আমাদেরও স্বৈরতান্ত্রিকতার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে, ঠিক তারাই আবার হঠাৎ সাধারণ পরিষদের কাছে দাবি করেছে যে, তুরিনে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রমিক ফেডারেশানের (৮১) বিরুদ্ধে সাধারণ পরিষদকে এমন স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে যা আগে কখনও করা হয় নি, *Ficcanaso*-র (৮২) বেগহেলিকে বহিষ্কৃত করে দিতে হবে, যদিও তিনি আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত নন, ইত্যাদি। আবার এ সবকিছুই করতে হবে শ্রমিক ফেডারেশানের এ বিষয়ে কী বক্তব্য আছে তা শোনার আগেই।

গত সোমবার (২২ জানুয়ারি) আপনাকে পাঠিয়েছি জুরাবাসীদের সার্কুলার সহ *Révolution Sociale* (৮৩), জেনেভার Égalité-র (৮৪) একটি সংখ্যা (দুর্ভাগ্যক্রমে জেনেভার ফেডেরাল কমিটির (৮৫) জবাব আছে যে সংখ্যায় তার আর একটি কপিও আমার কাছে নেই; এই সংস্থাটি জুরাবাসীদের চেয়ে বিশগুণ বেশী শ্রমিকের প্রতিনিধিত্ব করে) এবং এক কপি *Volksstaat* (৮৬), যা থেকে আপনি জানতে পারবেন, জার্মানির লোকেরা

ব্যাপারটি সম্পর্কে কী ভাবছে। স্যাক্সন আঞ্চলিক কংগ্রেস — ৬০টি এলাকা থেকে সম্মিলিত ১২০ জন প্রতিনিধি — **সর্বসম্মতিক্রমে** সাধারণ পরিষদের স্বপক্ষে মত দিয়েছেন (৪৭)।

বেলজিয়ান কংগ্রেস (ডিসেম্বর, ২৫-২৬) নিয়মাবলীর পুনর্বিচার দাবি করেছে, কিন্তু **নিয়মিত** কংগ্রেসেই (সেপ্টেম্বরে) (৪৮)। ফ্রান্স থেকে আমরা প্রতিদিন অনুমোদনসূচক বিবৃতি পাচ্ছি। এখানে, ইংলণ্ডে অবশ্য এইসব ঘোঁটের জন্যে কোনো সমর্থন নেই। সাধারণ পরিষদ নিশ্চয়ই কয়েকজন আত্মম্ভরী ঘোঁটপাকিয়েকে খুশি করার জন্যে অতিরিক্ত কংগ্রেস আহ্বান করবে না। যতদিন এই ভদ্রলোকেরা নিয়মের চৌহদ্দির মধ্যে থাকবেন, ততদিন সাধারণ পরিষদ সানন্দে তাঁদের খুশিমতো কাজ করতে দেবে — তবে অতি বিভিন্ন ধরনের কতকগুলি লোকের এই জোট শীঘ্রই ভেঙে যাবে। কিন্তু নিয়মাবলী অথবা কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবাবলীর বিরুদ্ধে তাঁরা কিছু করতে শুরু করলেই সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ পরিষদ তার কর্তব্য করবে।

যদি লক্ষ্য করে থাকেন যে, লোকগুলি ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেছে ঠিক সেই সময়টিতে যখন আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে একটা সাধারণ হৈচৈ শুরু হয়েছে, তাহলে একথা আপনার মনে না হয়ে পারে না যে, এ খেলায় নিশ্চয়ই আন্তর্জাতিক পুলিশের হাত আছে। এবং ঠিক তাই। বেজিয়ার্সে জেনেভার বাকুনিনপন্থীরা প্রধান পুলিশ কমিশনারকে তাদের সংবাদদাতা* নিযুক্ত করেছে। দুজন নামকরা বাকুনিনপন্থী, লিয়ঁ-র আলবের্ত রিশার ও লেবলাঁ এখানে এসেছিলেন। সল নামে লিয়ঁ-র একজন শ্রমিকের সঙ্গে তাঁরা কথা বলেন। তাঁকে তাঁরা বলেন, তিয়েরকে উচ্ছেদ করার একমাত্র পন্থা হচ্ছে আবার বোনাপার্টকে সিংহাসনে বসানো এবং **বোনাপার্ট পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে** দেশান্তরীদের মধ্যে **প্রচার** চালানোর জন্যেই তাঁরা **বোনাপার্টের টাকায়** সফরে বেরিয়েছেন! এই ভদ্রলোকেরা যাকে বলেন রাজনীতি থেকে বিরত থাকা, এই হল তার নমুনা! বার্লিনে বিসমার্কের অর্থপুষ্ট *Neuer Social-Demokrat* (৪৯) ঠিক এই সুরেই পোঁ ধরেছে। এ ব্যাপারে রুশ পুলিশ কতটা জড়িত

* ব্যাঙ্কে। — সম্পাঃ

সে প্রশ্নের কোনো জবাব আমি আপাতত দিচ্ছি না, কিন্তু নেচায়েভের ব্যাপারে (৯০) বাকুনিন ওতপ্রোতভাবেই জড়িত ছিলেন (তিনি অবশ্য একথা অস্বীকার করেন, কিন্তু এখানে আমাদের হাতে মূল রুশ দলিলপত্র আছে এবং যেহেতু মার্কস ও আমি রুশ ভাষা বুঝি, সেইহেতু তিনি আমাদের ফাঁকি দিতে পারবেন না)। নেচায়েভ হয় একজন রুশ গুপ্তচর, না হয় সে কাজ করেছে সেই ধরনের। তাছাড়া বাকুনিনের রুশ বন্ধুদের মধ্যে নানারকমের সন্দেহজনক সব লোক রয়েছে।

আপনার চাকুরিটি গেছে শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলাম। আমি তো আপনাকে স্পষ্টই লিখেছিলাম এমন কিছু না করতে যাতে এই ঘটনা ঘটতে পারে। প্রকাশ্য কাজের দ্বারা যে সামান্য ফল অর্জিত হবে তার তুলনায় মিলানে আপনার উপস্থিতি আন্তর্জাতিকের পক্ষে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ, গুপ্তভাবেও অনেক কিছু করা যেতে পারে ইত্যাদি। অনুবাদ ইত্যাদির কাজ পাওয়ার ব্যাপারে যদি আপনাকে কিছু সাহায্য করতে পারি, তাহলে সানন্দে তা করব। **কোন কোন ভাষা থেকে কোন ভাষায়** আপনি তর্জমা করতে পারেন এবং **কীভাবে** আপনাকে সাহায্য করতে পারি জানাবেন।

পুলিশ হারামজাদারা দেখছি আমার ফোটোটিকেও আটকে দিয়েছে। আমি আপনার জন্যে এইসঙ্গে আর একখানি ফোটো পাঠাচ্ছি। আপনি আমাকে আপনার দুখানা ফোটো পাঠাবেন। ওর একখানা দিয়ে মার্কস-কন্যার কাছ থেকে তাঁর বাবার একখানা ফোটো আপনার জন্যে আদায় করা যাবে (দু-একখানা ভালো ফোটো এখনও একমাত্র তাঁরই কাছেই আছে)।

আর একবার বলি, বাকুনিনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট **সমস্ত** লোক সম্পর্কেই একটু সতর্ক থাকবেন। জোট পাকিয়ে থাকা ও চক্রান্ত করা সমস্ত গোষ্ঠীরই স্বভাব। এবিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে, **আপনার যে-কোনো খবর সঙ্গে সঙ্গে** বাকুনিনের কাছে চলে যাবে। তাঁর একটি মূল নীতিই হচ্ছে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা ইত্যাদি ধরনের কাজকে বুর্জোয়া কুসংস্কার বলে গণ্য করা, লক্ষ্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রকৃত বিপ্লবীর কাছে যা অবশ্যই অশ্রদ্ধেয়। রাশিয়ায় একথা তিনি খোলাখুলিই বলে থাকেন; পশ্চিম ইউরোপে অবশ্য এটা গোপন তত্ত্ব।

খুব তাড়াতাড়ি চিঠির জবাব দেবেন। অন্য ইতালীয় শাখাগুলির সঙ্গে সুর মেলাতে যদি মিলান শাখাকে আমরা নিরস্ত করতে পারি, তাহলে সত্যিই তা একটা ভালো কাজ করা হবে।...

F. Engels. 'Politisches
Vermächtnis. Aus
unveröffentlichten Briefen'.
Berlin, 1920
বইয়ে সংক্ষিপ্ত
আকারে প্রথম প্রকাশিত এবং
১৯২৫ সালে বার্লিনে
Die Gesellschaft
পত্রিকার ১১ নং সংখ্যায়
সম্পূর্ণ আকারে প্রকাশিত

জার্মান ভাষার
পাণ্ডুলিপি অনুসারে
মুদ্রিত

হ্বেরটুস্‌বুর্গস্থিত আ. বেবেল সমীপে এঙ্গেলস

লণ্ডন, ২০ জুন, ১৮৭৩

আমি প্রথমে আপনার চিঠির উত্তর দিচ্ছি, কারণ লিব্‌ক্লেখ্‌টের চিঠি এখনও মার্কসের কাছে রয়েছে, আর তিনি ঠিক এই মুহূর্তে তার খোঁজ পাচ্ছেন না।

হেপ্‌নার নয়, কমিটির স্বাক্ষরিত যে-চিঠি ইয়র্ক হেপ্‌নারকে লিখেছিলেন সেই চিঠিতেই আমাদের ভয় হয়েছিল যে, পার্টি কর্তৃপক্ষ যারা দুর্ভাগ্যক্রমে পুরোপুরিই লাসালপন্থী — তারা *Volksstaat*-কে একখানি 'সৎ' *Neuer Social-Demokrat*-এ পরিণত করার জন্যে আপনার কারাবাসের সুযোগ গ্রহণ করবেন। ইয়র্ক স্পষ্টতই এ ধরনের অভিপ্রায়ের কথা স্বীকার করেছিলেন এবং কমিটি সম্পাদকদের নিয়োগ ও অপসারিত করার অধিকার লাভ করেছিল বলেই বিপদটা নিশ্চিতই বেশ গুরুতর মনে হয়েছিল। হেপ্‌নারের আসন্ন বহিষ্কার এই পরিকল্পনাগুলিকে আরও জোরদার করে তুলেছিল। এই অবস্থায় পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত থাকা আমাদের পক্ষে একান্তভাবেই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তাই এই পত্রালাপ...

লাসালবাদের প্রতি পার্টির মনোভাবের কথায় বলি, কী কৌশল অবলম্বন করতে হবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, তা অবশ্য আমাদের চেয়ে আপনিই ভালো বুঝবেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটিও বিবেচনা করতে হবে। আপনার মতো যখন কেউ কিছুটা পরিমাণে নিখিল জার্মান শ্রমিক সংঘের (৯১) প্রতিযোগী হয়ে দাঁড়ায়, তখন সে সহজেই তার প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি একটু বেশী মনোযোগী হয়ে পড়ে এবং সর্বদা প্রথমে তারই কথা ভাবতে অভ্যস্ত হয়। কিন্তু নিখিল জার্মান শ্রমিক সংঘ এবং সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি -- উভয়কে একত্রে ধরলে তারা এখনও জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর একটি অত্যন্ত

ক্ষ্বদ্র সংখ্যালঘ্ব অংশ। স্বদীর্ঘ বাস্তব অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত আমাদের মত হল এই যে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানের এখান-ওখান থেকে কিছ্ব ব্যক্তি ও সদস্যদলকে ফুসলিয়ে আনাটাই প্রচারকার্যের সঠিক কৌশল নয়, সঠিক কৌশল হচ্ছে, যে-বিরাট জনসংখ্যা এখনও নিষ্ক্রিয় রয়েছে তাদের মধ্যে কাজ করা। কাঁচা অবস্থা থেকে টেনে আনা হয়েছে এমন একটিমাত্র লোকের তাজা শক্তির ম্ল্য দশটি লাসালপন্থী দলত্যাগীর চেয়েও বেশী, কারণ তারা সর্বদাই পার্টির মধ্যে তাদের ভ্রান্ত প্রবণতার বীজ বহন করে আনে। আর যদি **স্থানীয় নেতাদের** বাদ দিয়ে শ্বধ্ব জনসাধারণকে টানতে পারা যায়, তাহলেও চলে। কিন্তু দ্বঃখের বিষয়, টানতে গেলে সব সময় এই ধরনের নেতাদের প্ররো দলটিকে জড়িয়েই টানতে হয়। এরা নিজেদের আগেকার মতামতের দ্বারা না হলেও আগেকার প্রকাশ্য বিবৃতিগ্বলির দায়ে আবদ্ধ থাকে এবং তখন তাদের সর্বোপরি প্রমাণ করার চেষ্টা করতে হয় যে, তারা তাদের নীতি ছাড়ে নি, বরং সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টিই **প্রকৃত** লাসালবাদ প্রচার করছে। আইজেনাখে (৯২) তখন এই দ্বর্ঘটনাই ঘটেছিল — অবশ্য তখন হয়তো তা এড়ানো যেত না, কিন্তু এ বিষয়ে বিন্দ্বমাত্র সন্দেহ নেই যে, এরা পার্টির ক্ষতি করেছে এবং এদের অন্তর্ভুক্তি ছাড়া পার্টি অন্তত আজকের মতো এতটা শক্তিশালী হোত না এমন কথা নিশ্চয় করে বলতে পারি না। যাই হোক, এসব লোকের যদি সংখ্যাবৃদ্ধি হয়, তাহলে তাকে আমি দ্বর্ভাগ্যজনক ঘটনা বলেই মনে করব।

'ঐক্যের' চীৎকারে নিজেকে ভোলালে চলবে না। যাদের ম্বখে এই কথাটি সবচেয়ে বেশী লেগে আছে প্রধানত তারাই বিভেদের বীজ বপন করে। ঠিক যেমন এখন স্বইজারল্যান্ডে জ্বরার বাকুনিনপন্থীরা করছে। সব রকমের বিভেদ তারাই উস্কিয়ে তুলেছে, অথচ ঐক্যের জন্যে চীৎকার করছে তারাই সবচেয়ে বেশী। এই ঐক্যপাগলদের হয় বৃদ্ধি কম, যারা সবকিছ্ব মিশিয়ে ঘ্বটে-ঘ্বটে এমন এক অদ্ভুত খিচুড়ি বানাতে চাইছে যা ঠাণ্ডা হতে দেওয়া মাত্রই পার্থক্যগ্বলো আবার ভেসে উঠবে এবং একপাত্রে রয়েছে বলে সেগ্বলি ভেসে উঠবে আগের চেয়ে স্পষ্ট ও তীব্র হয়ে (জার্মানিতে এর চমৎকার দৃষ্টান্ত মিলবে সেই সব লোকের মধ্যে যারা শ্রমিকদের সঙ্গে পেটি-বুর্জোয়ার মিলনের কথা প্রচার করছে) — না হয়, তারা নিজেদের অজ্ঞাতসারে (যেমন,

মুলবের্গার) অথবা সচেতনভাবেই আন্দোলনকে কলুষিত করতে চাইছে। সেইজন্যেই, যারা সবচেয়ে বেশী সংকীর্ণ গোষ্ঠীপন্থী এবং যারা সবচেয়ে ঝগড়াটে ও বদমায়েশ তারাই একেক সময় ঐক্যের জন্যে সবচেয়ে বেশী চীৎকার করে। ঐক্য-চীৎকারকদের জন্যে আমাদের জীবনে সবচেয়ে বেশী দুর্ভোগ ও সবচেয়ে বেশী বেইমানি সইতে হয়েছে।

স্বভাবত প্রত্যেক পার্টি-নেতৃত্বই সাফল্য চায়, এবং এটা খুবই ভালো কথা। কিন্তু কখনও-কখনও এমন পরিস্থিতিও আসে যখন আরও গুরুত্বপূর্ণ বস্তুর জন্যে **আশু** সাফল্যকে বিসর্জন দেবার সাহস থাকা চাই। বিশেষত, আমাদের পার্টির মতো পার্টির পক্ষে, শেষ পর্যন্ত যার সাফল্য একান্তভাবেই সুনিশ্চিত এবং যে পার্টি আমাদের জীবদ্দশাতেই এবং আমাদের চোখের উপরই এত বিপুলভাবে বেড়ে উঠেছে — সেই পার্টির পক্ষে আশু সাফল্য কোনোক্রমেই সব সময়ে এবং একান্তভাবেই প্রয়োজনীয় নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আন্তর্জাতিকের কথাই ধরা যাক। কমিউনের ঘটনার পর আন্তর্জাতিক বিরাট সাফল্য অর্জন করে। বুর্জোয়ারা সাংঘাতিক ভয় পেয়ে একে সর্বশক্তিমান বলে মনে করতে থাকে। এর বিপুল-সংখ্যক সদস্যের বিশ্বাস ছিল অনন্তকাল বুঝি এইভাবেই চলবে। আমরা কিন্তু ভালোভাবেই জানতাম, এ বুদ্‌বুদ ফেটে **যাবেই**। যত আজেবাজে লোক এসে তখন এতে যোগ দেয়। আন্তর্জাতিকের মধ্যের সংকীর্ণ গোষ্ঠীপন্থীরা বেশ ফেঁপে উঠতে থাকে এবং নিজেদের হীনতম ও নির্বোধতম কাজকর্মের অনুমোদনলাভের আশা নিয়ে আন্তর্জাতিকের অপব্যবহার করতে থাকে। আমরা তা করতে দিই নি। এ বুদ্‌বুদ একদিন ফেটে যাবেই তা ভালো করে জানতাম বলে বিপর্যয়কে বিলম্বিত করার দিকে আমাদের মনোযোগ ছিল না, আমরা সতর্ক ছিলাম যাতে আন্তর্জাতিক এই বিপর্যয় থেকে বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল হয়ে বেরিয়ে আসতে পারে। হেগে এই বুদ্‌বুদ ফেটে যায় এবং আপনি তো জানেন, কংগ্রেসের অধিকাংশ প্রতিনিধিই হতাশা নিয়ে ঘরে ফিরে যান। কিন্তু এই যে-হতাশ ব্যক্তিরা ভেবেছিলেন আন্তর্জাতিকের মধ্যে তাঁরা সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও পুনর্মিলনের আদর্শ দেখতে পাবেন, তাঁদের প্রায় সকলেই নিজ-নিজ দেশে যে কোন্দল করছিলেন সেটা হেগের চেয়ে তীব্রতর! এখন এই গোষ্ঠীবাদী কোন্দলকারীরা পুনর্মিলনের কথা প্রচার করছেন এবং বদমেজাজী ও ডিক্টেটর

বলে আমাদের গালাগালি দিচ্ছেন। আর হেগে যদি আমরা আপসের পথ ধরতাম, যদি আমরা সেখানে ভাঙনের প্রকাশকে চাপা দিয়ে দিতাম তাহলে ফল দাঁড়াত কী? গোষ্ঠীপন্থীরা, অর্থাৎ বাকুনিনপন্থীরা, আর একটি পুরো বছর হাতে পেত আন্তর্জাতিকের নামে আরও অনেক বেশী নির্বোধ ও কলঙ্কজনক কাজ করার; সবচেয়ে উন্নত দেশগুলির শ্রমিকেরা তিক্ত-বিরক্ত হয়ে সরে যেত; বুদ্‌বুদ ফাটত না, খোঁচায়-খোঁচায় ক্রমশ চুপসে যেত, এবং পরবর্তী কংগ্রেসে যখন অনিবার্যভাবেই সংকট দেখা দিত, তখন সে কংগ্রেস হীনতম ব্যক্তিগত কলহে পরিণত হোত, কেননা ইতিপূর্বে হেগেই নীতির বিসর্জন হয়ে গিয়েছিল! তখন আন্তর্জাতিক সত্যিই ভেঙে টুকরোটুকরো হয়ে যেত — টুকরোটুকরো হয়ে যেত 'ঐক্যেরই' মাধ্যমে! তার পরিবর্তে যা কিছু পচা ছিল তা থেকে আমরা আজ নিজেদের সসম্মানে মুক্ত করতে পেরেছি — কমিউনের যেসব সদস্য শেষ ও চূড়ান্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা বলেছেন, কমিউনের কোনো বৈঠকই তাঁদের মনে এতখানি প্রবল দাগ কাটতে পারে নি যতখানি দাগ কেটেছিল বিচারকমণ্ডলীর এই বৈঠক, যেখান থেকে ইউরোপের প্রলেতারিয়েতের প্রতি বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করা হয়; — দশমাস পর্যন্ত তাঁদের আমরা মিথ্যা, কুৎসা ও চক্রান্তে সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করতে দিয়েছিলাম, আর আজ তাঁরা কোথায়? আন্তর্জাতিকের বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের প্রতিনিধি বলে কথিত এই ব্যক্তিরা আজ নিজেরাই ঘোষণা করছেন যে, পরবর্তী কংগ্রেসে আসার সাহস তাঁদের নেই। (এই পত্রের সঙ্গে *Volksstaat*-এর* জন্যে যে প্রবন্ধ পাঠাচ্ছি তাতে ব্যাপারটি আরও বিশদভাবে আছে।) যদি আমাদের আবার এ-কাজে নামতে হোত, তাহলে সমগ্রভাবে ধরলে আমাদের পদ্ধতি অন্যরকম হোত না — কৌশলগত ভুল অবশ্য সব সময়েই সম্ভব।

সে যাই হোক, আমার মনে হয়, লাসালপন্থীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যথাসময়ে আপনাদের কাছে এসে পড়বে, অতএব ফল পাকার আগে ফল পাড়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, যেটি ঐক্যওয়ালারা চাইছে।

তাছাড়া, প্রবীণ হেগেল তো ইতিপূর্বেই বলে দিয়েছেন, পার্টির মধ্যে

---

* ফ. এঙ্গেলস, 'আন্তর্জাতিকের মধ্যে'। — সম্পাঃ

ভাঙন (৯৩) ধরা এবং এই ভাঙন সহ্য করতে পারার দ্বারাই একটি পার্টি নিজেকে বিজয়ী পার্টি বলে প্রমাণ করে। প্রলেতারীয় আন্দোলন অবশ্যম্ভাবীরূপেই বিকাশের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে যায় এবং প্রতি স্তরেই কিছু লোক আটকে যায় এবং আর অগ্রগতিতে যোগ দেয় না। একমাত্র এই থেকেই বোঝা যায় কেন 'প্রলেতারিয়েতের সংহতি'ই আসলে সর্বত্র রূপ পরিগ্রহ করছে বিভিন্ন পার্টি-গোষ্ঠীর মধ্যে, যারা রোমক সাম্রাজ্যের ভীষণতম নিপীড়ন-কালের খ্রীস্টান গোষ্ঠীগুলির মতোই পরস্পরের সঙ্গে জীবনমরণ সংঘর্ষ চালিয়ে যাচ্ছে।

একথাও ভুলবেন না যে, *Volksstaat* -এর চেয়ে *Neuer Social-Demokrat*-এর গ্রাহক সংখ্যা যদি বেশী হয়ে থাকে তবে তার কারণ **গোষ্ঠী**মাত্রেই অনিবার্যভাবে মতান্ধ এবং এই মতান্ধতার জোরে বিশেষ করে যে এলাকায় তা নতুন সেখানে (যেমন, শ্লেজভিগ-হলস্টাইনে নিখিল জার্মান শ্রমিক সঙ্ঘ) — সে অনেক বেশি আশু সাফল্য অর্জন করে সেই পার্টির তুলনায়, যে পার্টি সবরকম গোষ্ঠীগত খামখেয়াল বর্জন করে শুধু প্রকৃত আন্দোলনেরই প্রতিনিধিত্ব করে। তবু মতান্ধতা ক্ষণজীবী ব্যাপার।

চিঠি শেষ করছি, ডাক যাওয়ার সময় হয়েছে বলে। শুধু তাড়াতাড়ি এইটুকু বলে নিই: ফরাসি তর্জমা শেষ না হওয়া পর্যন্ত* (মোটামুটি জুলাই-এর শেষাশেষি) মার্কস লাসাল (৯৪) হাতে নিতে পারবেন না; তারপর আবার তাঁর একান্তভাবেই বিশ্রামের প্রয়োজন হবে, কারণ অত্যন্ত অতিরিক্ত পরিশ্রম করেছেন তিনি।...

F. Engels. 'Politisches Vermächtnis. Aus unveröffentlichten Briefen', Berlin, 1920
বইয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রথম প্রকাশিত এবং ১৯৩২ সালে *Bolshevik* পত্রিকার ১০ নং সংখ্যায় সম্পূর্ণ আকারে রুশ ভাষায় প্রকাশিত

জার্মান ভাষার পাণ্ডুলিপি অনুসারে মুদ্রিত

* 'পুঁজি' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ফরাসি ভাষায় তর্জমার কথা বলা হচ্ছে। — সম্পাঃ

হবোকেনস্থিত ফ. আ. জোরগে সমীপে এঙ্গেলস

লণ্ডন, ১২ [-১৭] সেপ্টেম্বর, ১৮৭৪

আপনার পদত্যাগে (৯৫) **পুরাতন** আন্তর্জাতিক একদম উঠে গেল, শেষ হয়ে গেল। ভালোই হল। এ ছিল দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের (৯৬) সেই পর্বের বস্তু, যখন সারা ইউরোপব্যাপী নিপীড়নের ফলে সদ্য পুনরুদীয়মান শ্রমিক-আন্দোলনের পক্ষে ঐক্যরক্ষা এবং সমস্ত প্রকারের অভ্যন্তরীণ বিতর্ক থেকে বিরত থাকাই ছিল অবশ্যপালনীয় কাজ। সময়টা প্রলেতারিয়েতের সাধারণ এবং সর্বজাতিক স্বার্থকে সামনে তুলে ধরার উপযোগী। জার্মানি, স্পেন, ইতালি, ডেনমার্ক সবে আন্দোলনের মধ্যে এসেছে অথবা আসছে। প্রকৃতপক্ষে, ১৮৬৪ সালে ইউরোপের সর্বত্র, অর্থাৎ জনসাধারণের মধ্যে, আন্দোলনের তত্ত্বগত প্রকৃতিটিই ছিল অত্যন্ত অস্পষ্ট। শ্রমিকদের সংগঠিত পার্টি হিসেবে জার্মান কমিউনিজমের তখনও কোনো অস্তিত্ব ছিল না, নিজের বিশেষ মর্জির ঘোড়া ছোটাবার মতো শক্তি তখনও প্রুধোঁবাদ অর্জন করতে পারে নি, বাকুনিনের নয়া প্রলাপ তখনও তাঁর নিজের মগজেই আসে নি, এমনকি ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়নগুলোর নেতারাও ভাবতেন, নিয়মাবলীর* মুখবন্ধে সন্নিবিষ্ট কর্মসূচির মধ্যে আন্দোলনে যোগদানের মতো ভিত্তি তাঁরা খুঁজে পাচ্ছেন। প্রথম বিরাট সাফল্যের ফলে সমস্ত উপদলের এই অতি সরল সম্মিলনটি ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে বাধ্য ছিল। এই সাফল্যই হল কমিউন। কমিউন-সৃষ্টির ব্যাপারে আন্তর্জাতিক একটিও অঙ্গুলি উত্তোলন না করলেও চিন্তাধারার দিক থেকে কমিউন যে আন্তর্জাতিকেরই সন্তান তাতে কোনো সন্দেহ নেই, এবং কমিউনের জন্যে যে আন্তর্জাতিককে দায়ী করা হল তা কিছুটা পরিমাণে খুবই সঙ্গত। কিন্তু কমিউনের কল্যাণে যখন আন্তর্জাতিক ইউরোপে একটি নৈতিক শক্তি হয়ে দাঁড়াল, অমনি হৈচৈ শুরু হয়ে গেল। প্রত্যেকটি ধারাই এই সাফল্যকে নিজনিজ স্বার্থে কাজে লাগাতে চেষ্টা করতে লাগল। শুরু হল অনিবার্য ভাঙন। একমাত্র যারা পুরাতন ব্যাপক কর্মসূচির ভিত্তিতে কাজ করে

---

* এই সংস্করণের ৩ খণ্ড, ১৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

যেতে সত্যিই প্রস্তুত ছিল, সেই জার্মান কমিউনিস্টদের ক্রমাগত শক্তিবৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে বেলজিয়ান প্রুধোঁপন্থীরা গিয়ে পড়ল বাকুনিনপন্থী হঠকারীদের কবলে। আসলে হেগ কংগ্রেসেই সব শেষ হয়ে গেল, — এটা ঘটল উভয় পার্টির ক্ষেত্রেই। একমাত্র দেশ যেখানে আন্তর্জাতিকের নামে তখনও কিছু করা চলত, সে হল আমেরিকা এবং এক শুভ সহজাতবোধে সর্বোচ্চ পরিচালনা-কেন্দ্র সেখানে স্থানান্তরিত করা হল। বর্তমানে সেখানেও তার মর্যাদা ফুরিয়ে এসেছে এবং তাকে পুনরুজ্জীবিত করার যে-কোনো চেষ্টা হবে নিছক নির্বুদ্ধিতা ও শক্তির অপচয়। দশ বছর ধরে আন্তর্জাতিক ইউরোপীয় ইতিহাসের একটি দিকের উপর, যে দিকটায় ভবিষ্যৎ সেই দিকের উপর, আধিপত্য করেছে এবং নিজের কৃতকর্মের জন্যে সে গর্ববোধ করতে পারে। কিন্তু পুরাতন রূপে এই আন্তর্জাতিকের উপযোগিতা ফুরিয়ে গেছে। পুরাতন কায়দায় আবার একটি নতুন আন্তর্জাতিক সমস্ত দেশের সমস্ত প্রলেতারীয় পার্টির সঙ্ঘ — গঠন করতে হলে প্রয়োজন ১৮৪৯ সাল থেকে ১৮৬৪ সাল পর্যন্ত যেরূপ নিপীড়ন চলেছিল শ্রমিক-আন্দোলনের উপর সেইরূপ সার্বিক নিপীড়ন। কিন্তু তার পক্ষে প্রলেতারীয় দুনিয়া অনেক বড়, অনেক বিস্তৃত হয়ে গেছে। আমার বিশ্বাস, কয়েক বছর ধরে মার্কসের রচনাবলীর ফল ফলবার পর যে-নূতন আন্তর্জাতিক গঠিত হবে তা হবে সরাসরি কমিউনিস্ট এবং তা ঘোষণা করবে ঠিক আমাদের নীতিগুলিকেই।...

'Briefe und Auszüge aus Briefen von Joh. Phil. Becker, Jos. Dietzgen, Friedrich Engels, Karl Marx u. A. an F. A. Sorge und Andere' Stuttgart 1906 বইয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রথম প্রকাশিত এবং ১৯৩৫ সালে কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসের 'রচনাবলী'র প্রথম সংস্করণে ২৬ খণ্ডে সম্পূর্ণ আকারে রুশ ভাষায় প্রকাশিত

জার্মান ভাষার পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থের পাঠ অনুযায়ী মুদ্রিত

টীকা

(১) 'পংজি' — মার্কসবাদের অসামান্য ধ্রুপদী সাহিত্য। ঊনবিংশ শতকের চল্লিশের দশকের গোড়ার দিক থেকেই মার্কস এই গ্রন্থ রচনার কাজ শুরু করেন এবং এই রচনার কাজ চালিয়ে যান এর চল্লিশ বছর পরে তাঁর মৃত্যুকাল অবধি।

'অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই হল সেই ভিত্তি যার ওপর গড়ে ওঠে রাজনৈতিক সৌধ — এই সত্যটিকে স্বীকার করার ফলে মার্কস তাঁর সবচেয়ে গভীর মনোযোগ নিবদ্ধ করেন এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অনুধাবনে' (ভ. ই. লেনিন, 'সংগৃহীত রচনাবলী', ১৯ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫)।

অর্থশাস্ত্র নিয়ে নিয়মানুগ পড়াশুনা শুরু করেন মার্কস প্যারিসে থাকতে, ১৮৪৩ সালের শেষদিক থেকে। এক্ষেত্রে তাঁর এই প্রাথমিক গবেষণার ফলাফল লক্ষ করা যায় '১৮৪৪ সালের অর্থনীতি ও দর্শন-সম্বন্ধীয় পাণ্ডুলিপিসমূহ', 'জর্মান ভাবাদর্শ', 'দর্শনের দারিদ্র্য', 'মজুরিনির্ভর শ্রম ও পংজি', 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার' ও অন্যান্য রচনায়।

১৮৫৭ ও ১৮৫৮ সালে মার্কস ৫০ ফর্মারও বেশি পৃষ্ঠা-সংবলিত একখানি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রচনা করেন। এখানি ছিল তাঁর ভবিষ্যৎ 'পংজি' গ্রন্থের মোটামুটি একখানি খসড়া। সোভিয়েত ইউনিয়নে এই গ্রন্থখানি ১৯৩৯-১৯৪১ সালের মধ্যে জার্মান ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পরিচালনাধীন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্বন্ধীয় ইনস্টিটিউট গ্রন্থখানি প্রকাশ করে 'Grundrisse der Kritik der politischen Oekonomie' ('অর্থশাস্ত্রের সমালোচনার প্রধান-প্রধান বিষয়') নাম দিয়ে। ওই একই সঙ্গে তিনি তাঁর সমগ্র গ্রন্থের একটি প্রাথমিক রূপরেখা ছকে ফেলেন ও পরবর্তী মাসগুলিতে সেটিকে বিশদ করে তোলেন। ১৮৫৮ সালের এপ্রিল মাসে তিনি মনস্থির করেন যে বইখানি তিনি ছয়টি খণ্ডে সম্পূর্ণ করবেন। পরে, অল্পদিনের মধ্যেই, অবশ্য মার্কস স্থির করেন যে বইখানি তিনি প্রকাশ করবেন অংশে-অংশে ভাগ করে, পৃথক-পৃথক বই হিসেবে।

১৮৫৮ সালে মার্কস এ-সম্বন্ধীয় প্রথম বইখানি লিখতে শুরু করেন। বইখানির নামকরণ করেন তিনি 'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে'। বইখানি প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ সালে।

বইখানি লেখার সময়ে মার্কস ছয় খণ্ডে বইখানি সম্পূর্ণ করার ব্যাপারে তাঁর প্রথম পরিকল্পনার পরিবর্তন ঘটিয়ে চার খণ্ডে বইটি সম্পূর্ণ করতে মনস্থ করেন। ১৮৬৩ থেকে ১৮৬৫ সালের মধ্যে তিনি একখানি নতুন পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি রচনা করেন; এখানি ছিল 'পুঁজি' গ্রন্থের তিনখানি তত্ত্বগত আলোচনা-সংক্রান্ত খণ্ডের প্রথম বিস্তারিত একখানি খসড়া। একমাত্র সমগ্র গ্রন্থখানি লিখে ফেলার পরই (১৮৬৬ সালের জানুয়ারি মাসে) মার্কস চরম সম্পাদনার কাজ শুরু করেন। তদুপরি, এঙ্গেলসের পরামর্শ অনুযায়ী, তিনি একই সঙ্গে গোটা বইয়ের সম্পাদনা ও প্রস্তুতির ওপর জোর না-দিয়ে আগে বইখানির প্রথম খণ্ডটি প্রস্তুত করার ও প্রকাশের ওপর মনোনিবেশ করতে মনস্থ করেন। এই চরম সম্পাদনার কাজটি মার্কস এত বিশদে ও নিখুঁতভাবে নিষ্পন্ন করেন যে ফলত 'পুঁজি'র প্রথম খণ্ডের একটি সম্পূর্ণ নতুন পাণ্ডুলিপি তৈরি হয়ে যায়।

'পুঁজি'র এই প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হওয়ার পর (১৮৬৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে) জার্মান ভাষায় আরও নতুন-নতুন সংস্করণ প্রকাশের প্রস্তুতি হিসেবে এবং অন্যান্য ভাষায় বইখানির নানা অনুবাদের সম্পাদনার কাজ করতে গিয়ে মার্কস এই খণ্ডটি নিয়ে আরও কাজ চালিয়ে যান। ফলে বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৭২ সালে প্রকাশিত) তিনি বহু পরিবর্তন ঘটান এবং বইখানির রুশ সংস্করণ প্রকাশের ব্যাপারে বিশদ নির্দেশাদি দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে 'পুঁজি'র রুশ অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮৭২ সালে সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে এবং বিদেশী ভাষায় এই সংস্করণটিই ছিল 'পুঁজি'র প্রথম অনুবাদ। এছাড়া মার্কস এই খণ্ডটির ফরাসি অনুবাদ সম্পাদনা করার সময়ে তাতে গুরুত্বের নানা সংশোধন ঘটান; 'পুঁজি'র এই সংশোধিত ফরাসি অনুবাদ প্রকাশিত হয় দফায়-দফায় ১৮৭২ থেকে ১৮৭৫ সালের মধ্যে।

এই একই সঙ্গে মার্কস 'পুঁজি'র বাকি খণ্ডগুলির সম্পাদনা ও প্রস্তুতির কাজও চালিয়ে যান, অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র গ্রন্থটি প্রকাশের কাজ সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে। তবে এই উদ্দেশ্য সফল করে তোলা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না, কেননা ওই সময়ে তাঁর অনেকখানি সময় ব্যয়িত হয় প্রথম আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদের বহুবিচিত্র কাজে তিনি লিপ্ত থাকার ফলে। তাছাড়া ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণেও ওই সময়ে ঘন ঘন তাঁর কাজে বাধার সৃষ্টি হচ্ছিল

'পুঁজি'র অপর দুটি খণ্ডের ছাপাখানার জন্যে প্রস্তুতি ও বই প্রকাশনার কাজ করেন এঙ্গেলস কার্ল মার্কসের মৃত্যুর পর। 'পুঁজি'র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত

হয় ১৮৮৫ সালে ও তৃতীয় খণ্ড ১৮৯৪ সালে। এই কাজটি করতে গিয়ে এঙ্গেলস বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজমের তত্ত্বের সম্পদভাণ্ডারে অমূল্য অবদান যোগান।
পৃঃ ৭

(২) এখানে মার্কস 'পুঁজি'র প্রথম খণ্ডের প্রথম জার্মান সংস্করণের প্রথম অধ্যায়টির ('পণ্যসামগ্রী ও অর্থ'-এর। উল্লেখ করছেন। এই খণ্ডের দ্বিতীয় ও তার পরবর্তী জার্মান সংস্করণগুলিতে উপরোক্ত ওই অধ্যায় বইয়ের প্রথম অংশে পরিণত হয়েছে। পৃঃ ৭

(৩) এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে ফের্ডিনান্ড লাসাল-এর 'Herr Bastiat-Schulze von Delitzsch, der ökonomische Julian, oder: Kapital und Arbeit'. Berlin. 1864 ('হের বাস্তিয়া শুল্‌ট্‌সে-ডেলিচ, অর্থনৈতিক জুলিয়ান, কিংবা পুঁজি ও শ্রম', বার্লিন, ১৮৬৪) বইটির তৃতীয় অধ্যায়ের। পৃঃ ৮

(৪) **ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে উত্তর আমেরিকান কলোনিগুলির যুদ্ধ** (১৭৭৫ থেকে ১৭৮৩ সাল) সদ্য-উদ্ভূত আমেরিকান বুর্জোয়া জাতির স্বাধীনতালাভের ও পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের পক্ষে বাধাগুলিকে দূরীকরণের প্রচেষ্টার ফল এই যুদ্ধ। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে উদ্ভূত হয় এক স্বাধীন বুর্জোয়া রাষ্ট্র — আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। পৃঃ ১১

(৫) **আমেরিকার গৃহযুদ্ধ** (১৮৬১ থেকে ১৮৬৫ সাল) — এই যুদ্ধ বেধে যায় উত্তরের শিল্পোন্নত ও দক্ষিণের বিদ্রোহী দাস-মালিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে। ওই সময়ে দক্ষিণের দাস-মালিকদের সমর্থনে ইংলণ্ডের বুর্জোয়া শ্রেণীর পলিসির বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের শ্রমিক শ্রেণী প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে এবং গৃহযুদ্ধে ইংলণ্ডের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে সমর্থ হয়। এই যুদ্ধে উত্তরের রাষ্ট্রগুলি জয়লাভ করেছে। পৃঃ ১১

(৬) মূল জার্মান ভাষায় এই ধরনের গির্জাকে বলে Hochkirche (বা ইংরেজিতে High Church)। এ-ধরনের গির্জা হল অ্যাংলিকান গির্জার একটি শাখা। এই গির্জার উপাসকদের মধ্যে এক সময়ে অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকজনের প্রাধান্য ছিল। এখানে প্রচলিত ছিল জমকালো ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের রীতি, এতে প্রমাণ হয় ক্যাথলিক খ্রীষ্টিয়ান ধর্মের সঙ্গে এর সম্পর্ক। পৃঃ ১২

(৭) **ব্লু বুক** — ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের ও পররাষ্ট্র-মন্ত্রিদপ্তরের প্রকাশিত কার্যবিবরণী ও কূটনৈতিক দলিলপত্রের সাধারণ নাম। মলাটের নীল রঙের জন্যে এই নাম।
পৃঃ ১২

(৮) **১৮৭০-১৮৭১ সালে ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধ** — জার্মানির সম্পূর্ণ ঐক্যসাধনে বাধা দিতে ও ইউরোপ মহাদেশে নিজের প্রাধান্য বজায় রাখতে আগ্রহী ফ্রান্স এবং প্রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ। এই যুদ্ধে ফ্রান্স পরাজিত হয়। পৃঃ ১৬

(৯) S. Mayer, 'Die Sociale Frage in Wien. Studie eines 'Arbeitgebers'. Wien, 1871 (স. মেয়ার, 'ভিয়েনায় সামাজিক প্রশ্ন। একজন 'কর্মদাতার' বিশ্লেষণ', ভিয়েনা, ১৮৭১ সাল)। পৃঃ ১৬

(১০) **পবিত্র মৈত্রীজোট** — ভিন্ন-ভিন্ন দেশে বৈপ্লবিক আন্দোলন দমন করা ও সেই সব দেশে সামন্ততান্ত্রিক ও রাজতন্ত্রের ব্যবস্থা কায়েম রাখার উদ্দেশ্যে ১৮১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত জারের রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার রাজতন্ত্রীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল ঐক্য। পৃঃ ১৮

(১১) বিদেশ থেকে দানা-ফসলের আমদানি সীমাবদ্ধ করা অথবা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে **শস্যের আমদানি-নিয়ন্ত্রণ আইনসমূহ** ইংলণ্ডে প্রবর্তিত হয় বড় ভূস্বামীদের স্বার্থরক্ষাকল্পে। ১৮৩৮ সালে ম্যাঞ্চেস্টারের ফ্যাক্টরি-মালিকদ্বয় কবডেন ও ব্রাইট শস্যের আমদানি-নিয়ন্ত্রণ আইনবিরোধী লীগ প্রতিষ্ঠা করেন ও লীগের পক্ষ থেকে অবাধ স্বাধীন বাণিজ্যের দাবি জানানো হয়। শস্যের আমদানি-নিয়ন্ত্রণ আইনসমূহ বাতিল করানোর উদ্দেশ্যে লীগ লড়াই করে চলে শ্রমিকদের মজুরি হ্রাস করা এবং ভূস্বামী অভিজাতদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা দুর্বল করে তোলার উদ্দেশ্যে। এই লড়াইয়ের ফলে ১৮৪৬ সালে শস্যের আমদানি-নিয়ন্ত্রণ আইনসমূহ বাতিল হয়ে যায়। এতে সূচিত হয় ভূস্বামী অভিজাতদের বিরুদ্ধে শিল্পপতি বুর্জোয়া শ্রেণীর বিজয়। পৃঃ ১৮

(১২) *Der Volksstaat* ('গণরাষ্ট্র') — জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির (আইজেনাখপন্থীদের) কেন্দ্রীয় মুখপত্র। লাইপজিগে এই পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ সালের ২ অক্টোবর থেকে ১৮৭৬ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ভিলহেল্ম লিবক্নেখ্ট পত্রিকাখানির সাধারণ পরিচালনার কাজ করেন এবং আগস্ট বেবেল কাজ করেন ম্যানেজার হিসেবে। মার্কস ও এঙ্গেলস পত্রিকাটিতে লেখা পাঠাতেন ও পত্রিকার সম্পাদনার কাজে সাহায্য করতেন। ১৮৬৯ সাল পর্যন্ত পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল *Demokratisches Wochenblatt* নামে (৫৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য)।

এখানে আলোচ্য উল্লেখটি হল ১৮৬৮ সালে *Demokratisches Wochenblatt* পত্রিকার ৩১, ৩৪, ৩৫ ও ৩৬ সংখ্যায় প্রকাশিত ই. ডিট্‌স্‌গেনের প্রবন্ধ 'Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie von Karl Marx', Hamburg, 1867 ('কার্ল মার্কস, 'পুঁজি'। অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা', হামবুর্গ, ১৮৬৭ সাল) বিষয়ে। পৃঃ ২১

(১৩) *The Saturday Review of Politics, Literature, Science and Art* ('রাজনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার প্রশ্নে শনিবারের পর্যবেক্ষণ') —

১৮৫৫ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত লণ্ডন থেকে প্রকাশিত ব্রিটিশ রক্ষণশীল সাপ্তাহিক পত্রিকা। পৃঃ ২১

(১৪) **'সান-পিতের্‌বুর্গ্‌স্কিয়ে ভিয়েদমোস্তি'** ('সেণ্ট পিটার্সবুর্গ পত্রিকা') — রুশ দৈনিক ও গভর্নমেণ্টের সরকারি মুখপত্র। পত্রিকাখানি এই নামে প্রকাশিত হয় ১৭২৮ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত। অতঃপর ১৯১৪ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত এটি 'পেত্রগ্রাদ্‌স্কিয়ে ভিয়েদমোস্তি' ('পেত্রগ্রাদ পত্রিকা') নামে প্রকাশিত হয়। পৃঃ ২১

(১৫) এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে প্যারিস থেকে ১৮৬৭-১৮৮৩ সালের মধ্যে প্রকাশিত *La Philosophie positive. Revue* ('পজিটিভিস্ট দর্শনশাস্ত্র, পরিক্রমা') নামের পত্রিকাটির কথা। পত্রিকাটির তৃতীয় বা ১৮৬৮ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যায় মার্কসের 'পুঁজি' বইখানির দ্য রোবের্তি-লিখিত একটি সংক্ষিপ্ত সমালোচনা প্রকাশিত হয়। দ্য রোবের্তি ছিলেন অগস্ত কোঁত্‌-এর অস্তিবাদী দর্শনের একজন অনুসারী। পৃঃ ২২

(১৬) ন. জিবেরের লিখিত গ্রন্থ **'সাম্প্রতিকতম সংযোজন ও ব্যাখ্যাদির সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে ডে. রিকার্ডোর মূল্য ও পুঁজির তত্ত্ব'**, কিয়েভ, ১৮৭১ সাল, পৃষ্ঠা ১৭০। পৃঃ ২২

(১৭) **'ভেস্ত্‌নিক ইয়েভ্রোপি'** ('ইউরোপীয় বার্তাবহ') — বুর্জোয়া-উদারনীতিক ধারার অনুসারী একখানি ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক ও সাহিত্য-বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। ১৮৬৬ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত সেণ্ট পিটার্সবুর্গ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। পৃঃ ২২

(১৮) এই উল্লেখটি হল ব্যুক্‌নের, লাঙ্গে, ড্যুরিং, ফেখনার ও অন্যান্য জার্মান বুর্জোয়া দর্শনশাস্ত্রীদের সম্বন্ধে। পৃঃ ২৬

(১৯) এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে পঞ্চদশ শতকের শেষ থেকে শুরু করে দেশের মধ্যে দিয়ে চলাচলকারী পণ্যদ্রব্যাদির বাণিজ্যের ক্ষেত্রে জেনোয়া, ভেনিস ও অন্যান্য উত্তর-ইতালির শহরগুলির ভূমিকা গুরুতরভাবে হ্রাস পাওয়ার কথা। ওই সময়কার প্রধান-প্রধান ভৌগোলিক আবিষ্কার এই ভূমিকাহ্রাসের কারণ। তখন আবিষ্কৃত হয় কিউবা, হাইতি ও বাহামা দ্বীপপুঞ্জ, উত্তর আমেরিকার মহাদেশ, আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত প্রদক্ষিণ করে ভারতে যাবার সমুদ্র-পথ এবং পরিশেষে দক্ষিণ আমেরিকার মহাদেশ। পৃঃ ৩৩

(২০) এখানে ১০৬৬ সালে নর্ম্যাণ্ডির ডিউক বিজেতা উইলিয়মের ইংলণ্ড দখলের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। এই দখলের ফলে ইংলণ্ডে সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা গড়ে ওঠার সহায়তা হয়। পৃঃ ৩৫

(২১) J. Steuart. 'An Inquiry into the Principles of Political Economy'. Vol. I, Dublin, 1770, p. 52 (জেমস স্ট্যুয়ার্ট, 'অর্থশাস্ত্রের নীতিসমূহ-সম্পর্কিত একটি অনুসন্ধান', প্রথম খন্ড, ডাব্লিন, ১৭৭০ সাল, পৃষ্ঠা ৫২)। পৃঃ ৩৫

(২২) **রিফর্মেশন** (ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন) — ১৬শ শতকে জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, ইংলন্ড, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশ জুড়ে ক্যাথলিক গির্জার বিরোধী ব্যাপক সমাজ-আন্দোলন। যেসব দেশে রিফর্মেশন জয়লাভ করে সেখানে তার ধর্ম-সংক্রান্ত ফলাফল হিসেবে নতুন কয়েকটি তথাকথিত প্রোটেস্ট্যান্ট গির্জা গড়ে ওঠে (যেমন, ইংলন্ড, স্কটল্যান্ড, নেদার্ল্যান্ডস্, জার্মানির একাংশে ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলিতে)। পৃঃ ৪০

(২৩) **'Pauper ubique jacet'** ('দরিদ্র বঞ্চিত তার অংশ থেকে সর্বত্রই') — ওভিদ-এর 'ফাস্তি' থেকে উদ্ধৃত। 'ফাস্তি', প্রথম খন্ড, ২১৮-সংখ্যক শ্লোক। পৃঃ ৪১

(২৪) **স্ট্যুয়ার্ট-রাজবংশের পুনঃক্ষমতাপ্রাপ্তি** — ইংলন্ডে স্ট্যুয়ার্ট-রাজবংশের দ্বিতীয় বারের শাসনের পর্যায় (১৬৬০-১৬৮৯)। ১৭শ শতকের বুর্জোয়া বিপ্লবে এই রাজবংশের উৎখাত ঘটে। পৃঃ ৪৪

(২৫) যতদূর মনে হচ্ছে এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে ১৫৯৭ সালে জারি-করা পলাতক কৃষকদের খুঁজে বের করা সম্বন্ধীয় জারের হুকুমনামাটির। এই হুকুমনামা জারি হয় জার ফিয়দর ইভানোভিচের শাসনকালে, যখন বরিস গদুনোভই ছিলেন রুশদেশের আসল শাসনকর্তা। এই হুকুমনামা অনুযায়ী, ভূস্বামীদের অসহনীয় উৎপীড়ন-অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে যে-সমস্ত কৃষক এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যেত তাদের পাঁচ বছরের মধ্যে খুঁজে বের করে বলপ্রয়োগে তাদের প্রাক্তন মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হোত। পৃঃ ৪৪

(২৬) 'Glorious Revolution' ('গৌরবময় বিপ্লব') — ইংলন্ডে ১৬৮৮ সালের ওপর-মহলের ক্ষমতাদখলকে ইংরেজ বুর্জোয়া ইতিহাসবেত্তারা এই নামে অভিহিত করে আসছেন। এই ক্ষমতাদখলের ফলে স্ট্যুয়ার্ট-রাজবংশ সিংহাসনচ্যুত হয় এবং ইংলন্ডে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় (১৬৮৯ সালে) অরেঞ্জের উইলিয়মের প্রভুত্বাধীনে এক নিয়মতান্ত্রিক রাজবংশ। জমির মালিক প্রাক্তন অভিজাত সম্প্রদায় ও বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিপত্তিশালী লোকেদের মধ্যে এক আপস-মীমাংসার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় এই রাজবংশটি। পৃঃ ৪৪

(২৭) এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে ৩৬৭ খ্রীস্টপূর্বাব্দে রোমের সাধারণ মানুষের নির্বাচিত দুই শাসক লিসিনাস ও সেক্সতিউসের প্রবর্তিত কৃষি-আইনটির কথা। রোমের অভিজাত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অনভিজাত সাধারণ মানুষের সংগ্রামের ফল ছিল এটি। এই আইন অনুযায়ী কোনো রোমান নাগরিক উর্ধ্বপক্ষে ৫০০ ইউগেরের (বা আনুমানিক ৩০৯ একরের) বেশি রাষ্ট্রীয় জমির মালিকানা রাখতে পারত না। পৃঃ ৫০

(২৮) মার্কস এখানে স্টুয়ার্ট-রাজবংশের সমর্থকদের ১৭৪৫-১৭৪৬ সালের অভ্যুত্থানের কথা উল্লেখ করছেন। বিদ্রোহীরা চেয়েছিল তথাকথিত 'তরুণ দাবিদার' চার্লস এডওয়ার্ডকে ইংলন্ডের সিংহাসনে বসাতে। ওই একই সঙ্গে এই অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছিল জমিদারদের শোষণ ও জমি থেকে ব্যাপক হারে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে স্কট্‌ল্যান্ড ও ইংলন্ডের জনসাধারণের প্রতিবাদও। ব্রিটিশ সেনাবাহিনী এই বিদ্রোহ দমন করার পর স্কট্‌ল্যান্ডের পার্বত্য অঞ্চলে এক সর্দারের অধীনে একবংশীয় উপজাতিদের একত্র বাসের প্রথা দ্রুত ভেঙে পড়তে শুরু করে, জমি থেকে কৃষকদের বিতাড়নও বৃদ্ধি পায়। পৃঃ ৫৩

(২৯) স্কটল্যান্ডে এক সর্দারের অধীনে একবংশীয় উপজাতিদের গোষ্ঠীবদ্ধ একত্র বাসের প্রথার অধীনে গোষ্ঠী-সর্দার বা 'লেয়ার্ড' (মহাজন)-এর প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে যে-সমস্ত প্রবীণ সদস্য থাকত তাদের বলা হোত 'টাক্‌স্‌মেন'। লেয়ার্ড এই প্রবীণ সদস্যদের রক্ষণাবেক্ষণে ছেড়ে দিত ওই সমগ্র উপজাতি-গোষ্ঠীটির যৌথ সম্পত্তি বা জমি ('টাক')। লেয়ার্ড-এর সর্বময় প্রভুত্বের স্বীকৃতি হিসেবে প্রবীণরা তাকে অল্প-পরিমাণ কর দিত। আবার এই টাক্‌স্‌মেন তাদের অধীনস্থ জমি ভাগ করে দিত তাদের অধীন সামন্ত-সর্দারদের মধ্যে। ক্রমে এই উপজাতি-গোষ্ঠী প্রথার ভাঙন ধরার ফলে লেয়ার্ড-রা পরিণত হল জমিদারে এবং টাক্‌স্‌মেন কার্যত পরিণত হল পুঁজিতন্ত্রী খামারীতে। এরই সঙ্গে সঙ্গে আগেকার সেই করের বদলে চালু হয়ে গেল জমিবাবদ খাজনা দেয়ার রীতি। পৃঃ ৫৩

(৩০) গেইলজাতি — উত্তর ও পশ্চিম স্কটল্যান্ডের পার্বত্য অঞ্চলের আদি অধিবাসী ও প্রাচীন কেল্টজাতির উত্তরপুরুষ। পৃঃ ৫৪

(৩১) মার্কস এখানে ১৮৫৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে *The New York Daily Tribune* পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'নির্বাচন — আর্থিক ব্যাপারে মেঘসঞ্চার — সাদারল্যান্ডের ডাচেস ও ক্রীতদাস-প্রথা' শীর্ষক প্রবন্ধটির কথা উল্লেখ করছেন।

The New York Daily Tribune —১৮৪১ থেকে ১৯২৪ সালের মধ্যে প্রকাশিত একখানি প্রগতিশীল আমেরিকান বুর্জোয়া সংবাদপত্র। মার্কস ও এঙ্গেলস ১৮৫১ থেকে ১৮৬২ সাল পর্যন্ত এই সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্যে প্রবন্ধাদি পাঠাতেন। পৃঃ ৫৬

(৩২) **ত্রিশ-বর্ষব্যাপী যুদ্ধ** (১৬১৮ থেকে ১৬৪৮ সাল পর্যন্ত) — প্রোটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিক মতাবলম্বী খ্রীস্টিয়ানদের মধ্যে বিরোধের ফলে বেধে-ওঠা এক সর্ব-ইউরোপীয় যুদ্ধ। এই যুদ্ধের প্রধান রণাঙ্গন ছিল জার্মানি, যুদ্ধে জড়িত দেশগুলির সামরিক লুণ্ঠন ও সম্প্রসারণবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষারও শিকার হয়েছিল সেই দেশ। পৃঃ ৫৮

(৩৩) **শিল্প-সমিতি** (The Royal Society of Arts) — ১৭৫৪ সালে লণ্ডনে প্রতিষ্ঠিত একটি বুর্জোয়া শিক্ষাদান-সংক্রান্ত ও জনহিতব্রতী সমিতি। পৃঃ ৫৯

(৩৪) *The Economist* ('অর্থনীতিবিৎ') — অর্থনীতি ও রাজনীতি-বিষয়ক ব্রিটিশ সাপ্তাহিক পত্রিকা; ১৮৪৩ সাল থেকে লণ্ডনে প্রকাশিত হয়ে আসছে। প্রতিপত্তিশালী শিল্পপতি বুর্জোয়াদের মুখপত্র এটি। পৃঃ ৬০

(৩৫) Petty Sessions ('খুদে মামলার বিচার-অধিবেশন') — ছোটখাট অপরাধের বিচারের জন্যে ও অপেক্ষাকৃত গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে প্রাথমিক তদন্ত পরিচালনার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডের স্থানীয় নিম্ন আদালতের বিচারকদের সভা। পৃঃ ৬৬

(৩৬) A. Smith. 'An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations'. Vol. I, Edinburgh, 1814, p. 237. (অ্যা. স্মিথের গ্রন্থ: 'জাতিসমূহের ঐশ্বর্যের প্রকৃতি ও তা সংগ্রহের সূত্রগুলি সম্বন্ধে একটি অনুসন্ধান', প্রথম খণ্ড, এডিনবরা, ১৮১৪ সাল, পৃষ্ঠা ২৩৭)। পৃঃ ৬৯

(৩৭) [Linguet, N.]. 'Théorie des loix civiles, ou Principes fondamentaux de la société', T. I, Londres, 1767, p. 236. পৃঃ ৬৯

(৩৮) শ্রমিকদের যে-কোনো সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও তার ক্রিয়াকলাপ নিষিদ্ধ করে **সঙ্ঘগুলির বিরুদ্ধে আইনসমূহ** ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে গৃহীত হয় ১৭৯৯ ও ১৮০০ সালে। ১৮২৪ সালে পার্লামেণ্ট ওই আইনগুলি নাকচ করে দেয় এবং ১৮২৫ সালে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তকে সরকারিভাবে স্বীকৃতি দেয়। তবে আইনগুলি নাকচ হয়ে যাওয়ার পরেও শ্রমিক-ইউনিয়নগুলির কাজকর্ম বহুলাংশে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়। এমনকি ইউনিয়নসমূহে নিছক প্রবেশের জন্যেও শ্রমিকদের আন্দোলন ও ধর্মঘটে তাদের যোগদানকেও 'জবরদস্তি' ও 'সহিংস' ক্রিয়াকলাপ বলে গণ্য করা হোত এবং এগুলিকে অপরাধ গণ্য করে শ্রমিকদের দণ্ড দেয়া হোত। পৃঃ ৭০

(৩৯) **'ষড়যন্ত্রের'** বিরুদ্ধে আইনসমূহ এমনকি সেই সুদূর মধ্যযুগেও ইংলণ্ডে চালু ছিল। একালে এই আইনের বলে শ্রমিকদের সংগঠনসমূহ ও সেগুলির আয়োজিত

শ্রেণী-সংগ্রামকে দমন করা হয়ে আসছে — যেমন সংঘসমূহের বিরুদ্ধে আইনসমূহ (৩৮ নং টীকা দ্রষ্টব্য) গৃহীত হওয়ার আগে তেমনই ওই আইনগুলি নাকচ হয়ে যাওয়ার পরেও। পৃঃ ৭৩

(৪০) এই উল্লেখটি ফ্রান্সে ১৭৯৩ সালের জুন মাস থেকে ১৭৯৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত জেকবিন একনায়কতন্ত্রী গভর্নমেন্ট সম্পর্কে। পৃঃ ৭৪

(৪১) A. Anderson. 'An Historical and Chronological Deduction of the Origin of Commerce, from the Earliest Accounts to the Present Time' (অ্যা. অ্যান্ডারসন, 'প্রারম্ভিক তথ্য থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বাণিজ্যের ঐতিহাসিক ও কালানুক্রমিক বিবরণী') বইটির প্রথম সংস্করণ লন্ডনে প্রকাশিত হয় ১৭৬৪ সালে। পৃঃ ৭৯

(৪২) J. Steuart. 'An Inquiry into the Principles of Political Economy'. Vol. I, Dublin, 1770, First book, Ch. XVI (জে. স্টুয়ার্ট, 'অর্থশাস্ত্রের মূলভিত্তি-সংক্রান্ত বিশ্লেষণ', প্রথম খণ্ড, ডাবলিন, ১৭৭০ সাল, প্রথম অংশ, ষোড়শ অধ্যায়)। পৃঃ ৮০

(৪৩) ১৫৬৬ থেকে ১৬০৯ সালের মধ্যে সংঘটিত বুর্জোয়া বিপ্লবের ফলে স্পেনের সার্বভৌম কর্তৃত্ব থেকে নেদারল্যান্ডস্ (আধুনিক বেলজিয়ম ও হল্যান্ডের মিলিত ভূখণ্ড) বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই বুর্জোয়া বিপ্লবে দেশের বুর্জোয়া শ্রেণী ও জনসাধারণ মিলিত হয় সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ও স্পেনের শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তির যুদ্ধে। বারকয়েক যুদ্ধে পরাস্ত হওয়ার পরে ১৬০৯ সালে স্পেন বাধ্য হয় বুর্জোয়া ওলন্দাজ প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতা স্বীকার করে নিতে। আধুনিক বেলজিয়মের ভূখণ্ডটি কিন্তু ১৭১৪ সাল পর্যন্ত স্পেনের শাসনাধীনে রয়ে যায়। পৃঃ ৮৯

(৪৪) এখানে ১৭৯৩ সাল থেকে ১৮১৫ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইংলন্ডের যুদ্ধগুলির কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। পৃঃ ৮৯

(৪৫) **অহিফেন-যুদ্ধ** — এগুলি হল ১৮৩৯-১৮৪২ সালের মধ্যে পরিচালিত চীনের বিরুদ্ধে ব্রিটেনের এবং ১৮৫৬-১৮৫৮ সাল ও ১৮৬০ সালে ফ্রান্সের সঙ্গে ব্রিটেনের মিলিত আগ্রাসী যুদ্ধ। প্রথমবার এই যুদ্ধ শুরু হয়েছিল চীনদেশে ইংরেজদের আফিমের চোরা-চালানের বিরুদ্ধে চীনা কর্তৃপক্ষের সরকারি ব্যবস্থাদি অবলম্বনের ফলে। এর ফলেই এই যুদ্ধগুলির নামকরণ হয় অহিফেন-যুদ্ধ। পৃঃ ৮৯

(৪৬) **ইস্ট-ইণ্ডিয়া কম্পানি** — এই ব্রিটিশ ব্যবসায়ী কম্পানিটি টিকে ছিল ১৬০০ থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত এবং ভারতে, চীনে ও অন্যান্য এশীয় দেশে ব্রিটিশের সম্প্রসারণবাদী ঔপনিবেশিক নীতি কার্যকর করার ব্যাপারে এটি ছিল প্রধান হাতিয়ার। দীর্ঘদিন ধরে এই কম্পানিটি ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করে ছিল এবং ভারতে রাজ্য-পরিচালনার ব্যাপারে প্রধান দায়িত্বের অধিকারী ছিল। ১৮৫৭-১৮৫৯ সালে ভারতে জাতীয় মুক্তির অভ্যুত্থান ঘটায় ইংলণ্ড বাধ্য হয় তার ঔপনিবেশিক শাসনের ধরন বদলাতে ও ১৮৫৮ সালে কম্পানিটিকে ভেঙে দিতে। পৃঃ ৯১

(৪৭) মার্কস এখানে উদ্ধৃতি দিয়েছেন গুস্টাভ গ্যুলিখ-এর বই 'Geschichtliche Darstellung des Handels, der Gewerbe und des Ackerbaus der bedeutendsten handeltreibenden Staaten unserer Zeit' ('আমাদের কালের প্রধান বাণিজ্যনির্ভর রাষ্ট্রগুলির ব্যবসায়, শিল্প ও কৃষির ঐতিহাসিক বর্ণনা')-এর প্রথম খণ্ডের ৩৭১ পৃষ্ঠা থেকে। বইটি ১৮৩০ সালে জেনা থেকে প্রকাশিত হয়। পৃঃ ৯৩

(৪৮) আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় মার্কস এখানে পূর্বে-অনুমিত ইয়ান ডে উইট-এর 'Aanwysing der heilsame politike Gronden en Maximen van de Republike van Holland en West-Friesland' ('ওলন্দাজ প্রজাতন্ত্র ও পশ্চিম ফ্রিস্ল্যাণ্ডের প্রধান-প্রধান রাজনৈতিক নীতি ও maxim-এর উল্লেখ') বইখানির ইংরেজি সংস্করণটির কথা উল্লেখ করেছেন। মূল বইখানি লাইডেন থেকে ১৬৬২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে অবশ্য প্রমাণিত হয়েছে যে আসলে বইখানি মূলত লিখেছিলেন ওলন্দাজ অর্থনীতিবিৎ ও ব্যবসায়ী পিটার ফন ডের হোর (বা পিটার ডে লা কুর) এবং বইয়ের কেবল দুটিমাত্র পরিচ্ছেদ লিখেছিলেন ইয়ান ডে উইট। পৃঃ ৯৭

(৪৯) **সাত-বর্ষব্যাপী যুদ্ধ** (১৭৫৬ থেকে ১৭৬৩ সাল) — সামন্ততান্ত্রিক রাজবংশ-শাসিত রাষ্ট্রগুলির সম্প্রসারণবাদী নীতি এবং ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে উপনিবেশ বিস্তার-সংক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে অনুষ্ঠিত এক সাধারণ সর্ব-ইউরোপীয় যুদ্ধ। এই যুদ্ধের ফলে ফ্রান্স ব্রিটেনকে তার প্রধান-প্রধান উপনিবেশ (যেমন, কানাডা, ইস্ট-ইণ্ডিয়ায় অবস্থিত উপনিবেশসমূহ, ইত্যাদি) ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়; প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও স্যাক্সনি সমর্থ হয় তাদের যুদ্ধপূর্ব উপনিবেশগুলি রক্ষা করতে। পৃঃ ৯৮

(৫০) এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে **ইউট্রেখ্টের সন্ধিচুক্তি** সম্বন্ধে। এই চুক্তিটি সম্পাদিত হয় ১৭১৩ সালে একপক্ষে ফ্রান্স ও স্পেন এবং অন্যপক্ষে ফরাসিবিরোধী

মৈত্রীজোটের রাষ্ট্রগুলির (যেমন, ব্রিটেন, নেদারল্যাণ্ড্স্, পোর্তুগাল, প্রাশিয়া ও অস্ট্রীয় হ্যাপ্স্বার্গ-রাজবংশগুলির) মধ্যে। এর ফলে স্পেনের অধিকৃত উপনিবেশগুলি কেড়ে নেয়ার জন্যে অনুষ্ঠিত দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের (একে বলা হয় ১৭০১ থেকে ১৭১৪ সালের 'স্পেনের উত্তরাধিকারের যুদ্ধ') অবসান ঘটে। এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও উত্তর আমেরিকার কয়েকটি ফরাসি ও স্পেনীয় উপনিবেশ ও সেইসঙ্গে জিব্রাল্টারের কর্তৃত্ব লাভ করে ব্রিটেন।

আসিয়েন্তো — যে-সমস্ত চুক্তি অনুযায়ী ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে স্পেন কিছু-কিছু বিদেশী রাষ্ট্র ও ব্যক্তিবিশেষকে তার আমেরিকান উপনিবেশগুলিতে নিগ্রো ক্রীতদাস বিক্রির বিশেষ অধিকার দান করে এটি সেই চুক্তিসমূহের সাধারণ নাম। পৃঃ ১০০

(৫১) Tantae molis erat (এতখানি পরিশ্রমের মূল্যে) — এই বাক্যাংশটি নেয়া হয়েছে ভার্জিলের কাব্যগ্রন্থ 'Aeneid'-এর প্রথম খণ্ডের ৩৩-সংখ্যক শ্লোক থেকে। পৃঃ ১০৩

(৫২) C. Pecqueur. 'Théorie nouvelle d'économie sociale et politiques, ou Études sur l'organisation des sociétés'. Paris, 1842, p. 435. (ক. পেকার, 'সামাজিক ও রাজনৈতিক অর্থনীতির নতুন তত্ত্ব, অথবা সমাজ-সংগঠন সংক্রান্ত গবেষণা', প্যারিস, ১৮৪২ সাল, পৃষ্ঠা ৪৩৫)। পৃঃ ১০৫

(৫৩) এঙ্গেলস এই প্রবন্ধটি লেখেন *Demokratisches Wochenblatt* পত্রিকার জন্যে। মার্কসের 'পুঁজি' গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডের যে-সমালোচনাগুলি লেখেন তিনি এটি তার মধ্যে একটি। 'পুঁজি' গ্রন্থের মূল তত্ত্বগুলিকে জনপ্রিয় করে তোলার উদ্দেশ্যে এঙ্গেলসের লেখা এই সমালোচনাগুলি শ্রমিক ও গণতন্ত্রীদের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। শ্রমিকদের অনুধাবনের জন্যে প্রবন্ধাদি লেখা ছাড়া এঙ্গেলস বুর্জোয়া সংবাদপত্রেও বেনামে কয়েকটি আলোচনা-প্রবন্ধ লেখেন — সরকারিভাবে স্বীকৃত অর্থশাস্ত্রীরা ও বুর্জোয়া সংবাদপত্র-জগৎ প্রতিভার এই শ্রেষ্ঠ অবদানকে 'নৈঃশব্দ্যের ষড়্যন্ত্র' দিয়ে যেভাবে নস্যাৎ করার চেষ্টা করছিল তা থেকে তাকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে। এই শেষোক্ত প্রবন্ধগুলিতে এঙ্গেলস 'পুঁজি'র সমালোচনা করেন 'বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি থেকে', বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রীরা যাতে বইখানির আলোচনা করতে বাধ্য হন তার জন্যে মার্কস-কথিত উপরোক্ত এই হাতিয়ারটি তিনি এই প্রবন্ধগুলিতে ব্যবহার করেন।

Demokratisches Wochenblatt ('গণতান্ত্রিক সাপ্তাহিক') — ১৮৬৮ সালের জানুয়ারি থেকে ১৮৬৯ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লাইপজিগ থেকে ভিল্হেল্ম লিব্‌ক্নেখ্‌টের সম্পাদনায় জার্মান শ্রমিকদের এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। জার্মান

সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি গঠনের কাজে পত্রিকাটির অবদান অসামান্য। ১৮৬৯ সালের আইজেনাথ কংগ্রেসে পত্রিকাটিকে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয় এবং নতুন নামকরণ হয় *Volksstaat* ('গণরাষ্ট্র')। মার্কস ও এঙ্গেলস পত্রিকাটিতে প্রায়ই প্রবন্ধাদি লিখতেন। পৃঃ ১১০

(৫৪) প্রথম আন্তর্জাতিকের **রুশ শাখা** প্রতিষ্ঠিত হয় সুইজারল্যান্ডে ১৮৭০ সালের বসন্তকালে। এই শাখা-সংগঠনটির প্রতিষ্ঠা করেন একদল দেশান্তরী রুশ রাজনীতিবিৎ। এ'রা ছিলেন মহান বিপ্লবী গণতন্ত্রী চের্নিশেভ্‌স্কি ও দব্রলিউবভের চিন্তাধারায় লালিত সাধারণ ঘরের যতসব তরুণবয়সী গণতন্ত্রী। ১৮৭০ সালের ১২ মার্চ তারিখে রুশ শাখার নেতৃস্থানীয় কমিটি সাধারণ পরিষদের কাছে শাখার কর্মসূচি ও নিয়মাবলী পাঠিয়ে দেয় এবং মার্কসের কাছে লেখা এক চিঠিতে তাঁকে অনুরোধ জানায় আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতির সাধারণ পরিষদে ওই শাখার তরফে প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতে।

রুশ শাখার সদস্যবৃন্দ সুইস ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক-আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন। শাখাটি রুশদেশের বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গেও সংযোগস্থাপনে উদ্যোগী হয়। এর অস্তিত্ব লোপ পায় ১৮৭২ সালে। পৃঃ ১২৭

(৫৫) **'গোপনীয় চিঠি'**খানি মার্কস লেখেন ১৮৭০ সালের ২৮ মার্চ তারিখ নাগাদ, যখন আন্তর্জাতিকের মধ্যে থেকে বাকুনিনপন্থীরা সাধারণ পরিষদ, মার্কস ও তাঁর মতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তীব্রতর করে তোলে। এমনকি এর আগেই, ১৮৭০ সালের ১ জানুয়ারি সাধারণ পরিষদের এক বিশেষ সভায় এই ব্যাপারটি নিয়ে একটি গোপন সার্কুলার-চিঠি (সে-চিঠিও মার্কসের লেখা) গৃহীত হয়। এই চিঠিখানি লেখা হয় বাকুনিনপন্থীদের প্রবল প্রভাবের অধীন সুইজারল্যান্ডের ফরাসি-ভাষাভাষী অঞ্চলের ফেডেরাল পরিষদের কাছে। পরে এই চিঠির অনুলিপি বেলজিয়ম ও ফ্রান্সেও পাঠানো হয়। জার্মানিতে চিঠিপত্র আদানপ্রদানের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে মার্কস জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির নেতৃস্থানীয় কমিটির কাছে উপরোক্ত যে-'গোপনীয় চিঠি'খানি পাঠান তার মধ্যে এই সার্কুলার-চিঠির পাঠ পুরোপুরি অন্তর্ভুক্ত হয়।

রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে ওই 'গোপনীয় চিঠি'র ৪র্থ ও ৫ম-সংখ্যক বক্তব্যবিষয়-দুটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এখানে প্রকাশ পেয়েছে ব্রিটিশ শ্রমিক ও আইরিশ জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন সম্বন্ধে সাধারণ পরিষদের দৃষ্টিভঙ্গি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বাকুনিনপন্থীরা বিশেষ করে এই দুটি বিষয় সম্বন্ধে পরিষদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রবল বিরোধিতা করছিল।

ওই সময়ে আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের সাধারণ সংগ্রামের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ

শ্রমিক-আন্দোলন যে-ভূমিকা পালন করে চলেছিল তার কথা এবং ফলত ওই আন্দোলনকে প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনা করার ব্যাপারে সাধারণ পরিষদের বিশেষ দায়িত্বের কথা মনে রেখেই মার্কস আলোচ্য ৪র্থ-সংখ্যক বক্তব্যের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন কেন অন্যান্য দেশের মতো ইংলন্ডে আন্তর্জাতিকের একটি ফেডেরাল পরিষদ গঠন করা উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে উপযোগী নয়।

৫ম-সংখ্যক বক্তব্যে আয়র্ল্যান্ড ও ইংলন্ডকে উদাহরণ হিসেবে ধরে মার্কস পরাধীন জাতিসমূহের মুক্তি-সংগ্রাম ও প্রলেতারীয় বিপ্লবের মধ্যে সংযোগসূত্রটি এবং প্রলেতারিয়েতের স্বাভাবিক মিত্র হিসেবে নিপীড়িত জাতিসমূহের ভূমিকাটি তুলে ধরেছেন। পৃঃ ১২৯

(৫৬) **L'Égalité** ('সাম্য') — **সুইস সাপ্তাহিক পত্রিকা। আন্তর্জাতিকের** রোমান্স ফেডারেশনের মুখপত্র। জেনেভা থেকে ফরাসি ভাষায় ১৮৬৮ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ১৮৭২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি কিছুকাল বাকুনিনের প্রভাবাধীন ছিল। ১৮৭০ সালের জানুয়ারিতে রোমান্স ফেডেরাল পরিষদ পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলী থেকে বাকুনিনপন্থীদের হটিয়ে দিতে সমর্থ হয়। অতঃপর পত্রিকাটি আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদের অনুসৃত নীতি সমর্থন করতে শুরু করে। পৃঃ ১২৯

(৫৭) **The Pall Mall Gazette** ('প্যাল ম্যাল পত্রিকা') —১৮৬৫ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত লন্ডন থেকে প্রকাশিত একখানি দৈনিক পত্রিকা। ১৮৬০'এর ও ১৮৭০'এর দশকে পত্রিকাটি রক্ষণশীল মতামতের পোষকতা করে। মার্কস ও এঙ্গেলস ১৮৭০ সালের জুলাই মাস থেকে ১৮৭১ সালের জুন মাসের মধ্যে পত্রিকাটিতে প্রবন্ধাদি লেখেন।

The Saturday Review — ১৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

The Spectator ('দর্শক') — উদারনৈতিক ভাবধারার ব্রিটিশ সাপ্তাহিক পত্রিকা। ১৮২৮ সাল থেকে লন্ডনে প্রকাশিত হয়ে আসছে।

The Fortnightly Review ('পক্ষকালীন সমীক্ষা') ইতিহাস, দর্শনশাস্ত্র ও সাহিত্য-সম্বন্ধীয় ব্রিটিশ বুর্জোয়া-উদারনৈতিক পত্রিকা। ১৮৬৫ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত এই নামে পত্রিকাটি লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়।

পৃঃ ১৩০

(৫৮) **ভূমি ও শ্রম-লীগ** আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদের সক্রিয় সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয় লন্ডনে, ১৮৬৯ সালের অক্টোবর মাসে। নিম্নোক্ত দাবিদাওয়া লীগের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল যথা, জমির জাতীয়করণ, অপেক্ষাকৃত স্বল্পস্থায়ী শ্রমদিন, সর্বজনীন ভোটাধিকার এবং কৃষি-কলোনিসমূহের প্রতিষ্ঠা। তবে ১৮৭০

সালের হেমন্তঋতু নাগাদ লীগে প্রাধান্যবিস্তার করে বসে বুর্জোয়া ব্যক্তিবিশেষরা এবং ১৮৭২ সাল নাগাদ আন্তর্জাতিকের সঙ্গে লীগের সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। পৃঃ ১৩০

(৫৯) এখানে ১৮৬৯ সালের গ্রীষ্মকাল ও শরৎকালে আয়র্ল্যান্ডের মুক্তি-সংগ্রামে যোগদানকারী বন্দীদের মুক্তির দাবি-সম্পর্কিত আন্দোলনে সাধারণ পরিষদের সমর্থনের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। পৃঃ ১৩১

(৬০) এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে ১৮০১ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর **ব্রিটিশ-আইরিশ সংযুক্তি** সম্পর্কে। এই ব্যবস্থা কার্যকর হওয়ার ফলে আয়র্ল্যান্ডের স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থার শেষ চিহ্নটি পর্যন্ত বিনষ্ট হয়ে যায়, আইরিশ পার্লামেন্ট যায় বাতিল হয়ে এবং শেষ পর্যন্ত আয়র্ল্যান্ড হয়ে পড়ে ব্রিটেনের পুরোপুরি পদানত। পৃঃ ১৩১

(৬১) প্রথম আন্তর্জাতিকের **লণ্ডন সম্মেলন** অনুষ্ঠিত হয় ১৮৭১ সালের ১৭ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। প্যারিস কমিউনের পরাজয়ের পরে আন্তর্জাতিকের সদস্যদের ওপর যে-সময়ে কঠোর দমনপীড়ন শুরু হয় সেই সময়ে এই সম্মেলনটি আহূত হওয়ার ফলে সম্মেলনে উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যা কিছুটা হ্রাস পায়। সম্মেলনে যোগ দেন ভোটদানের অধিকার সহ ২২ জন প্রতিনিধি এবং বক্তব্য উপস্থাপনার অধিকার সহ কিন্তু ভোটদানের অধিকারবঞ্চিত আরও ১০ জন অতিরিক্ত প্রতিনিধি। যে-সমস্ত দেশ সম্মেলনে তাদের প্রতিনিধি পাঠাতে পারে নি তাদের প্রতিনিধিত্ব করেন সাধারণ পরিষদের চিঠিপত্র আদানপ্রদানের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকবৃন্দ। এইভাবে মার্কস প্রতিনিধিত্ব করেন জার্মানির আর এঙ্গেলস ইতালির।

প্রলেতারীয় পার্টি প্রতিষ্ঠার জন্যে মার্কস ও এঙ্গেলস যে-সংগ্রাম চালাচ্ছিলেন তখন, লণ্ডন সম্মেলন তারই একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত। এই সম্মেলন থেকে 'শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক আন্দোলন'-বিষয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। আন্তর্জাতিকের হেগ কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই প্রস্তাবের প্রধান অংশটি আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতির সাধারণ নিয়মাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রলেতারীয় পার্টির বহু গুরুত্বপূর্ণ রণকৌশলগত ও সংগঠন-সংক্রান্ত নীতি লণ্ডন সম্মেলনের বিভিন্ন প্রস্তাবে সেই প্রথম দৃঢ়ভাবে সূত্রবদ্ধ হয় আর এগুলি একই সঙ্গে সংকীর্ণতাবাদ ও সংস্কারবাদের ওপর মারাত্মক আঘাত হানে। নৈরাজ্যবাদ ও সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে প্রলেতারীয় দলগত আনুগত্যের নীতিগুলিকে তুলে ধরার ব্যাপারে লণ্ডন সম্মেলন এক প্রধান ভূমিকা পালন করে। পৃঃ ১৩৪

(৬২) ১৮৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারির সভায় সাধারণ পরিষদ প্যারিস কমিউনের প্রথম স্মরণবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে লণ্ডনে ১৮ মার্চ তারিখে একটি জনসভার অনুষ্ঠান-সম্পর্কিত এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। শেষ মুহূর্তে বাড়ির মালিক সভা অনুষ্ঠানের জন্যে হলঘরটি ভাড়া দিতে অস্বীকার করায় সভাটি নির্দিষ্ট স্থানে অনুষ্ঠিত হতে পারে না। তৎসত্ত্বেও ওই ১৮ মার্চ তারিখেই আন্তর্জাতিকের সদস্যবৃন্দ ও প্রাক্তন কমিউনার্দরা প্রথম প্রলেতারীয় বিপ্লবের স্মরণবার্ষিকী উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যে অপর এক স্থানে একটি সভার অনুষ্ঠান করেন। বিশেষ করে এই উপলক্ষে মার্কসের লেখা তিনটি সূত্রাকার প্রস্তাব উপরোক্ত ওই সভায় গৃহীত হয়। পৃঃ ১৩৬

(৬৩) কমিউনের অস্তিত্বকালে ভার্সাইয়ে (প্যারিসের নিকটে) তিয়েরের প্রতিবিপ্লবী সরকার ক্ষমতাসীন ছিল। এই সরকার প্রলেতারিয়ান বিপ্লবের শরিকদের নিষ্ঠুরভাবে দমন করে। পৃঃ ১৩৬

(৬৪) **'জমির জাতীয়করণ'**-বিষয়ক এই পাণ্ডুলিপিটি কৃষি-সমস্যার ক্ষেত্রে একটি প্রধান মার্কসবাদী দলিল। আন্তর্জাতিকের ম্যাঞ্চেস্টার-শাখায় জমির জাতীয়করণ-বিষয়ক প্রশ্নটি নিয়ে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা-প্রসঙ্গে এই প্রবন্ধটি লেখা হয়। ৩ মার্চ তারিখে এঙ্গেলসের কাছে লেখা এক চিঠিতে সাধারণ পরিষদের সদস্য দ্যুপোঁ জানান যে কৃষি-সমস্যার প্রশ্নে উপরোক্ত শাখার সদস্যদের মতামতের মধ্যে নানা ভুল ধারণার অবকাশ দেখা দিয়েছে। তাই তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ রিপোর্টের পাঁচ দফা বক্তব্য-বিষয়ে মার্কস ও এঙ্গেলসকে তাঁদের মন্তব্য লিখিতভাবে পাঠাতে আমন্ত্রণ জানান, যাতে তিনি ম্যাঞ্চেস্টার-শাখার সভা অনুষ্ঠানের আগেই তার প্রস্তুতি হিসেবে মার্কস-এঙ্গেলসের মন্তব্যগুলি বিবেচনা করে দেখতে পারেন। এ-প্রসঙ্গে মার্কস জমির জাতীয়করণ-বিষয়ে তাঁর মতামত বিস্তারিতভাবে লিখে পাঠান আর দ্যুপোঁ তাঁর রিপোর্টে মার্কসের এই মতামতের পূর্ণ সদ্‌ব্যবহারে কার্পণ্য করেন না। জমির জাতীয়করণ সম্পর্কে মত প্রকাশ করতে গিয়ে মার্কস এই প্রশ্নটিকে এক বিরাট সমস্যা বলে উল্লেখ করেন এবং বলেন যে সমস্যাটি প্রলেতারীয় বিপ্লব ও সমগ্রভাবে সমাজের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরসাধনের কর্তব্যকর্মগুলির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পৃঃ ১৩৮

(৬৫) ১৮৬৮ সালের ৬-১৩ সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিকের ব্রাসেল্‌স কংগ্রেসে রেলপথ, ভূ-সম্পত্তি, খনি ও আবাদী জমি সামাজিক মালিকানার অধীন করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পৃঃ ১৪১

(৬৬) আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতির **হেগ কংগ্রেস** অনুষ্ঠিত হয় ১৮৭২ সালের ২ থেকে ৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। এই কংগ্রেসে ১৫টি জাতীয় সংগঠনের ৬৫ জন

প্রতিনিধি যোগ দেন। কংগ্রেসের যাবতীয় কাজ পরিচালনা করেন মার্কস ও এঙ্গেলস। শ্রমিক-আন্দোলনের মধ্যে সর্বপ্রকার পেটি-বুর্জোয়া সংকীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে মার্কস, এঙ্গেলস ও তাঁদের অনুসারীরা বহু বছর ধরে যে-সংগ্রাম চালিয়ে আসছিলেন এই কংগ্রেসে তার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ঘটতে দেখা যায়। নৈরাজ্যবাদীদের সংকীর্ণ মতান্ধ ক্রিয়াকলাপ নিন্দিত হয় এখানে এবং আন্তর্জাতিক থেকে বহিষ্কৃত হন নৈরাজ্যবাদী নেতৃবৃন্দ। হেগ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসমূহ বিভিন্ন দেশে শ্রমিক শ্রেণীর স্বনির্ভর রাজনৈতিক পার্টি প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে। পৃঃ ১৪৩

(৬৭) হেগ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হওয়ার পর (৬৬ নং টীকা দ্রষ্টব্য) মার্কস ও অন্য প্রতিনিধিরা আন্তর্জাতিকের স্থানীয় শাখা পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে আমস্টার্ডামে যান। ৮ সেপ্টেম্বর তারিখে মার্কস সেখানকার শাখার এক সভায় হেগ কংগ্রেসের আলোচনার ফলাফল নিয়ে বক্তৃতা করেন। প্রলেতারীয় বিপ্লব ও প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের ভাবধারাকে অক্লান্তভাবে সমর্থন জানিয়েও মার্কস এই বক্তৃতায় বিভিন্ন দেশে পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের ধরনধারণের সমস্যাটি নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে সৃষ্টিশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেন। তিনি দেখান যে ওই উত্তরণের ধরন নির্ভর করে সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতির ওপর, তা নির্ভর করে শ্রেণী-শক্তিসমূহের প্রতি-তুলনা ও সেগুলির অনুপাতের ওপর। ওই বক্তৃতায় তিনি এই তত্ত্ব প্রচার করেন যে বৈপ্লবিক সহিংস ক্রিয়াকলাপের (যা তখনকার ওই পরিস্থিতিতে বেশির ভাগ দেশেই প্রলেতারীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা ও তা রক্ষা করার ব্যাপারে অপরিহার্য ছিল) পাশাপাশি কিছু-কিছু দেশে (যেমন ইংলন্ড, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও সম্ভবত নেদারল্যান্ডসে) তৎকাল-প্রচলিত ঐতিহাসিক পরিস্থিতির কারণে (সুসংগঠিত আমলাতান্ত্রিক ও সমরতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুপস্থিতির জন্যে) প্রলেতারিয়েত রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করতে পারে বৈপ্লবিক সহিংস আন্দোলনের সাহায্য ছাড়াই। পৃঃ ১৪৫

(৬৮) এখানকার এই উল্লেখটি হল ১৮৭২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বার্লিনে তিন সম্রাটের — প্রথম ভিলহেল্ম (জার্মানি), ফ্রানজ্ জোসেফ (অস্ট্রো-হাঙ্গেরি) ও দ্বিতীয় আলেকসান্দরের (রাশিয়া) — মধ্যে সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে। পৃঃ ১৪৭

(৬৯) **Literarisches Centralblatt für Deutschland** ('জার্মানির কেন্দ্রীয় সাহিত্য-পত্রিকা') — বৈজ্ঞানিক তথ্য ও সমালোচনা-সংবলিত জার্মান সাপ্তাহিক পত্রিকা। লাইপজিগ থেকে ১৮৫০-১৯৪৪ সালের মধ্যে এটি প্রকাশিত হয়। পৃঃ ১৪৯

(৭০) এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে 'পর্ণজি' গ্রন্থের প্রথম জার্মান সংস্করণের প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়টি 'পণ্যসামগ্রী ও অর্থ' সম্পর্কে। পৃঃ ১৪৯

(৭১) David Ricardo, 'On the Principles of Political Economy, and Taxation', London, 1821, p. 479 (ডেভিড রিকার্ডো, 'অর্থশাস্ত্র ও শুল্ক ব্যবস্থার মূলনীতি প্রসঙ্গে', লণ্ডন, ১৮২১ সাল, পৃষ্ঠা ৪৭৯)। পৃঃ ১৫০

(৭২) **মিউচুয়ালিস্ট**—১৮৬০'এর দশকে প্রুধোঁপন্থীরা নিজেদের এই নামে অভিহিত করতেন, কারণ তাঁরা শ্রমজীবী জনসাধারণের মধ্যে পারস্পরিক সহায়তা (বা mutual aid) সংগঠিত করে (যেমন, সমবায় সমিতি, পারস্পরিক সহায়তা সমিতি, ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা করে) তাদের মুক্ত করার এক সংস্কারবাদী পেটি-বুর্জোয়া পরিকল্পনার কথা প্রচার করতেন। পৃঃ ১৫২

(৭৩) এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে ১৮৭১ সালে অনুষ্ঠিত লণ্ডন সম্মেলনে গৃহীত নিম্নোক্ত কয়েকটি প্রস্তাব সম্পর্কে। যথা, 'জাতীয় পরিষদসমূহ, ইত্যাদির সূচক আখ্যা' (দ্বিতীয় প্রস্তাব, ১, ২, ও ৩-সংখ্যক ধারা), 'শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক আন্দোলন' (নবম প্রস্তাব), 'সোশ্যালিস্ট গণতন্ত্রের সঙ্ঘ' (ষোড়শ প্রস্তাব) এবং 'সুইজারল্যাণ্ডের ফরাসি-ভাষাভাষী অঞ্চলের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা' (সপ্তদশ প্রস্তাব)। পৃঃ ১৫৪

(৭৪) সেদানে ফরাসি সেনাবাহিনীর পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে **১৮৭০ সালের ৪ সেপ্টেম্বর** তারিখে প্যারিসের জনসাধারণ বহুতরো বৈপ্লবিক শোভাযাত্রা সংগঠিত করে। এর ফলে ফ্রান্সের দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটে এবং দেশে প্রজাতন্ত্র ঘোষিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু দেশে সদ্য-প্রতিষ্ঠিত অস্থায়ী সরকারের অন্তর্ভুক্ত হয় নরমপন্থী প্রজাতন্ত্রীরা ও সেইসঙ্গে রাজতন্ত্রবাদীরাও। নতুন গভর্নমেণ্টের প্রধান হন প্যারিসের ফৌজী শাসনকর্তা ত্রোশ্যু আর তিয়ের ছিলেন সমগ্র ব্যবস্থাটির আসল হোতা। এ'দের দুজনেরই মনোভাবে প্রতিফলিত হচ্ছিল ফরাসি বুর্জোয়া শ্রেণী ও ভূস্বামীদের পরাজিতের মনোভাব ও জনগণ সম্বন্ধে আতঙ্ক। রাজ্য-পরিচালনার ক্ষেত্রে তাই এ'রা জাতিগত বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদেশী শত্রুর সঙ্গে যোগসাজশের পথ ধরেন। পৃঃ ১৫৫

(৭৫) এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে ১৮৬৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বার্ন-এ অনুষ্ঠিত শান্তি ও স্বাধীনতা-বিষয়ক লীগ'-এর কংগ্রেসে বাকুনিনের রচিত জগাখিচুড়ি সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচিটি (যেমন, 'শ্রেণীসমূহের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতাবিধান', রাষ্ট্রের এবং উত্তরাধিকার-ব্যবস্থার বিলোপসাধন, ইত্যাদি) গ্রহণ করিয়ে নেয়ার ব্যাপারে বাকুনিনের প্রয়াসের কথা। কংগ্রেসের অধিবেশনে

অধিকাংশের ভোটে তাঁর এই কর্মসূচি যখন প্রত্যাখ্যাত হল তখন বাকুনিন উপরোক্ত লীগের সংগঠন ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন এবং 'সোশ্যালিস্ট গণতন্ত্রের আন্তর্জাতিক সংঘ' গঠন করলেন। পৃঃ ১৫৬

(৭৬) এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে ১৮৬৯ সালের ৬-১১ সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত সংগঠন-সংক্রান্ত প্রশ্নে সুইজারল্যাণ্ডের বাসেল কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবাদি সম্পর্কে। এইসব প্রস্তাবের বলে সাধারণ পরিষদের ক্ষমতার এক্তিয়ার সম্প্রসারিত করা হয়। পৃঃ ১৫৮

(৭৭) **Il Proletario** ('প্রলেতারিয়ান')—১৮৭২ থেকে ১৮৭৪ সাল পর্যন্ত তুরিন থেকে প্রকাশিত একটি ইতালীয় সংবাদপত্র। পত্রিকাটি ছিল বাকুনিনপন্থীদের সমর্থক এবং সাধারণ পরিষদ ও লণ্ডন সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাদির বিরোধী।

Gazzettino Rosa ('রক্তবর্ণ সংবাদপত্র')—একটি ইতালীয় দৈনিক পত্রিকা। ১৮৬৭ থেকে ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত মিলান থেকে প্রকাশিত হয়। ১৮৭১ সালে এটি প্যারিস কমিউনের সমর্থনে দাঁড়ায়, পত্রিকাটি আন্তর্জাতিক থেকে প্রচারিত দলিলপত্রাদি ছেপে বের করে। ১৮৭২ সাল থেকে পত্রিকাটি বাকুনিনপন্থীদের প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে। পৃঃ ১৫৮

(৭৮) **La Liberté** ('মুক্তি')—১৮৬৫ থেকে ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত ব্রাসেল্‌স্‌ থেকে প্রকাশিত একখানি গণতান্ত্রিক সংবাদপত্র। ১৮৬৭ সাল থেকে পত্রিকাটি বেলজিয়মে আন্তর্জাতিকের অন্যতম মুখপত্র হয়ে দাঁড়ায়। পৃঃ ১৫৯

(৭৯) **১৮৭১ সালের ফরাসি শাখা**—লণ্ডনের ফরাসি শরণার্থীদের একাংশ ১৮৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এটি গঠন করেন। এই শাখা-সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সুইস বাকুনিনপন্থীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং তাদের সঙ্গে মিলিতভাবে আক্রমণ চালান আন্তর্জাতিকের সংগঠন-সংক্রান্ত নীতিসমূহের বিরুদ্ধে। সংগঠনটির নিয়মাবলীর কয়েকটি ধারা আন্তর্জাতিকের সাধারণ নিয়মাবলীর পরিপন্থী হওয়ায় একে আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। পরবর্তী কালে এই শাখা-সংগঠনটি ভেঙে কয়েকটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যায়। পৃঃ ১৬০

(৮০) ১৮৭১ সালের ১২ নভেম্বর তারিখে সাঁভিলিয়েরে (সুইজারল্যাণ্ড) অনুষ্ঠিত বাকুনিনপন্থীদের জুরা ফেডারেশনের কংগ্রেসে গৃহীত **'আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতির সকল শাখা-ফেডারেশনের নিকট প্রেরিতব্য সার্কুলার-পত্র'** সম্বন্ধে এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। এই সার্কুলার-পত্রে ১৮৭১ সালের লণ্ডন সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলিকে প্রত্যাখ্যান করা হয়, সাধারণ পরিষদের ক্ষমতার এক্তিয়ারকে অস্বীকার করা হয় এবং সকল শাখা-ফেডারেশনকে এইমর্মে পরামর্শ দেয়া হয়

যাতে সংগঠনগুলি আন্তর্জাতিকের সাধারণ নিয়মাবলীর পুনর্বিচার ও সংশোধনসাধনের উদ্দেশ্যে এবং সাধারণ পরিষদকে বর্জন করার জন্যে অবিলম্বে একটি কংগ্রেসের অধিবেশন আহ্বানের দাবি জানায়। পৃঃ ১৬১

(৮১) **শ্রমিক ফেডারেশন**—১৮৭১ সালের শরৎকালে তুরিন শহরে গড়ে-ওঠা প্রজাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান; প্রতিষ্ঠানটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের প্রভাবাধীন ছিল। পৃঃ ১৬১

(৮২) **Ficcanaso** ('অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপকারী')—ইতালীয় প্রজাতন্ত্রীদের দৈনিক ব্যঙ্গ-পত্রিকা। ১৮৬৮ থেকে ১৮৭২ সাল পর্যন্ত তুরিনে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। পৃঃ ১৬১

(৮৩) **La Révolution Sociale** ('সামাজিক বিপ্লব')—১৮৭১ সালের অক্টোবর মাস থেকে ১৮৭২ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত জেনেভা থেকে প্রকাশিত ফরাসি ভাষায় সাপ্তাহিক পত্রিকা। ১৮৭১ সালের নভেম্বর থেকে পত্রিকাটি নৈরাজ্যবাদী জুরা ফেডারেশনের সরকারি মুখপত্র হয়ে দাঁড়ায়। পৃঃ ১৬১

(৮৪) **Égalité** —৫৬ নং টীকা দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৬১

(৮৫) এঙ্গেলস এখানে সঁভিলিয়ের কংগ্রেসে যোগদানকারী ষোলটি ফেডারেশনের সার্কুলার-পত্রের জবাবে রোমান্স ফেডারেশনের নেতৃস্থানীয় কমিটি'র চিঠিখানির উল্লেখ করছেন। পৃঃ ১৬১

(৮৬) ১২ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(৮৭) জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের **স্যাক্সন কংগ্রেসের** অধিবেশন বসে ১৮৭২ সালের ৬-৭ জানুয়ারি তারিখে খেম্‌নিট্‌সে। কংগ্রেসে অন্যান্য আলোচ্য বিষয়ের (যেমন, সর্বজনীন ভোটাধিকার, ট্রেড ইউনিয়নসমূহের সংগঠন, ইত্যাদির) সঙ্গে সঁভিলিয়ের কংগ্রেসের (৮০ নং টীকা দ্রষ্টব্য) সার্কুলার-পত্র ও আন্তর্জাতিকের ভেতরে নৈরাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের বিষয়গুলিও আলোচিত হয়। স্যাক্সন কংগ্রেসে সর্বসম্মতিক্রমে সাধারণ পরিষদকে সমর্থন জানানো হয় এবং ১৮৭১ সালে অনুষ্ঠিত লন্ডন সম্মেলনের প্রস্তাবগুলিও সমর্থিত হয়। পৃঃ ১৬২

(৮৮) **আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত বেলজিয়ান ফেডারেশনের অনুষ্ঠিত কংগ্রেস**, এই কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ব্রাসেল্‌সে ১৮৭১ সালের ২৪-২৫ ডিসেম্বর তারিখে। সঁভিলিয়ের কংগ্রেসের সার্কুলার-পত্র নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কংগ্রেস অবশ্য সুইস নৈরাজ্যবাদীদের অবিলম্বে এক সাধারণ কংগ্রেস আহ্বানের দাবিকে সমর্থন করে না, তবে তা বেলজিয়ান ফেডেরাল পরিষদকে নির্দেশ দেয় পরবর্তী হেগ

কংগ্রেসে (৬৬ নং টীকা দ্রষ্টব্য) আলোচনার জন্যে আন্তর্জাতিকের নিয়মাবলীর একটি নতুন খসড়া তৈরি করতে। পৃঃ ১৬২

(৮৯) **Neuer Social-Demokrat** ('নয়া সোশ্যাল-ডেমোক্রাট')—১৮৭১ থেকে ১৮৭৬ সাল পর্যন্ত বার্লিন থেকে প্রকাশিত একটি জার্মান সংবাদপত্র ও লাসালপন্থী নিখিল জার্মান শ্রমিক সঙ্ঘের মুখপত্র। সংবাদপত্রটি বাকুনিনপন্থীদের ও অন্যান্য প্রলেতারীয়-বিরোধী চিন্তাধারাকে সমর্থন করে এবং আন্দোলন চালায় আন্তর্জাতিকের মার্কসবাদী নেতৃত্ব ও জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির বিরুদ্ধে। পৃঃ ১৬২

(৯০) ১৮৭১ সালের জুলাই-অগস্ট মাসে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে গোপন বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের দায়ে কয়েকজন ছাত্র আলোচ্য এই নেচায়েভ-মামলায় অভিযুক্ত হয়। এর আগে ১৮৬৯ সালে নেচায়েভ বাকুনিনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং রুশদেশের কয়েকটি শহরে 'নারদনায়া রাস্‌প্রাভা' (বা 'জনগণের প্রতিশোধ') নামে এক গোপন সমিতি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কাজকর্ম চালাতে থাকেন। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল 'সামগ্রিক ধ্বংস'এর নৈরাজ্যবাদী ধ্যানধারণা প্রচার করা। বৈপ্লবিক মনোভাবাপন্ন ছাত্রছাত্রী ও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা নেচায়েভের এই সংগঠনে যোগ দেয় জার-গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সংগঠনটির তীব্র সমালোচনায় ও ওই গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে অবিচল সংগ্রাম শুরু করার আহ্বানে আকৃষ্ট হয়ে। নেচায়েভ বাকুনিনের কাছ থেকে তথাকথিত 'ইউরোপীয় বিপ্লবী ইউনিয়নের' প্রতিনিধির শংসাপত্র পেয়েছিলেন এবং তা লোককে দেখিয়ে নিজেকে আন্তর্জাতিকের প্রতিনিধি বলে চালাতেন ও নিজ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যকে ধোঁকা দিতেন। ১৮৭১ সালে নেচায়েভের এই সংগঠন ভেঙে যায় এবং সংগঠনের সদস্যদের উপরোক্ত বিচারের মামলায় সংগঠনটির কার্যকলাপের হঠকারী রীতি-পদ্ধতি জনসমক্ষে প্রকাশ হয়ে পড়ে। পৃঃ ১৬৩

(৯১) **নিখিল জার্মান শ্রমিক সঙ্ঘ**—১৮৬৩ সালে লাসালের সক্রিয় সহযোগে গঠিত জার্মান শ্রমিকদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। সঙ্ঘটি সর্বজনীন নির্বাচনাধিকারের জন্যে সংগ্রামে এবং শান্তিপূর্ণ পার্লামেণ্টারি কার্যকলাপের সীমানায় নিজের উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ করে সুবিধাবাদী নীতি অনুসরণ করে। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সঙ্ঘের পরিচালকবৃন্দের মধ্যে জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দেখা দেয়। পৃঃ ১৬৫

(৯২) ১৮৬৯ সালের ৭-৯ অগস্ট তারিখে আইজেনাখ-এ অনুষ্ঠিত জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও সুইজারল্যান্ডের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের এক সর্ব-জার্মান কংগ্রেসে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি গঠিত হয়। সাধারণভাবে বলতে গেলে এই

পার্টির কর্মসূচি আন্তর্জাতিকের উপস্থাপিত নির্দেশাদির মর্মবস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। পৃঃ ১৬৬

(৯৩) গ. ভ. ফ. হেগেল, 'Phänomenologie des Geistes', 'Die Wahrheit der Aufklarung'। পৃঃ ১৬৯

(৯৪) ১৮৭২-১৮৭৩ সালে লিব্‌ক্লেখ্‌ট ও হেপ্‌নার বারবার মার্কসকে অনুরোধ জানান লাসালের চিন্তাধারার সমালোচনা করে হয় একখানি পুস্তিকা আর নয়তো **Der Volksstaat** পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখতে। পৃঃ ১৬৯

(৯৫) ১৮৭৪ সালের অগস্ট মাসে জোর্গে সাধারণ পরিষদের সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং ১৮৭৪ সালের ১৪ অগস্ট তারিখে এঙ্গেলসকে তা জানিয়ে দেন। সরকারিভাবে তিনি পদত্যাগপত্র পেশ করেন ১৮৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে। পৃঃ ১৭০

(৯৬) এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে ফ্রান্সে তৃতীয় নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য (১৮৫২-১৮৭০) সম্পর্কে। পৃঃ ১৭০

নামের সূচি

অ

আ

ই

গ

শ

স

সাহিত্যিক ও পৌরাণিক চরিত্র

আদম — বাইবেলে-বর্ণিত কাহিনী অনুযায়ী মাটি দিয়ে ঈশ্বরের হাতে তৈরি প্রথম মানুষ। আদম নিষেধ লঙ্ঘন করে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়েছিল।—২৮

এবেল — বাইবেলে-বর্ণিত কাহিনী অনুযায়ী আদমের পুত্র; ঈর্ষার কারণে বড় ভাই কেইন-এর হাতে নিহত। —৮৬

কেইন — বাইবেলে-বর্ণিত কাহিনী অনুযায়ী আদমের বড় ছেলে। কেইন তার ভাই এবেলকে হত্যা করে। —৮৬

পারসিয়ুস (গ্রীক পুরাণ) — জিউস ও ডানি-র পুত্র; বহু-কীর্তিমান; ইনি মেডুসার মাথা কেটে ফেলেন।—১১

মেডুসা (গ্রীক পুরাণ) — দানবী; যে-কোনো মানুষ এর দিকে তাকালে তাকে পাথরে পরিণত করার ক্ষমতা রাখত এই দানবী। —১০